সরদার ফজলুল করিম

স্মৃতিসমগ্র ২

সরদার ফজলুল করিম । স্মৃতিসমগ্র ২

"...সরদার ফজলুল করিম বলেন, তাঁর পুরো জীবনেই নাকি লাভ, লোকসান বলে কিছু নেই। চার বারে মোট ১১ বছর জেলখাটা নাকি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ। কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদের সামনে বিলেতে বৃত্তির আমন্ত্রণপত্র ছিঁড়ে ফেলা, দলের হুকুমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়া–এসব কিছুকেই তিনি মনে করেন জীবনের পরম পাওয়া। এখন ৮৭ বছরে পা দিয়েও জীবিকার জন্য যত ছোটাছুটি, এও নাকি লাভ, আনন্দ, বেঁচে থাকার, জীবনযাপনের।..."

স্মৃতিকথা ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ হতে পারে। আরও বিশেষ করে তা যদি বেরিয়ে আসে সরদার ফজলুল করিমের মতো একজনের কলম থেকে, যিনি আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বের সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শীই শুধু নন, ইতিহাস নির্মাণের শরিকও। আজকের বাংলাদেশ নামে পরিচিত ভূখণ্ডটির বিগত প্রায় সাত দশকের ঘটনাপ্রবাহ, তার চড়াই-উতরাই, নানা বাঁককে অন্তরঙ্গ আলোয় চেনা ও বোঝার পক্ষে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠকের জন্য সরদার ফজলুল করিমের স্মৃতিচারণধর্মী রচনাগুলোর বিকল্প কমই আছে, একথা একরকম জোর দিয়েই বলা যায়। সরদার ফজলুল করিমের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পাণ্ডিত্য তাঁকে কখনো ভারাক্রান্ত করে না। দর্শনের মতো জটিল-কঠিন বিষয়কেও তিনি খুব সহজ-সরল ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে পারেন, তাঁর স্মৃতিকথা-জাতীয় রচনাগুলোতে যে গুণটি আরও সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা এবং শ্রদ্ধানিবেদন বা স্মৃতিচারণার সূত্রে কিংবা গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে অন্য বিশিষ্টজনদের অভিজ্ঞতার যে-বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন, ভাষার সারল্যে ও বর্ণনার চমৎকারিত্বে তা কেবল পাঠককে মুগ্ধই করবে না, অনেক অজানা তথ্যের মুখোমুখিও দাঁড় করাবে। লেখকের সমুদয় স্মৃতিকথাজাতীয় রচনার সংগ্রহ দুই খণ্ডে বিন্যস্ত *সরদার ফজলুল করিম : স্মৃতিসমগ্র* পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা গর্বিত বোধ করছি।

ISBN : 984 70156 0292 5

সরদার ফজলুল করিম জন্মেছিলেন ১৯২৫ সালের পহেলা মে বরিশালের আটিপাড়া গ্রামের এক কৃষক পরিবারে। বাবা খবিরউদ্দিন সরদার। মা সফুরা বেগম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৪৫ সনে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স ও ১৯৪৬ সনে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সরদার ফজলুল করিম ছাত্রজীবন থেকেই শোষণমুক্ত মানবতাবাদী একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন জীবনের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে একের পর এক লড়াই করেছেন। রাজবন্দি হিসেবে দীর্ঘ ১১ বছর তিনি কারাভোগ করেন। ১৯৫৪ সালে জেলে থাকাকালে সরদার সাহেব পাকিস্তান সংবিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৩-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষের পদে কাজ করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সরদার ফজলুল করিম ১৯৭২ থেকে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সরদার ফজলুল করিম অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে শিক্ষাক্ষেত্রে দীপ্যমান অবদান রেখেছেন। তাঁর উলেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *প্লেটোর সংলাপ*, *প্লেটোর রিপাবলিক*, *অ্যারিস্টটলের পলিটিক্স*, *এঙ্গেলসের অ্যান্টি ডুরিং*, *রুশোর সোস্যাল কন্ট্রাক্ট*, *নানা কথার পরের কথা*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক*, *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, *নূহের কিশতি*, *রুমীর আম্মা*, *দর্শনকোষ*, *শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্মারকগ্রন্থ* ও *সেই সে কাল*।

সৃজনশীল লেখক হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পদকে ও জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে ভূষিত হন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতত্বিপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরদার ফজলুল করিমকে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ২০০০' প্রদান করা হয়।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

১৯৬০ দশকে সরদার ফজলুল করিম

সরদার ফজলুল করিম

স্মৃতিসমগ্র ২

সম্পাদনা

মোরশেদ শফিউল হাসান

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৯
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৬৮৭৭৩ ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০

দাম
তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 70156 0292 5

SARDAR FAZLUL KARIM : SMRITI SOMOGRO, VOL 2 (a collection of memoirs by Sardar Fazlul Karim) Edited by Dr. Morshed S Hasan. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers, 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka Three Hundred and Fifty only. US $ 14.95

ছোটবড় অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে গড়িয়ে এসেছে জীবন। চলার পথে কৃতী ও মহৎ অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। এসব অভিজ্ঞতা আমার চেতনায় কমবেশি ছাপ ফেলেছে। যখনই সুযোগ পেয়েছি চেষ্টা করেছি আমার এই স্মৃতির সঞ্চয়কে কলমের আঁচড়ে ধরে রাখতে। এখন দেখছি তার পরিমাণ একবারে কম নয়। আমার এই স্মৃতিলিপিগুলোর অন্য কারো কাছে কোনো মূল্য বা গুরুত্ব আছে কি না জানি না। তবে স্নেহভাজন আহমেদ মাহমুদুল হক ও লেখক মশিউল আলমের আবদার ফেলতে পারলাম না। রচনাগুলো একত্র করে প্রকাশ করতে চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমাকে রাজি হতেই হল। মাহমুদ আমার আরও একাধিক বইয়ের প্রকাশক। অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসান এই বইটি সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ায় আমি খুশি হয়েছি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

সরদার ফজলুল করিম

ভূমিকা

স্মৃতিকথা ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ হতে পারে। বিশেষ করে তা যদি বেরিয়ে আসে সরদার ফজলুল করিমের মতো একজনের কলম থেকে, যিনি আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বের সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শীই শুধু নন, কতক পরিমাণে সে-ইতিহাস নির্মাণের শরিকও। আজকের বাংলাদেশ নামে পরিচিত ভূখণ্ডটির প্রায় অর্ধশতাব্দীর ঘটনাপ্রবাহ, তার চড়াই-উতরাই, নানা বাঁককে অন্তরঙ্গ আলোয় চিনতে-বুঝতে হলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পাঠককে তাঁর স্মৃতিচারণধর্মী রচনাগুলোর শরণাপন্ন হতে হবে, একথাটা একরকম জোর দিয়েই বলা যায়।

বহুধাবিস্তৃত তাঁর কর্মক্ষেত্র, বিচিত্র এমনকি অনেকাংশে রোমাঞ্চকর তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা। উনিশ শো চল্লিশের দশকে পূর্ব বাঙলার গ্রামীণ কৃষিজীবী মুসলমান পরিবারের একটি তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ও কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল নিয়েও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিংবা চাকুরির মোহ ত্যাগ করে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামকেই তাঁর জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকের চাকুরি ছেড়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন বিপ্লবসাধনায়। দেশভাগের পরপর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে মুষ্টিমেয়সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান তরুণ গোপন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সরদার ফজলুল করিম ছিলেন তাঁদের নেতৃস্থানীয়দের একজন। তবে অন্য অনেকের ক্ষেত্রে যা ছিল প্রায় স্বল্পস্থায়ী সংযোগ, সরদার ফজলুল করিমের বেলায় তা-ই হয়ে দাঁড়ায় এক দীর্ঘ ঝুঁকিপূর্ণ পথচলা। জীবনের এক দশকেরও বেশি সময় তাঁর কেটেছে জেলে। জেল থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরিষদের এক অধিবেশনে যোগ দিয়ে পরবর্তী অধিবেশনে যোগ দিতে যাবার পথে বিমানেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের জন্য কাজ করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় তাঁকে আত্মগোপন অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। কাজ করেছেন গ্রামের কৃষকদের মধ্যে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন

হওয়ার পর সারস্বতসাধনাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর মূল কর্ম। এককালের লড়াকু বিপ্লবীর পরবর্তী জীবন উৎসর্গিত হয়েছে একাগ্র জ্ঞানসাধনায় ও বিদ্যার্থীদের নিবিড় পাঠদানে। তরুণমনে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলার নিরলস প্রচেষ্টায়। আর সেখানেও তিনি একটি জীবন্ত কিংবদন্তি।

আজকের দিনে বিশেষ করে আমাদের সমাজে সততা, সারল্য, বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি গুণগুলোর সঙ্গে বুদ্ধিজীবিতার দূরত্ব যখন ক্রমবর্ধমান, তখন সরদার ফজলুল করিমের ব্যক্তিত্ব আমাদের সামনে শুধু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই নয়, অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবেও গণ্য হবার দাবি রাখে। বিদ্যার সঙ্গে ঔদ্ধত্যের কিংবা পাণ্ডিত্যের সঙ্গে উন্নাসিকতার সম্পর্ক যে আবশ্যিক নয়, বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না, আমাদের কালে ও সমাজে তিনি তার এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পাদপ্রদীপের আলোয় বারবার উদ্ভাসিত হয়েও তিনি যাকে বলে মঞ্চের মানুষ তা কখনো হননি, বরং সব সময়ই থেকেছেন প্রায় নিভৃতচারীর মতো। কোনো ব্যাপারেই যাকে বলে উচ্চকণ্ঠ তা তিনি নন, বরং অনেকটাই যেন মৃদুভাষী। আপন বিশ্বাসে দৃঢ় ও একনিষ্ঠ থেকেও ভিন্নমতের প্রতি সহনশীল। দীর্ঘ স্বৈরতান্ত্রিক আবহাওয়ায় সমাজে যখন স্বাধীন চিন্তাচর্চার পরিবেশ নানাভাবে ব্যাহত হয়, ভীতি ও প্রলোভন যখন তার হিংস্র ও মধুর চেহারা নিয়ে প্রতিভাবান ও করিৎকর্মাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন আত্মরক্ষার সংগ্রামই বোধকরি একজন বুদ্ধিজীবীর মহত্তম কর্তব্য হয়ে ওঠে। সরদার ফজলুল করিম সম্পর্কে বলা যায় তিনি সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

তাঁর ব্যক্তিত্বের মতোই তাঁর রচনাও একইরকম সরল, আটপৌরে, ভানহীন। সাধারণ মানুষের প্রতি যে-দায়বদ্ধতা একদা তাঁকে বিপ্লবসাধনায় নিরত করেছিল, মনে হয় লেখক হিসেবেও তেমন কোনো বোধই তাঁকে পরিচালিত করেছে। ফলে যখন তিনি দর্শনের মতো আপাত-জটিল-কঠিন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তখন তাও লিখেছেন খুব সহজ-সরল ভঙ্গিতে। অন্তত অকারণ পাণ্ডিত্য কখনোই তাঁর রচনাকে ভারাক্রান্ত করেনি। তাঁর স্মৃতিকথা জাতীয় রচনাগুলোতে যে-গুণটি আরও সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা এবং শ্রদ্ধানিবেদন বা স্মৃতিচারণার সূত্রে কিংবা আলাপচারিতার ভিত্তিতে অন্য বিশিষ্টজনদের অভিজ্ঞতার যে-বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন, ভাষার সরলতায় ও বর্ণনার সততায় তা কেবল পাঠককে মুগ্ধই করবে না, ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্যের মুখোমুখিও দাঁড় করাবে।

মাওলা ব্রাদার্স দুই খণ্ডে সরদার ফজলুল করিমের সমুদয় স্মৃতিকথা জাতীয় রচনা সংকলন করে প্রকাশের মাধ্যমে একটি জরুরি কর্তব্য পালন করছে বলে মনে করি। 'সরদার ফজলুল করিম : স্মৃতিসমগ্র' নামে সংকলিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রধানত লেখকের আত্মস্মৃতি ও দ্বিতীয় খণ্ডে সমসাময়িক বিশিষ্টজনদের সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণ সংকলিত হয়েছে। এই বিশিষ্টজনদের মধ্যে রয়েছেন

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শেখ মুজিবুর রহমান, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মণি সিংহ, কাজী মোতাহার হোসেন, রমেশ শীল, অজিত গুহ, এ কে নাজমুল করিম, মুনীর চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, সৈয়দ নুরুদ্দিন, জহুর হোসেন চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, অনিল মুখার্জি, জাহানারা ইমাম প্রমুখ, বিংশ শতাব্দীতে আমাদের সমাজ-রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্র যাঁদের বিশাল-বিপুল অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। চল্লিশের দশকের ঢাকা নিয়ে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা গ্রন্থের সরদার ফজলুল করিম লিখিত অংশটি এই রচনাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতাভিত্তিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ এ-বইয়ের একটি মূল্যবান সংযোজন, যা দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

লঘু-গুরু নানা বিষয়ে লেখা সরদার ফজলুল করিমের অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ, *প্লেটোর রিপাবলিক*সহ বিভিন্ন অনুবাদকর্ম কিংবা তাঁর বিখ্যাত *দর্শনকোষ* এ সবই তাঁর অমূল্য কীর্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও ভবিষ্যতে যা তাঁকে আমাদের জন্য অপরিহার্য করে তুলবে তা হল তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা ও স্মৃতিকথাসমূহ, ইতিহাসের অনেক গূঢ় সত্যকে যা আমাদের চোখের সামনে উন্মোচন করে দেয়।

ঢাকা
জানুয়ারি ২০১৩

মোরশেদ শফিউল হাসান

সূচিপত্র

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৮৮৫ সালের সাক্ষাৎ ১৯২৫ সালের পক্ষে পাওয়া কম কথা নয়। কিন্তু কেবল ১৯২৫ নয়, ১৯৫৮ সালে জন্মলাভ করে যে কিশোর আজ দশ বছরে পা দিয়েছে, সেও তার জীবনের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ পেয়েছে ১৮৮৫ সালের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর। এটা যেমন ব্যক্তিগতভাবে, তেমন জাতীয়ভাবে এক বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ সাক্ষাৎ প্রায় এক শতাব্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেই শতাব্দীর স্মৃতিচারণ সম্পূর্ণরূপে করা সমসাময়িক কোনো এক ব্যক্তির পক্ষেই হয়ত সম্ভব নয়। সে স্মৃতিচারণ করতে পারতেন একমাত্র স্মৃতিধর এবং শতাব্দীর প্রতিভূ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নিজে। তাঁর সম্পর্কে কোন কথা বলা আমার নিজের পক্ষে একেবারেই দুঃসাহস হত, যদি না জীবন পরিক্রমায় আকস্মিকভাবে আমি তাঁর কিছুটা নৈকট্য লাভের সুযোগ পেতাম।

আমি প্রথম দেখেছিলাম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে ১৯৪২ সালে। তখনো আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই নি। বিখ্যাত হাইকোর্ট বিল্ডিং-এ তখন ঢাকা কলেজের ক্লাস হত। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। বর্তমান ফজলুল হক হল তখন ঢাকা কলেজের হোস্টেল। প্রায় ২৭ বছর আগে দেখা সেই দেহাবয়বটির খুব পরিবর্তন ১৯৬৯-এর ১৩ই জুলাই শেষ শয়ানেও আমি দেখি নি। তাই আমার মনের পটে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কায়িক স্মৃতির কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, সেই সহস্র সহস্র তরুণ-তরুণী, ছাত্র-শিক্ষক, সমাজকর্মী, দেশবাসী কারুর মনেই সেই স্মৃতির পরিবর্তন ঘটে নি। প্রথম দেখার স্মৃতিকে পরবর্তী সাক্ষাতের স্মৃতি জমাট করেছে, আঘাত করে নি।

কিন্তু '৪২ সালের স্মৃতি কেবল দেহাবয়বেরই নয়। কেবলমাত্র বৃহৎ মস্তিষ্কের, শরীর বেয়ে নেমে পড়া শুভ্র শ্মশ্রুর ক্ষুদ্রাকারের মানুষটিরই নয়। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে ঢাকার মুসলিম ছাত্রসমাজে হঠাৎ একটা আলোড়ন দেখা দিল। ড.

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তখন ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট। তিনি থাকতেন বর্তমান বিজ্ঞান অ্যানেক্স-এর দক্ষিণ পাশের বাংলোতে। ফজলুল হক হল তখন মেডিক্যাল কলেজের দোতলায়। ছাত্রদের আলোড়নটা ছিল রাজনৈতিক। এ. কে. ফজলুল হক সাহেব ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে নিয়ে একটি যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। ঢাকার নবাব হাবীবুল্লাহও এ. কে. ফজলুল হকের পক্ষ নিয়েছেন। কিন্তু মুসলিম লীগ এ মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করছে। সে কারণে মুসলিম ছাত্রসমাজও তার বিরোধী। কিন্তু ছাত্রসমাজে হক সাহেবের সমর্থনকারী ছিল না এমন কথা ঠিক নয়। বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম ছাত্র ছিল হক সাহেবের সমর্থনকারী। অবশ্য মুসলিম সমাজের প্রধান আন্দোলন তখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য এবং রাজনৈতিক প্রতিটি ঘটনা তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত।

তবু এই বিশেষ ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে সেদিনও কিছুটা বিভক্তি দেখা দিয়েছিল। কেবল রাজনীতি নয়, সমাজের বৃহত্তর জনসংখ্যার অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতেও যারা ঘটনার বিচার করতে চাইত ছাত্রসমাজের তেমনি অংশ সেদিনও হক সাহেবের সমাজসেবী চরিত্রের জন্য তাঁকে সমর্থন করেছিল। ছাত্রসমাজের প্রধান অংশের মধ্যে তখন এ চিন্তা ছিল না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কেবল পণ্ডিত নন; দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপারেও তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত আগ্রহ পোষণ করে গেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর মতামতও দৃঢ় ছিল। যে সাধারণ মানুষ কিংবা অর্থনৈতিক অব্যবস্থা সম্পন্ন দারিদ্র্য প্রপীড়িত অসংখ্য মানুষের জন্য চিন্তা করে, তাদের দুঃখভার কিছু লাঘব করতে চায়, তার জন্য তাঁর সহানুভূতি কারুর অগোচর ছিল না। সেদিনও ছাত্ররা জানত যে, ড. শহীদুল্লাহ ফজলুল হক পন্থী। আজ কথাটা শুনতে এত খারাপ না লাগলেও সেদিন এ কথাটি বিপজ্জনক ছিল। বিপজ্জনক ছিল এই কারণে যে একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম তরুণগণ এবং অপরদিকে নবাব হাবীবুল্লাহ এবং এ. কে. ফজলুল হকের ভক্ত ঢাকার মহল্লার জনসাধারণ। এই দ্বিধাবিভক্ত ঢাকার মধ্যে হক সাহেবকে সম্বর্ধনা জানানো নিয়ে ঢাকা রেল স্টেশনে একটি সংঘর্ষ ঘটে। সেই সংঘর্ষে স্থানীয় জনসাধারণের জমায়েতের প্রবলতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হকবিরোধীগণ পর্যুদস্ত হয়। পর্যুদস্ত হয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে হকপন্থী ছাত্রদের উপর পাল্টা হামলা চালায়। কিন্তু যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য সে হচ্ছে, হক-বিরোধী ছাত্রদের বিরূপতার আক্রমণ থেকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও বাদ যান নি। এ ঘটনার উল্লেখ করলাম এ জন্য যে, পণ্ডিত শহীদুল্লাহ যেমন রাজনীতিকভাবে সব সময়েই সচেতন ছিলেন, তেমনি কোন প্রতিকূল জোয়ারের স্রোতেও যা তিনি সমর্থন করতেন বা সমর্থনযোগ্য মনে করতেন, তাকে বিসর্জন দিয়ে খ্যাতির সহজ পন্থা বেছে নেওয়ার প্রবণতা তিনি জীবনে খুব কমই দেখিয়েছেন।*

---

* জন্ম : ১০ই জুলাই ১৯৪২, মৃত্যু : ১৩ই জুলাই ১৯৬৯।

আমরা শুনেছি, তাঁর ছেলে সে যুগেই ব্রিটিশ সরকারবিরোধী বিপ্লবাত্মক ছাত্র-রাজনীতি করতেন। সে কারণে তাঁর বড় ছেলের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। পিতার কাছে সরকারি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে তার অনুচর এসে হুমকি দিচ্ছে : আপনার ছেলের সন্ধান দিন। আপনার ছেলেকে আপনি নিবৃত্ত করুন। কিন্তু সব হুমকির জবাবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর সেই চিরকালীন উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলেছেন : আমার ছেলে বড় হয়েছে। তার কর্তব্য-অকর্তব্য সে বেছে নেবে। আমি তাকে বাধা দেব কেন? শুধু বড় ছেলেই নয়, পরবর্তীকালে অপরাপর ছেলেরাও কেউ সক্রিয় রাজনীতি এবং কারাবাসের পথ বেছে নিয়েছে, কেউবা শিল্পচর্চার পথ, কেউ নিজ ক্ষমতানুযায়ী জীবিকানির্বাহের পথও বেছে নিয়েছে। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, জীবনবোধ কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কোনো ছেলেরই তাঁর সঙ্গে বিরোধহীন ঐক্য ঘটে নি; কিন্তু কারুর উপর তাঁকে অসন্তুষ্ট হতে আমরা শুনিনি। সকলকে তিনি তাদের মতামতে, জীবনযাত্রায় বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিয়েছেন; পিতার অধিকার নিয়ে কারু জীবনে হস্তক্ষেপ করেন নি। আবার নিজের জীবনপথে চলতে গিয়ে কেউ কারাগারে কিংবা অর্থাভাবে বিপন্ন হলে নিজে তার সাহায্যের জন্য হাজির হয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই পারিবারিক জীবনের ঔদার্য ও বিচারবোধ তাঁর ধর্মীয়, সামাজিক, সাহিত্যিক সমস্ত জীবনেরই যে নীতি ছিল, এটা তাঁর নৈকট্যের যেটুকু সুযোগ আমি লাভ করেছি তা থেকেই জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

১৯৪২-এর পরে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে জীবিকার ক্ষেত্রে কিছুটা ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ ঘটে আমার ১৯৬৩ সালে। বাংলা একাডেমির অনুবাদ বিভাগে আমি তখন যোগ দিয়েছি। সৈয়দ আলী আহসান একাডেমির পরিচালক। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' এবং 'ইসলামী বিশ্বকোষের' প্রধান সম্পাদক। তখন বিষয়টি চিন্তা করি নি। কিন্তু আজ চিন্তা করতে অবাক লাগে। পাশের ঘরে কাজ করছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৮৮৫ সালে তাঁর জন্ম হয়েছে। আর এখানে কাজ করছি আমরা যাদের কারুর জন্ম ১৯২৫-এ, কারু বা ১৯৩০-এ, কারুর বা আরো পরে। সাড়ে ন'টা অফিসের সময়। তরুণরা যদিবা বিলম্বে আসেন, ড. শহীদুল্লাহর কোনো বিলম্ব নেই। একবার নাকি পরিচালক অফিসের সময়ের নিয়মানুবর্তিতার জন্য অফিসের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে ড. শহীদুল্লাহ সেদিন কয়েক মিনিট দেরিতে পৌঁছেছিলেন। পাছে তিনি মনে করেন যে, তাঁর কারণেই পরিচালক দাঁড়িয়ে আছেন, এজন্য সৈয়দ আলী আহসান দ্রুত সরে গিয়েছিলেন প্রবেশ পথ থেকে। কিন্তু শহীদুল্লাহ সাহেব নিজেকে ক্ষমা করেন নি। নিজের ছাত্রকে যেমন তিনি মোবারকবাদ জানিয়ে পরিচালক মেনেছেন, তেমনি উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে তিনি তাঁকে গিয়ে তারপরেই বলেছেন : দেখ, আজকে আসতে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। তাঁর এ কৈফিয়ত পরিচালকের জন্য অধিক বিব্রতকর হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন : 'স্যার,

আপনি আমার অপরাধ মাফ করবেন। আপনার জন্য বিলম্বের কোন প্রশ্ন নেই। আপনি যখন আসা সম্ভব মনে করবেন তখন আসবেন।' কিন্তু এ তো আমাদের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য যে নিয়ম হিসাবে কখনো তিনি বিলম্বে আসার নিয়ম করেন নি।

এ মানুষটিকে এত কাছে পেয়েছি বলে আমাদের সৌভাগ্যের এই আকস্মিকতার বিষয় আমরা চিন্তা করি নি। নিজের ধর্ম-প্রাণতা, জাগতিক মূল্যবোধে নিজের বিচার যেমন তিনি কোনোদিন ত্যাগ করেন নি, তেমনি নতুনকে উদার হৃদয়ে স্বীকার করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। দীর্ঘ ব্যবধানের পর ১৯৬২ কিংবা '৬৩ সালে যখন এসে তাঁর পায়ে হাত রেখে সালাম করে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, আমাকে কি আপনার মনে আছে? আমি আপনার ...' আমরা কথা শেষ হবার আগেই তিনি বলে উঠলেন : 'তুমি আমাদের ফজলুল হক হলের ছাত্র ফজলুল করিম না?' তারপর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে সঙ্কুচিত করে তুললেন। বললেন : 'ইয়া আল্লাহ! দশ বছর তুমি বন্দী ছিলে!' আমি বললাম : 'হ্যাঁ স্যার, এককালীন না হলেও মোট তাই।' তিনি বললেন : 'তুমি লিখ না তোমার জেল জীবনের কথা!' আমি আরো সঙ্কুচিত হয়ে বললাম : 'স্যার, সে কিছু নয়। কিন্তু আমরা চাই আপনি লিখুন আপনার জীবনের কথা, আমাদের জন্য। আপনার তো একটি শতাব্দীর ইতিহাস। সে ইতিহাসে আমরা বাঙালি মুসলিম সমাজের নবজাগরণের ইতিহাস পাব।'

এমন দাবিতে তিনি বিচলিত হলেন। বললেন : 'দেখ, আমার সময় কোথায়? এই তো 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে'র কাজ করছি। 'ইসলামী বিশ্বকোষে'র রচনার দিকও দেখতে হচ্ছে। তারপর ইউনিভার্সিটিগুলোর পেপার—সেটার খাতা দেখার কাজ রয়েছে। দেখি আল্লাহ যদি সময় দেন।'

হয়ত আমরা মনে করেছি, তিনি এ কাজ না করে সে কাজ করলে পারতেন। তিনি কেন সাধারণ পাঠ্য বই-এর প্রবন্ধ লেখেন। তিনি কেন যে কোনো মজলিসে যান। কেন তিনি গবেষণামূলক কাজে আরো গভীরভাবে নিবিষ্ট হন না। কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিরামহীন কাজের লোক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের লোক ছিলেন তিনি। যে কোনো মজলিসে তিনি যেতেন। কোন দাওয়াতকে তিনি নামঞ্জুর করেন নি। কেউ ফোনে কথা বলেছে : 'স্যার, আপনি আগামী মাসের এই তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমাদের স্কুলের মাহফিলে প্রধান অতিথি হবেন।' তিনি ফোন ধরে বলেছেন : 'একটু রাখুন, আমার নোট বইটি দেখে নিই।' এই বলে ফোন রেখে খড়মের খুট খুট শব্দ তুলে নিজের ঘরে যেয়ে নোট বই এনে মিলিয়ে নিতেন সেই তারিখে অপর কোন ওয়াদা তিনি ইতোপূর্বে করেছেন কিনা। শুধু শহরের অনুষ্ঠান নয়, দূর কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর কিংবা বরিশাল—বাংলাদেশের এমন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চল ছিল না যেখান থেকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ডাক না আসতো। প্রতিটি ডাকে তিনি সাড়া দিতেন। আমি নিজেও বলেছি : 'এই শরীরে এত বেশি যাতায়াত আপনি নাই-বা

করলেন।' তিনি হেসে বলতেন : 'লোকের আবেদন নাকচ করি কেমন করে?' একদিন বললেন : ডাক তো কেবল আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম থেকে নয়, ডাক তো আমার দেশের বাইরে থেকেও আসে। এই তো এসেছিল ডাক সারা ভারত ভাষা সম্মেলনের পক্ষ থেকে। কিন্তু সেখানে যাওয়া তো দূরের কথা, কেন তারা ডাকল তার কৈফিয়ত দিয়েই তো কূল পাচ্ছি নে।

এমন অভিযোগের জবাব আমাদের পক্ষে দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না।

শিশুর মতো সরল ছিলেন তিনি। রিক্সাওয়ালার সাথে দর করে ভাড়া ঠিক না করে রিক্সায় উঠতেন না। দরে না বনলে যতক্ষণ না রিক্সা পাওয়া যায়, ততক্ষণে হেঁটে এগুতে থাকতেন। আমরা হয়ত তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে সরল মন্তব্য করেছি। কিন্তু ড. শহীদুল্লাহর নীতিটি বুঝা কষ্টকর নয়। তাঁর নীতি ছিল : 'রিক্সায় যখন উঠি, তখন আমি যাত্রী, সে মালিক। তার সঙ্গে চুক্তি না করে আমি কেন উঠব এবং চুক্তির ক্ষেত্রেও তারও যেমন দাবি থাকবে, আমারও তেমনি বক্তব্য থাকবে। আর রিক্সা না পেলে এক পা-ও হাঁটতে পারব না এবং রিক্সা পেলেই উঠে পড়ব, নতুন যুগের এমন নীতি নিলে পায়ের বল যা আছে, তাও তো আমি হারিয়ে ফেলব।' এ তাঁর সচেতন নীতি ছিল। তাই এতে কোনো সঙ্কোচ ছিল না। এই সক্রিয় থাকার কথা তিনি সব সময়েই বলতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা, আমি যেন কাজ করতে করতেই তাঁর কাছে চলে যেতে পারি। কাজের জন্য যে দৃঢ় মনোবল তিনি পোষণ করতেন তার জোরেই তিনি ইতোপূর্বের গুরুতর অসুস্থতার আঘাতকে কাটিয়ে উঠে আবার পড়াশুনায় মন দিয়েছিলেন, আর সেই কাজের মধ্যেই তিনি লোকান্তরে যাত্রা করেছেন।

একদিন তাঁকে খুব ক্ষুব্ধ দেখেছিলাম। কতো লোক কতো খেতাব পাচ্ছে। উচ্চ খেতাব, মধ্য খেতাব, নিম্ন খেতাব। রাষ্ট্রীয়ভাবে তিনি কোনো খেতাব পেলেন না। খেতাবটা যে মানবীয় ব্যাপার এবং বিশেষ মানুষের রুচি, চিন্তা, বিচারবোধ, বিবেচনা যে রাষ্ট্রীয় খেতাবের ঘোষণায় প্রকাশিত হয়, এ সত্য নজরে রাখা কঠিন বই কি! ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বললেন : 'কিন্তু দেখ, আমি কিছু পেলাম না।' এমন ক্ষেত্রে কিছু বলা অসম্ভব। এ ব্যাপারে সেদিন কেবল আমার আন্তরিক অনুভূতির কথাই বলতে পেরেছিলাম। বলেছিলাম : 'স্যার, আপনি যে পেলেন না, এটাই কিন্তু আমাদের কাছে একটা বড় সম্মানের ব্যাপার হয়ে থাকবে।' আজও আমাদের কাছে ড. শহীদুল্লাহর এটাই একটা বড় পরিচয় যে তিনি কোনো খেতাব পাননি, যা আর দশজনে পেয়েছে। কেননা তিনি অপর দশজনের চেয়ে পৃথক ছিলেন।

১৯৬৯

লোককবি রমেশ শীল স্মরণে

প্রায় পনের বছর আগে বন্দী নিবাসে বসে লেখা নিচের রোজনামচাটির কোনো কথা পরিবর্তন করার কিছু নেই। রোজনামচা রাখার অভ্যাস এই বন্দীর ছিল না, এটি একটি একক ব্যতিক্রম। দেওয়ালের বৃত্তে ঘেরা বন্দী নিবাস যেন মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান একটা উপগ্রহ। পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীর পরিক্রমের সঙ্গে তারও পরিক্রমণ। তবু মোহময় পৃথিবীর সঙ্গে তার কী দুরতিক্রম্য ব্যবধান, মানুষগুলোর জীবনে কি মর্মান্তিক বর্ণহীন একঘেয়েমি : কেবলি সূর্য ওঠা আর সূর্য ডোবা। দেয়ালঘেরা সেই পৃথিবীতে একঘেয়েমিটা বিস্ময়ের ছিল না। বিস্ময়ে জাগত যখন দেখতাম আচম্বিতে সেই জগতেও জীবনের জোয়ার বইছে। বদ্ধ ডোবার বাঁধ ভেঙে তখন যেন কলকল করে জীবন নদীর স্রোত চলত। এমনি জীবনের ধারা নিয়ে এসেছিলেন ১৯৫৫ সনের কোনো একদিন একজন বন্দী, যাঁর বয়স তখন ৭৪ পেরিয়ে ৭৫-এ পড়েছিল, মাথার বিরল চুল কগাছি যাঁর রেশমী সুতার মতো, চক্ষু যাঁর কোটরাগত। এমন মানুষের মধ্যে আমরা জীবনের স্রোত ও বেগের কথা ভাবতে পারি নে। কিন্তু এ বৃদ্ধ বন্দী সেদিন যে আমাদের এই সাধারণ ধারণাকে এক বিস্ময়কর আঘাতে বদলে দিয়েছিলেন তাই নয়, শত বন্দীর মৃতপ্রায় দেহে তার জীবনের তাপে নতুন জীবন সঞ্চার করেছিলেন। সেদিনের অভিজ্ঞতা আজকের ভাষায় তুলে ধরা সম্ভব নয়। পুরানো ছিন্নপ্রায় কাগজের বুকে বিলীয়মান রেখায় সেদিনের রোজনামচাটিতে চোখ বুলিয়ে সেই বৃদ্ধ মানুষটিকে আবার আমি নিজের চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখলাম। এ বৃদ্ধ আজ আর এ জগতে নেই। কিন্তু তাঁর কাছে জীবন লাভের একটা ঋণ রয়ে গেছে। এ ঋণের শোধ নেই। নিজের মনে সে জন্য কৃতজ্ঞতাবোধেরও শেষ নেই। হয়ত এমন ভাবটি আরো কোনো সুহৃদের আছে, কোন পাঠকের। সে ধারণাতেই সেদিনের এই রোজনামচাটি আমি নিচে তুলে দিলাম।

কবি রমেশ শীল* ।

নামটি অনেকের কাছে অপরিচিত। এঁকে যাঁরা দেখেন নি তাঁদের পক্ষে এই মানুষটির অসাধারণত্বের বিষয় কল্পনা করা সম্ভব নয়। আর যাঁরা দেখেছেন, তাদের পক্ষেও তাঁকে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। আজ হয়ত তাঁর জন্মদিন নয়। কিন্তু কবি রমেশ শীল কেবল তাঁর জন্মদিনেই স্মরণীয় নন।

১০ই মে, ১৯৫৫ : ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬২ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। কবি রমেশ শীলের জন্মদিবস ... অনুষ্ঠানের একটা সময়ের সমস্ত বন্ধুর তরফ থেকে কবি রমেশ শীলকে কিছু বলতে অনুরোধ করলাম। সহজ অনবদ্য ভঙ্গীতে তিনি ছড়া কেটে সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ জানালেন।

বন্ধুগণ আজ আমার জন্মদিনে
আমি নিরক্ষর জনে
যে আদর করালে প্রদর্শন
আপনাদের সৌজন্যে
আমিও হয়েছি ধন্য
তাই অভিনন্দন করিতেছি জ্ঞাপন

দীর্ঘ অনুষ্ঠানের একঘেঁয়েমি কোথায় যেন উড়ে গেল। বন্ধুরা খাট ছেড়ে কম্বলে নেমে জ্যাঠামশাইকে ঘিরে বসলেন। মনে হল ঠাকুরদা তার সামনের নতুন যুগের পরম স্নেহাস্পদদেরকে পরম তৃপ্তির সঙ্গে তাঁর আশীর্বাদ দিচ্ছেন : ৭৪ বছরের অভিজ্ঞতার আশীর্বাদ; চুয়াত্তর বছর ধরে তৈরি করা দীর্ঘ-জীবন সড়কের অভয়বাণী শোনাচ্ছেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম, প্রতিটি কথা শুনলাম আর অবাক বিস্ময়ে ভাবলাম, জীবনের প্রতি বিশ্বাস, গতির প্রতি ভালোবাসা কতখানি আত্মজাত হয়ে গেলে এমনি সহজভাবে এমন শক্তির সৃষ্টি করে একজন লোক কথা বলতে পারে। সত্যের জন্য, মুক্তির জন্য স্বামীজীর শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি, মাইজভাণ্ডারে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু জীবনের ও সমস্যার অস্বাভাবিক ব্যাখ্যায় তিনি ঘা খেয়েছেন। জীবনের স্বাভাবিকতা, সৌন্দর্য ও গতির আকর্ষণ তাঁকে আবার জীবনের স্বাভাবিক পথে নিয়ে এসেছে। ... আমি দুঃখ করে ভাবছিলাম : বিষয়কে লিখে তো কিছু হবে না। এ-ভঙ্গীকে আমি ফুটিয়ে তুলব কী করে। এ জীবনবোধকে লিখে রাখব কোন উপায়ে! এমন কোনো সংকেত যদি জানতাম, যা শুধু কথা নয়—কথার ভাবকেও এমনিভাবে ধরে রাখতে পারে তাহলে হয়ত একে স্থায়ী করে রাখা সম্ভব হত।

বিচ্ছিন্নভাবে, সন-তারিখের খেয়াল না করে মাটির মানুষ রমেশ শীল কথা বলে বলে এগিয়ে যাচ্ছেন। শুনতে শুনতে এক জায়গায় চমকে উঠলাম : ৭৪ বছরের বৃদ্ধ কবি রমেশ শীল বলছেন : ... জীবনের এমন দিনে কে যেন হাতে

* জন্ম : ২৬শে বৈশাখ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, মৃত্যু : ৬ই এপ্রিল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।

দিয়ে গেল 'সাম্যবাদের ভূমিকা'। আমি পড়লাম। মনে হল, আমার চোখের সামনে সব যেন বদলে গেল। আমি যেন এক নতুন রাজ্যে এলাম। প্রশ্ন জাগল মনে, কোথায় ছিলাম আমি।

তখনো নিশ্চয়ই তাঁর পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স। ভাবলাম, নতুন চেতনাকে স্বীকার করার কী সহজ সরল ক্ষমতা! কারাগারে এসে অবধি অশিতিপ্রায় এই বৃদ্ধ গানে, গল্পে, হাসি-ঠাট্টায়, জীবনের উচ্ছ্বাসে সকল বন্দীকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছেন; কতোজনের কত দ্বন্দ্ব ও সংশয়কে মুছে দিয়েছেন। নিজে কখনও নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন নি। অথচ কতো সংশয়, কতো যে ঝড়-ঝঞ্ঝার আঘাত গ্রহণ করে ক্রান্তিকালের পর ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে মহৎ থেকে মহত্তর ভবিষ্যৎকে তিনি তৈরি করেছেন। রমেশ শীল বলে চলেছেন : '৪৭ সালের গোলযোগে ভেঙে পড়লুম। কিন্তু '৫২ সালে ঢাকার ছাত্ররা, মুসলিম ছাত্ররা 'গুলি খাইল'। আমি সে ঘটনার কথা শুনে মনে মনে বললাম : 'না, আবার দেশ জাগবে। জাগবে। তারপর নির্বাচনকালের কথা তো বলার দরকার করে না। কিন্তু ৯২ ধারাতে আমার মনে গোস্বা এল। পুলিশ আমার বাড়িতে হানা দিল। আমি পলাতক হলাম। তারপর একদিন গ্রেফতার হলাম। জেলে আসতে প্রথমে ভয় হয়েছিল। কিন্তু জেলে এসে বন্দী জগতের মানুষের যে স্নেহযত্ন পেয়েছি তাতে আমার মনে হয়েছে আমি যেন স্বর্গে এসেছি!'

চোখ তুলে দেখলাম, বৃদ্ধ কবি রমেশ শীলের চোখ থেকে তাঁর সামনের শতাধিক রাজবন্দীর প্রতি যেন স্নেহ দৃষ্টি ঝরে পড়ছে। কবি বলে চলেছেন : ২১শে ফেব্রুয়ারি এবার যখন দেয়ালের এপারে বসে ওপারের শ্লোগান শুনলাম আর পরদিন দেখলাম দলে দলে ছেলেরা-মেয়েরা বন্দী হয়ে আসছে, তখন ভাবলাম, না, জীবন মরে নি, জীবন আছে।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : ওরা আমার অনেক নিয়েছে, অনেক পাণ্ডুলিপি, অনেক গান।

এবার কণ্ঠ দৃপ্ততর করে বললেন : কিন্তু আছে আমার আরো বেশি। অনেক আছে।

আমার চেতনার তন্ত্রীতে ঘা পড়ল। অপর কারু মুখে কথাটা দম্ভ বলে শোনাত। কিন্তু সমুদ্রের আবার দম্ভ কী? বহু যুগ আগের এক স্বভাব কবি ঘোষণা করেছিলেন : "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" আর এক যুগে সেই বাংলারই মাটির একান্ত কাছাকাছি আর এক কবি তাঁর সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন : 'মানুষে মানুষে বিভেদ আমাকে বেদনা দিয়েছে।' আর তাই সমস্ত জীবন তিনি এমন এক জীবনের সন্ধান করে এগিয়েছেন, যেখানে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই। মেথর, মুচি, সম্প্রদায়ের ভেদ এবং শোষণের, অবমাননার যেখানে অবসান হবে। সেই অনুসন্ধানে অনুসন্ধানে আজ মানুষের মহৎ স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের নিশ্চিত সড়কে এসে বলছেন : আমি যেন নতুন জীবন পেলাম।

আপনাদের মাঝে এসে মনে হচ্ছে আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হবে। এক জাত, এক ভাত, এক কথা, এক ব্যথা আমি বাস্তবভাবে দেখতে পেয়েছি।

'I will not rest!' কথাটা কতো সুন্দর। কথাটা শুনলাম আবার রমেশ শীলের মুখে : "আমার শরীরে হয়ত কুলোবে না। কিন্তু আমার মন আছে। আমার ইচ্ছা করে যদি সুযোগ পাই তবে আজ আবার আমি বাংলার সব জেলায় ঘুরে ঘুরে সুখ-দুঃখের গান গাই।"

বন্দীরা সবাই কবিকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকে। জ্যাঠামশাই কথা কয়টি শেষ করে হেসে উঠলেন। আমি আফসোসে চমকে উঠলাম : আহ! শেষ হয়ে গেল এমন সুন্দর ভাষণটি।

রমেশ শীলের কবিতা ও গানের বই চট্টগ্রামে হয়ত কিছু পাওয়া যায়। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তাঁর সমগ্র রচনা সংকলিত করে প্রকাশ করতেন, তাতে তাঁর জীবন বোধের সমগ্র প্রকাশ পাঠক সমাজ পেতে পারত। বন্দী নিবাসে তাঁর চৌকির কাছে বসে তাঁকে তাঁর কবিতা বলতে অনুরোধ করলেই নিজের স্মৃতির পট থেকে অবিরল ধারায় তিনি তাঁর কবিতা উদ্ধৃত করে শুনিয়েছেন।

'ও বাঙালি ভাই রে, তুই রমনার পথ রক্তে ভাসাইলি' তাঁর এ রকম গান ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় সকল মানুষের কণ্ঠের গান ছিল। আমি তাঁর মারফতি ভাবের কয়েকটি গান কবির মুখ থেকে শুনে লিখে রেখেছিলাম। কারণ জন্মগতভাবে হিন্দু হয়েও তাঁর জীবনে ও সৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের পুরাণ ও কাহিনী যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশিত হয়েছে তা আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছেন। বন্দী নিবাসে বসে কবির কাছ থেকে শোনা মারফতি কয়েকটি গানের কথা এখানে তুলে দিলাম।

১

আউয়াল আখেরে মাওলা,
তুই মাওলা তুই রে।
জাহেরে বাতেনে মাওলা তুই রে,
হাসরে নশরে মাওলা তুই
মাটির পুতলা বানাই
সঞ্চারিলি রুহু।
ওঠে আদমের কলবে আওয়াজ ...
আল্লাহু আল্লাহু ॥
দুনিয়া জলেতে ডুবাই
কেয়ামত দেখালি
ঘোর তুফানে নূহ নবীর

কিস্তিখান বাঁচালি ॥
বোয়াল মাছে গিলেছিল
ইউনুস ফয়গম্বরে
দোয়া ইউনুস অছিলায়
মুক্ত করলি তারে ॥
খলিলকে আগুনে ঢালে
নমরুদ বেঈমান
জ্বলন্ত আগুনে দেখালি
ফুল বাগান ॥
ছালে জঙ্গির পরে আসি
দেখালি প্রতাপ
বোগদাদে করে দিলি
কবর আজাব মাফ ॥
মনসুরের কলবে ঢুকি
'আনাল হক' বানালি
শূলেতে চড়াইয়া আবার
জগতকে দেখালি ॥
মানুষের কলবে থাক,
কেউ পায় না চিন
আজমীরে উদয় হলি
খাজা মইনুদ্দীন ॥
(এবার) খাতেমুল বেলায়েত নিয়ে
ভাণ্ডারে* উদয়
রমেশ বলে, ঠিক চিনেছি,
আর তো কেহ নয় ॥

২

তোর খোদা তোর সঙ্গে আছে
চিনে লও তারে
জ্ঞান নয়নে দৃষ্টি কর
হৃদি মাঝারে ॥
আগে শিখ পীরের যতন,
পীর উছিলায় পাবি চেতন

* ভাণ্ডারের-মাইজ ভাণ্ডারে

দেখবি রে অমূল্য রতন
নিজের ভিতরে।
কীটপতঙ্গ গাছে মাছে
ভুবনে যা যত আছে
এক ভাণ্ডারী খেলিতেছে
সকলে পরে ॥
বিশ্বরাজ্যে একজন রাজা
যার গুণে এই জগৎ তাজা
রমেশ কয় সে মার মজা
যে বুঝতে পারে।

৩

মাওলা, এশকের মামেলা বুঝে
সাধ্য আছে কার
এশকেতে মজিয়া প্রভু
সৃজিল সংসার।
আশেকীরা এশকের জোরে
অঘটন ঘটাইতে পারে
মেয়েমানুষ পুরুষ করে
বোগদাদে প্রচার।
এশকবাজী সহজ নয়।
ডাকাইত আউলিয়া হয়
সাক্ষী আছে নিজামউদ্দীন
আউলিয়ার সর্দার।
করনেতে ওয়াজকরনী,
নবীর দন্ত পড়ে শুনি
সর্বদন্ত ফেলে দিল
এশকে আপনার।
শমশের তবরেজ প্রেমে ব্যস্ত,
খুলে দিল নিজের পোস্ত*
মাওলার প্রেমে হেস্তনেস্ত
মস্তই কারবার।
রমেশ বলে ভাবি মনে,

* পোস্ত-চামড়া

সাধন হয় না, এশক বিনে
শুকনা গাছে ফুল ফোটে না,
করে চাও বিচার ॥

৪

নিশি ভোরে যায় ফাঁকি দিয়া রে
সোনার আদম
নিশি ভোরে যায় ফাঁকি দিয়া ।
অজু কইরে হও পাক ।
তনুমন কর ছাপ
বস নিজের তজবী হাতে লইয়া ।
পড় মাবুদের কালাম
মুর্শিদ আউলিয়ার নাম
মুশকিলেতে যাবে আসান হইয়া ॥
আলেম তালেব যত
নিশিতে হয় অনুগত
... ...

বন্ধুর স্মৃতি

টেলিভিশনের সামনে বসে থাকিনে। তবু গত রাত্রে (২৩শে জানুয়ারি '৮১) শুতে যাবার আগে পাশের ঘর থেকে টেলিভিশনের শেষবারের খবরের একট শব্দ হঠাৎ কানে খট করে বাজল "সৈয়দ নুরুদ্দিন, প্রখ্যাত সাংবাদিক ... ।" খবরের বাকি অংশ আমি শুনিনি। বুঝলাম, যে আশঙ্কা মনে ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে। এত শীঘ্র!

সৈয়দ নুরুদ্দিনের কি ৫৮ বছর বয়স হয়েছিল? আমি জানতাম না। আমাদের পরস্পরের বয়সের খবর আমরা রাখতাম না। আমরা কেউ একে অপরকে বলতাম না : তুমি বুড়িয়ে গেছ, তোমার চুল পেকেছে। কারণ আমাদের যখন দেখা হত, (এবার দেখা হল 'সংবাদ' অফিসে, অনেক বছর পরে) তখন আমরা বর্তমানে থাকতাম না। ফিরে যেতাম আমাদের কৈশোরে, আমাদের তারুণ্যে। বর্তমান তো কঠিন, বর্তমান তো জটিল। বর্তমানে তো আমি সাংসারিক। যার সংসার তার সমস্যা। এ সমস্যার আলোচনার শেষ কোথায়? আর এতে কাকে আমরা কতটুকু সাহায্য করতে পারি? তাই দেখা হলে সৈয়দ নুরুদ্দিন বলত : আরে সরদার! মনে আছে তোমার সেই ফজলুল হক হলের পূর্ব দিকের ২৬ নম্বর ঘরের কথা? যেখানে তুমি থাকতে আর সেই যে আমরা হলের কাছের পুকুরঘাটে যুদ্ধের সময়ে পাওয়া আমাদের ইংরেজ-আমেরিকান প্রগতিপন্থী সৈনিক বন্ধুদের নিয়ে বসে কত গল্প করতাম। মনে আছে সে কথা? সেই স্মৃতিতে অবগাহন করে বর্তমানের সঙ্কটের মধ্যেও আমরা পরস্পর বাঁচতে চাইতাম। কিন্তু পরস্পরের সেই সম্বোধন যে এত শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে, একজন আর স্মৃতির উল্লেখ করবে না, কেবল স্মৃতি হিসেবে উল্লেখিত হবে, এত শীঘ্র, মাত্র আটান্ন বছর বয়সে, তা সেদিনও এত গুরুতরভাবে আশংকা করিনি যেদিন 'সংবাদ'-এর সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত এসে খবর দিলেন, সৈয়দ নুরুদ্দিনের 'হার্ট স্ট্রোক' হয়েছে আর তিনি সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মনে একান্ত ইচ্ছা হয়েছিল,

হাসপাতালে দেখতে যাব। কিন্তু আবুল হাসনাত বলেছিলেন, এখন একেবারে রেস্ট দরকার। হাসপাতালে ভিড় না করাই ভালো। আমি তাই কেবল অপেক্ষা করছিলাম, কবে নুরুদ্দিন ভালো হয়ে অফিস করতে আরম্ভ করবে এবং আমি 'সংবাদ'-এ যেয়ে তাকে বলব, দেখ, 'মুজাফফর আহমদ চৌধুরী স্মারক গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়েছে। বল, কেমন হয়েছে? এবার তোমাকে এর একটি আলোচনা লিখে দিতে হবে। 'না' বললে চলবে না। মুজাফফর সাহেবকে তুমিও তো ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলে। আসলে নুরুদ্দিন নিজে আজকাল স্বেচ্ছায় সাহিত্য চর্চা না করলেও এই গ্রন্থের কথা শুনে আগেই বলেছিল : 'আমি নিশ্চয়ই এ বইয়ের আলোচনা লিখব।' সৈয়দ নুরুদ্দিনকে এ বই আর উপহার দেওয়া হবে না। জীবনের অমোঘ নিয়মে, আকস্মিকভাবে সৈয়দ নুরুদ্দিন, সেই সদাহাস্য, আমুদে, উদার-হৃদয়, অপরকে উৎসাহদানকারী, অপরের মধ্যে গুণের অন্বেষণকারী সুহৃদ একেবারেই বিনা নোটিশে নীরব হয়ে গেল। মৃত্যুর পরের দিন বায়তুল মোকাররমে শুভ্র কাপড়ে আচ্ছাদিত সুহৃদের সেই নীরব নিথর দেহটির কথা চিন্তা করতে করতে এই আফসোসই আমার মনে জাগছিল।

সৈয়দ নুরুদ্দিনের সঙ্গে সত্যই বহুদিন দেখা হয়নি। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল সেই ১৯৪২ কি '৪৩ সালে। তখন আমরা বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। ফজলুল হক হলের বাসিন্দা।

নুরুদ্দিনকে ঢাকা কলেজে পেয়েছিলাম বলে মনে করতে পারছিনে। বোধহয় সে সানাউল্লের সঙ্গে (কবি সানাউল হক) আই. এ. পাস করেছিল। বি. এ. তে নুরুদ্দিনের ছিল ইতিহাস। আমার দর্শন। সানাউল হকের অর্থনীতি। সঙ্গী আরো ছিল। আবদুল মতিন ছিল বিজ্ঞানের। (পরবর্তীকালের সাংবাদিক, বর্তমানের ইংল্যান্ডবাসী)। কামাল ছিল অর্থনীতির। (কামাল উদ্দিন বর্তমানে শিল্প ব্যাঙ্কের অধিকর্তা)। বয়সের ও পাঠের শ্রেণীগত তফাৎ ছিল আমাদের, কেবল বিষয়ের নয়। কিন্তু তাঁর খোঁজ আমরা রাখতাম না। আমাদের সবার বয়স ছিল এক এবং সকলে বিষয়ও এক। সে ইতিহাস বা দর্শন বা অর্থনীতি নয়। সে বিষয় ছিল জীবনকে সুন্দরভাবে দেখা, মন ও চোখ খুলে দেখা এবং দেখা ও জানার প্রচেষ্টায় পরস্পরকে সাহায্য করা।

জীবনকে দেখার এই আগ্রহেই আমরা উল্লিখিত নামের তরুণ শিক্ষার্থীরা এবং এই ধরনের আরো কিছু মুসলিম তরুণ একদিন সমাজতান্ত্রিক জীবনবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। আর এ প্রসঙ্গেই স্মৃতিতে ভেসে উঠে ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতার লাভেরও পূর্বেকার সেই চল্লিশের দশকের ঢাকার সাহিত্য সংস্কৃতিগত জীবনের কথা।

১৯৪২ সনে সোমেন চন্দ নিহত হন। সোমেন চন্দ ছিলেন এক তরুণ শ্রমিক আন্দোলনের সচেতন কর্মী। তিনি মিটফোর্ড মেডিক্যালে পড়তেন। রেলশ্রমিকদের তিনি নেতৃত্ব দিতেন। তাদের জীবনের সাথে তিনি একাত্ম হয়ে

গিয়েছিলেন। ১৯৪০ থেকে '৪২-এর কথা। যুদ্ধ চলছে। দেশে কংগ্রেসের আন্দোলন চলছে। স্বাধীনতাকামী, এমন কি তার বামপন্থী অংশেও যুদ্ধের চরিত্র নিয়ে ব্যাখ্যার ভিন্নতা চলছে। এসব আমরা মুসলিম ছাত্ররা তেমন কিছু জানতাম না। কিন্তু বামপন্থীদের ব্যাখ্যার ভিন্নতা ও আত্মকলহে এক উগ্র উপদলের হাতে সেদিনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ নিহত হলেন। তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনাও তাৎক্ষণিকভাবে আমরা জানিনি। তবু সোমেনের জীবনের আদর্শ ও তাঁর আত্মত্যাগর কাহিনী কালক্রমে আমাদেরকে, মানে আমাকে, সৈয়দ নুরুদ্দিনকে, সানাউল হককে, মুনীর চৌধুরীকে, আবদুল মতিনকে টেনেছিল ঢাকার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সংস্পর্শে ও তার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে। এই সংঘেরই সংগঠক ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, অচ্যুৎ গোস্বামী, সরলানন্দ সেন, অমৃত দত্ত ও সত্যেন সেন। সত্যেন সেন ছিলেন কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু গ্রাম থেকে ঢাকায় এলে এই সাহিত্য সংঘকেও তিনি সক্রিয় করার চেষ্টা করতেন। এই প্রগতি লেখক সংঘের সাপ্তাহিক কি পাক্ষিক বৈঠক সেই কোর্ট হাউজ স্ট্রিটে বা ঢাকা কোর্টের পূর্বদিকে এখন যেখানে একটি ওভার ব্রিজ উঠেছে তার কাছে পাতলাখান গলির মুখের তিনতলা দালানটির বৈঠকে যোগ দিতে আমরা, এই দলটি যেতাম ঢাকার উত্তর মাথা ফজলুল হক আর সলিমুল্লাহ হল থেকে পায়ে হেঁটে, রাস্তা জুড়ে গল্প করতে করতে করতে। ফজলুল হক থেকে কোর্ট হাউজ স্ট্রিট—কোনদিন আমরা যে কোনো গাড়িতে চড়ে গেছি (সেকালে রিকশা ছিল না, ছিল কেবল ঘোড়ার গাড়ি) এখন একেবারেই মনে করতে পারিনে। আমাদের খোশগল্পে সমস্ত পৃথিবীর গণআন্দোলনের পর্যালোচনায় কখন যে এই পথ শেষ হয়ে যেত তা আমরা টেরই পেতাম না। প্রগতি লেখক সংঘের বৈঠকের স্মৃতিও মধুর। সেখানের সৈয়দ নুরুদ্দিন অবশ্যই কবিতা পাঠ করেছেন। কিন্তু তার নমুনা আজ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত।

ফজলুল হক হলের পাশে পুকুর ঘাটের আড্ডার স্মৃতিও কম ছিল না। সে স্মৃতিতেও সৈয়দ নুরুদ্দিনের হাসি-ঠাট্টা, কবিতা-পাঠ, গল্প শোনা ও পড়া ভেসে উঠছে। মোট কথা একটি ভিন্ন জগৎ, সুহৃদদের জগৎ। এর স্মৃতিতে আজ আনন্দ বই দুঃখের কোন রেশই খুঁজে পাচ্ছিনে। বস্তুত সেদিনকার সে জীবনে জগৎকে দেখা ও জানার ক্রমাগত চেষ্টায় আনন্দ বই দুঃখের কিছু ছিল না। আর এই বন্ধু-সংঘের নিত্যসঙ্গী ছিল সৈয়দ নুরুদ্দিন। ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ের আড্ডা ছিল একেবারে আন্তর্জাতিক। পাশে ছিল আশরাফের রেস্তোরাঁ। সেখান থেকে আসত চা কিংবা মাখন টোস্ট। আর সাহিত্যের আলোচনা চক্রে কেবল হলের আমরা ও শহর থেকে আসা রণেশ বাবু বা অচ্যুৎ গোস্বামী বা তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী রবি গুহ, মদন বসাক, অনিল বসাক এবং দেব প্রসাদ মুখার্জী নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈনিক অধ্যাপক রাপাপোর্ট ও স্প্রিঙ্গার কিংবা ইংরেজ অপর কোন সৈনিক বন্ধুও থাকতেন। আর তাতে যেমন বাংলা সাহিত্য আলোচিত

হত, তেমনি আলোচিত হত ইংরেজি ও রুশ সাহিত্য। চল্লিশের দশকের প্রগতিপন্থী সেই ধারাটির স্মৃতি আজ আমার মনেও আবছায়ার মতো হয়ে আসছে। এটাই স্বাভাবিক। বছরের দিক দিয়ে এই কালাতিপাতের বয়সও তো কম হল না। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বের কথা। সে যুগের কাগজপত্র আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ সেই প্রগতিপন্থী উদার চিন্তার ধারাটি পূর্ববঙ্গের প্রধান সমাজ, মুসলিম সমাজের মানস জগতের গণতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তিভূমি হিসেবেই কাজ করেছিল। তার ঘটনাদি, তার ব্যক্তিবর্গকে বিস্মৃত হতে দেওয়া উচিত নয়। তাতে আমাদের মহৎ ঐতিহ্য ও ইতিহাসে ছেদ বা শূন্যতারই সৃষ্টি হবে। আর সেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করলে তার মধ্যে সদাহাস্য উদার হৃদয় সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিক সৈয়দ নুরুদ্দিনকে স্মরণ না করে কারুর উপায় থাকবে না।

বহু বছর পরে, মাত্র কয়েক মাস আগে আবার যখন নুরুদ্দিনের সাথে দেখা হল তখন আমরা আমাদের সুখের স্মৃতির সাগরে অবগাহন করতে করতে পরস্পর পরস্পরকে বলেছিলাম : সেদিনের আমাদের সে জীবন অর্থহীন নয়, অর্থহীন নয় পরবর্তী বিকাশের জন্য। আর তাই তাকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে বিস্মৃত প্রায় ও বিলুপ্ত প্রায়ের ভাগ্য হতে। এ ব্যাপারে আমার আগ্রহের কথা প্রকাশ করে আমি বলেছিলাম : নুরুদ্দিন, আমি লিখব! কিন্তু শুরু করতে হবে তোমাকে। তোমার লেখা দিয়ে আমরা শুরু করব, আর আমাদের এই লেখার নাম দিব : চল্লিশ দশকের ঢাকা। আমার দাবি শুনে নুরুদ্দিন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বলেছিল, আরে আমি কী লিখব? কিন্তু আমার আস্থা ছিল, নুরুদ্দিনকে দিয়ে আমি লেখাতে পারব। একেবারেই যদি না লিখে তো আমি তাঁর কাছে যেয়ে বলব, 'তুমি তোমার স্মৃতিকথা বল, আমি লিখে নিচ্ছি, নয়ত টেপে টেপ করে নিচ্ছি।' কিন্তু এর কোনোটিই আর সম্ভব হবে না। একথা মনে করতেই বড় অসহায় বোধ হল নিজেকে নুরুদ্দিনের আচ্ছাদিত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রেসক্লাবের অসমাপ্ত ভবনের পশ্চিম দিকের কক্ষে।

* * *

উঁচুমানের সাহিত্যিক ছিলেন সৈয়দ নুরুদ্দিন। তাঁর অনুপম হস্তাক্ষরের মতোই ছিল তাঁর ভাষা ও রচনার শৈলী : কবিতা ও প্রবন্ধের। অথচ নিজের রচনাকে সংগ্রহ করে কখনো বই-এর আকার দিলেন না। তাঁর পক্ষে পুস্তকের আকারে তাঁর রচনা প্রকাশ করা আদৌ কোনো সমস্যার ব্যাপার ছিল না। অন্যকে প্রশংসা করতে, উৎসাহিত করতেই ভালোবাসতেন নুরুদ্দিন। নিজের রচনার ব্যাপারে যেন ছিল একটা নিষ্করুণ সমালোচনা আর পরিহাসের ভাব আর তাই এবার ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে যখন সংবাদে যোগ দিলেন তখন সে খবর পেয়ে দেখা করতেই বললেন : আরে সরদার, দেখ কী আশ্চর্য ব্যাপার। আমিও নাকি সাহিত্যিক আর

কবি! আর তাই বাংলাদেশের লেখক জ্যোতি প্রকাশ দত্ত ওয়াশিংটনে আমাদের সরকারি অফিসে সেই পরিচয়ে যখন খোঁজ করলেন সৈয়দ নুরুদ্দিনকে তখন কেবল অফিসের আমার সহকর্মীরাই নয়, আমিও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। নুরুদ্দিন বেঁচে থাকতে তাঁর তাচ্ছিল্যকে তাঁর সহকর্মীরা হয়ত অতিক্রম করতে পারেননি। কিন্তু আজ বাংলা সাহিত্যের স্বার্থেই অনুসন্ধান আবশ্যক সৈয়দ নুরুদ্দিনের রচনা প্রকাশিত অপ্রকাশিত অবস্থায় কোথায় ছড়ানো ছিটানো আছে। তা একত্রিত করে একটি সংকলনের রূপ দিতে পারলে সে সংকলন অবশ্যই একটি রুচিবান শিল্পী মনের উন্নত শিল্পরীতিতে প্রকাশিত সাহিত্য কর্ম বলে পরিগণিত হবে।

নুরুদ্দিনের বিরল রচনার নমুনার কথা চিন্তা করতে আবার মনে পড়ল সেই পুরোন দিনের কথা। প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। অধ্যাপক আহমদ শরীফ পুরোন জিনিস যত্ন করে রাখেন। তাঁর কাছেই পেয়েছিলাম সৈয়দ নুরুদ্দিন আর আমার ছাত্রজীবনের যে বাসস্থল সেই ফজলুল হক হলের বাংলা ১৩৫১ বা ইংরেজি ১৯৪৪ সনের বার্ষিক সাহিত্যপত্র 'কলাপী'র একটি সংখ্যা। আসলে কলাপী একবার মাত্র বেরিয়েছিল। সকালে ছাত্রদের দলের সাহিত্যপত্রকে হল বার্ষিকীই বলা হত। এর ব্যতিক্রম ছিল ঢাকার হল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ঢাকা হলের (বর্তমানে এ হলের নাম রাখা হয়েছে শহীদুল্লাহ হল) ছাত্ররা তাদের হল বার্ষিকীর নাম রেখেছিল : শতদল। আর তাদের অনুসরণে মুসলিম ছাত্রদের অন্যতম হল, ফজলুল হক হলের ছাত্র আমরা ১৯৪৪ সনে হল বার্ষিকীকে বার্ষিকী না বলে বলেছিলাম 'কলাপী' এবং ইংরেজি বাংলার বদলে কেবল বাংলা রচনাই এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তখনকার মুসলিম ছাত্রদের সাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে এ ছিল একেবারে নতুন সড়কের উদ্বোধন, একেবারে ব্যতিক্রম। আর এ কারণেই সেদিন আর এর অনুসরণ বা বৃদ্ধি ঘটেনি। কিন্তু ব্যতিক্রম ও সঙ্গহীন বলেই 'কলাপী' আজ উল্লেখযোগ্য। কলাপীর নামকরণ, তার একেবারে বেশি খদ্দরপ্রায় কাগজ এবং রচনার চরিত্রে বোঝা যায় কলাপী মুসলিম তরুণদের সাহিত্যে প্রচেষ্টায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে চাচ্ছে। এ সাহিত্যপত্রের সম্পাদনায় ছিলেন সেরাজুন নূর এবং নুরুল ইসলাম চৌধুরী। এঁরা দুজনেই পরবর্তীকালে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। নুরুল ইসলাম চৌধুরী বাংলাদেশের বৈদেশিক সারভিসের অন্যতম প্রবীণ সদস্য। ফজলুল হক হলের পরিচালনা পরিষদে প্রচার সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন সৈয়দ নুরুদ্দীন এবং কলাপী পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন সৈযদ নুরুদ্দিন। এই কলাপী পত্রিকাতে ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র হিসেবে আমরা একটি রচনা সৈয়দ নুরুদ্দিনের উৎসাহ এবং তাগিদের কারণেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া সৈয়দ নুরুদ্দিনের নিজেরও দুটি রচনা ছিল : একটি তাঁর কবিতা নাম একটি রোমান্টিক কবিতা এবং অপরটি ছিল কাজী মোতাহার হোসের সাহেবের প্রবন্ধগ্রন্থ 'সঞ্চরণ'-এর পরিচিতিমূলক আলোচনা। সৈয়দ নুরুদ্দিন তখন

২২ কিংবা ২৪ বছরের যুবক। তবু এ দুটি রচনাকে তাঁর সাহিত্যিক প্রকাশ ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলেই আমি মনে করি। (পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে সৈয়দ নুরুদ্দিনের নিবেদনটিও ভাষা মাধুর্যের জন্য এবং তৎকালীন আর্থিক-সাংস্কৃতিক সংকটের স্মরণী হিসেবে উল্লেখযোগ্য)। এ দুটি রচনার কথাই আমি সেদিন, মানে, মাত্র এক মাস পূর্বে ১৬ই ডিসেম্বরের সংবাদের সংখ্যার জন্য একটি লেখা দিতে গিয়ে তখনকার সাক্ষাতে নুরুদ্দিনকে বলেছিলাম। বলেছিলাম কাজী মোতাহার হোসেন সম্পর্কে তোমার আলোচনাটি সুন্দর হয়েছিল। সে লেখাটি আমি যত্ন করে কপি করে রেখেছি। আমার সে কথা শুনেও নুরুদ্দিন অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন : হা! হা! ছেলেবেলার ছেলেমানুষির কথা তুমি কি মনে করিয়ে দিচ্ছ?' কিন্তু আজ সেই লেখা দুটি এই সঙ্গে পুনঃপ্রকাশ করতে যেয়ে নুরুদ্দিনের অট্টহাসি যত কানে বেজে উঠছে তত আমার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। কবি সানাউল হকের 'চতুর্দশপদী' নামে দুটি সুন্দর সনেটও প্রকাশিত হয়েছিল সেই 'কলাপী'তে।

১৯৪৪ সনে প্রকাশিত ফজলুল হক হল সাহিত্যপত্র কলাপীতে সৈয়দ নুরুদ্দিনের লেখা একটি পুস্তক সমালোচনা। সৈয়দ নুরুদ্দিন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের ছাত্র।

সঞ্চরণ—কাজী মোতাহার হোসেন : জাতীয় জীবন যখন স্বাস্থ্যহীনতায় ধুঁকতে থাকে, তখন স্বভাবত তার রসনাও বিকল হয়; সুপথ্যের স্বাদ-গন্ধ কিছুই সে সহ্য করতে পারে না, অমৃতেও তার অরুচি হয়। এ সত্যের সাক্ষ্য-প্রমাণ মিলবে মুসলমান সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। বাঙালি মুসলমানগণ দীর্ঘদিন ধরে এমনকি এক অদ্ভুত 'নিওরটিক' ভবতন্দ্রায় আবিষ্ট হয়েছিল এবং তাদের দুর্বল চিত্ত থেকে এমনি ঘন আবিল বাষ্প বিনির্গত হচ্ছিল যে তাদের চিদাকাশে আলোক সঞ্চার করা নিতান্তই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ শক্তিমান জ্যোতিষ্কের যে একেবারে অপ্রতুলতা ঘটেছিল তাও নয়। ডা. লুৎফর রহমান, ইমদাদুল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসের এবং কাজী মোতাহার হোসেনের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন এবং অনুসন্ধিৎসু মনে কখনও সন্দেহ জাগে না। বলা বাহুল্য মাত্র যে এঁদের মধ্যে কেউ স্বীয় সাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেননি। এবং একমাত্র কাজী আবদুল ওদুদই নিজ সমাজের বাইরে প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পেরেছেন। অন্যান্য যাঁদের নাম করা হল তাঁদের প্রয়োজনীয় শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজ সমাজে কিংবা তার বাইরে যোগ্যভাবে আদৃত হননি। সাহিত্যে প্রাগ্রসর হিন্দু সমাজের সহজ গুণগ্রাহিতার অভাব নিতান্ত নিন্দার্হ : এরূপ অবহেলার ফলেই তাঁরা আজ লজ্জাহীনের মতো বলতে পারেন, মুসলমানদের তো জানি না বা চিনি না। খুব প্রশংসনীয় ব্যাপার নয় নিশ্চয়। সে যা হোক, আমাদের সমাজে অধুনা নবজীবনের সঞ্চার দেখা যাচ্ছে। পূর্ববর্তীদের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা এবং তাঁদের থেকে নির্দেশ লাভ করার এই উপযুক্ত সময়। নিজেদের

আধুনিকত্বের নিরর্থক অহমিকায় যদি আমরা পূর্ববর্তীদের অবহেলা করি তবে আমাদের নব যৌবন অচিরকালেই অন্ধতামসিকতায় আচ্ছন্ন হবে, এ এক প্রকার নিশ্চয় করে বলা যায়। কারণ উল্লিখিত লেখকগণ প্রত্যেকেই মননধর্মী, চিন্তাশীল, সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত এবং শুধু বর্তমানেই তারা দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন নি; ভবিষ্যতের দিকে, পরবর্তীদের দিকে যাত্রারম্ভে তাঁদের নির্দেশ অপরিহার্য, তাঁদের সকল চিন্ত াধারার যোগাযোগের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

উপরোক্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে কাজী মোতাহার হোসেনের নাম আমাদের নিকট অধিক পরিচিত। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক ছাড়াও যে তাঁর অন্য পরিচয় আছে এবং সেই পরিচয়ই যে মহত্তর ও অধিকতর মর্যাদা লাভযোগ্য তা আমাদের অনেকেরই অজানা। পরিতাপের কথা সন্দেহ নেই; কিন্তু পরিতাপ ছেড়ে যত শীঘ্র তাঁর সেই মহৎ পরিচয় লাভ করব ততই মঙ্গল। উনিশ শ সাঁইত্রিশ সালে মোতাহার হোসেনের 'সঞ্চরণ' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয় নানা ধরনের প্রবন্ধের সংকলন এটি। সমসাময়িক দুচারজনের সপ্রশংস দৃষ্টি বইটি লাভ করলেও সাধারণের কাছে এটি অখ্যাতই থেকে যায়। শোনা যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাকি বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের পরে সঞ্চরণ লেখকের মতো প্রবন্ধকার বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। যা হোক, হয়ত সাধারণের নিকট যোগ্য সমাদর লাভ না করায় কাজী সাহেব এরপর আর কোনো পুস্তক প্রকাশ করতে ভরসা পান নি; তাঁর চিন্তার ও সাহিত্যনুশীলনের পরিচয় সঞ্চরণ-এ ইতস্তত দু একটি প্রবন্ধে মাত্রও সীমাবদ্ধ। আপাতত আমরা-সঞ্চরণ-এর পরিচয় লাভেই সচেষ্ট হচ্ছি।

'সঞ্চরণ' পাঠ করতে আরম্ভ করলে প্রথমে যা নজরে পড়ে, সে হল লেখকের শান্ত সমাহিত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। কোনো সদম্ভ উক্তি নেই, সহনশীলতার অভাব নেই। মননশীল হয়েও তিনি মনোজ্ঞ; ভাষা স্নিগ্ধ সুন্দর, কোথাও অযথা অলঙ্কারের বাহুল্য হয়নি। নানা ধরনের রচনা পুস্তকটিতে আছে, কোথাও লেখক তাঁর সমসাময়িকদের নিয়ে কৌতুকরত, কোথাও বিজ্ঞান ও ধর্মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন; কোথাও স্বসমাজের বর্তমানে ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছেন, আবার বাংলার বিশেষ সঙ্গীত সম্বন্ধে তথ্যবহুল বর্ণনা দিচ্ছেন—কুত্রাপি বিন্দুমাত্র অধৈর্য, কুটিলতা বা বাগাড়ম্বর বা অন্য কোনো দুর্গুণের পরিচয় নেই। ভাবতে হয় এরূপ সহজ সাবলীর পরিপূর্ণ দৃষ্টি তাঁর লাভ হল কী করে। তাঁর মানসিক ঔদার্য, পরিচ্ছন্নতা এবং সংস্কার মুক্ত বুদ্ধি এবং সমন্বয়ী জ্ঞানই এর কারণ বলে মনে হয়।

মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের লেখক শ্রদ্ধাশীল। আমাদের ঐতিহ্য আমাদের আত্মসম্মান জাগাবে; কিন্তু তাতে আমাদের দৃষ্টিবোধ ও বিচারশক্তি অস্বচ্ছ হয়ে না যায় সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। বর্তমানের সঙ্গে যোগ না থাকলে, শুধু অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে রাখলেই যে আমাদের মনে আত্মপ্রত্যয় জাগবে এ কথা অবিশ্বাস্য। এক কথায়, অতীতের বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করতে

হবে। আজকে ঘোলাটে অবস্থায় এরূপ সত্য বারবার আবৃত্তি করার অনেক সুফলতা। মানসিক উত্তেজনার বসে আপাতত তাকে কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু যিনি সত্যসন্ধ তাঁর কাছে ভাবালুতা প্রশ্রয় পায় না; বৈজ্ঞানিকের ও চিন্তাশীলের নিকট অনাবিল সত্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য।

মুসলমানদের অনেক কঠিন কথা মোতাহার হোসেন শুনিয়েছেন। আপাতত মোহের বশে তা অপ্রীতিকর মনে হওয়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু নবযাত্রারম্ভে এরূপ কঠিন কথা শোনার প্রয়োজনও ছিল। এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন তিনি শুধু রূঢ় সত্যভাষী অননুকম্পায়ী বুদ্ধিবিৎই নন, তিনি হৃদয়বান। স্বসমজের দীনতায় ও দুর্বলতায় তাঁর অন্তরে গভীর আবেগের সঞ্চার হয় এবং এই দীনতা দুর্বলতা নিরসনের জন্য সমাজ হিতৈষণায় তাঁর চৈতন্য স্বতঃই উদ্বুদ্ধ। কবিসুলভ এই হৃদয়াবেগের ভারসাম্য ঘটিয়েছে তাঁর জ্ঞান, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর বিশ্লেষণী বুদ্ধি। এবং এই অদ্ভুত সংযোগ যা অনেকের মধ্যেই নেই, তারি ফলেই তাঁর রচনা একাধারে মর্মস্পর্শী ও লোকহিতৈষী। মুসলমানদের পারিবারিক জীবনে কী করে আনন্দ বর্ধন হবে এমন সব চিন্তাও তিনি করেছেন। আবার অন্যদিকে আর্ট-এর সংজ্ঞা সম্বন্ধীয় বিতর্কেও তিনি অবতরণ করেছেন। একমাত্র তরুণরা বয়োপ্রভাবেই কাজী সাহেবকে শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারেন। ছাত্রজীবনে বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চা আমাদের অবশ্য করণীয় এবং বয়োধর্মে প্রাণবস্তুটিও আমাদের নির্মল থাকারই কথা। তাই কাজী সাহেবের মানবতার বাণী একযোগে আমাদের মর্মস্পর্শী হবে এবং জ্ঞানের সঙ্গেও পরিচয় ঘটাবে। অর্থাৎ সঞ্চরণ-এর আবেদন অন্তরে যেমন ব্যাকুলতা জাগায়, চিন্তাবৃত্তিকেও তেমনি সুতীক্ষ্ণ করে তোলে। নবযুগের স্রষ্টা তরুণদের কাছে এর চাইতে আদরণীয় বস্তুর আর কী হতে পারে?

গ্রন্থের সুসম্বন্ধ ও সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে আমাদের কুলোবে না—কাজেই দীর্ঘ পরিচয় দেয়ার লোভ সংবরণ করে পাঠকদের এইটুকু শুধু নিবেদন করছি যে তাঁরা যদি গ্রন্থটির সাক্ষাৎ পরিচয় নিতে চেষ্টা করেন তবে কোন ক্রমেই নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করবেন না এবং উল্টো আশ্চর্য হবেন যে, বিরূপ ও বিনাশী আবহাওয়ায় এরূপ প্রশান্ত প্রতিভার জন্ম কী করে সম্ভব হয়েছিল।

১৯৮১
—সৈয়দ নুরুদ্দিন (ফজলুল হক হলের বার্ষিকী কল্পাপী—১৩৫১ থেকে গৃহীত)

পোরট্রেট

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার কথা মনে করেই উপরের শিরোনামটি। বাংলাদেশের জীবনে জিয়া অভিনব না হলেও অবশ্যই একটি তাৎপর্যময় চরিত্র। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের ঘটনা যেমন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রের যবনিকা ঘটিয়েছিল, তেমনি তার পরবর্তী ঘটনাবলি আর একটি চরিত্রকে বিকশিত করে তুলেছিল। তখন থেকে বিশেষ করে '৭৫-এর নভেম্বর যখন জনাব জিয়াউর রহমানকে সরাসরি রাজনৈতিক মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এল তখন থেকেই সোৎসুক দৃষ্টি নিয়ে আমি তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। আমার মনের প্রশ্ন ছিল, প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিজের মনের চিন্তাভাবনার রূপরেখাটি কী? আমি তাঁর কোনো অন্তরঙ্গ ব্যক্তি নই। তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় দিতে পারেন তাঁর সহকর্মীগণ যাঁরা তাঁকে বেশ কাছ থেকে দেখেছেন, বিশেষ করে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছেন যেসব অধ্যাপক, সাহিত্যিক বা রাজনীতিবিদ, যাঁরা প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমন্ত্রণে তাঁর উপদেষ্টা বা মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁরা জনাব জিয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ পোরট্রেট তৈরি করতে পারেন। আমি রাজপুরুষদের সাক্ষাতে যেতে বরাবরই বিশেষভাবে সঙ্কোচ বোধ করি। সে সঙ্কোচের একটা বড় কারণ, রাজপুরুষদের সাক্ষাতে তাঁদের সঙ্গে আলাপে সব সময় একটা সৌজন্য রক্ষা করতে হয়। তাঁরা যা বলেন তাকেই সহাস্যে সমর্থন বা প্রশংসা করতে হয়। তাঁদের সঙ্গে সমানে সমানে কোনো মত বিনিময় চলে না। তাঁদের কোনো বক্তব্যে দ্বিমত পোষণ করলেও তা বলা যায় না। বলা যায় না এ কারণে নয় যে তাঁরা দ্বিমত বলতে দেন না। তাঁরা বরঞ্চ সকলকেই অভ্যর্থনা জানান এই বলে কোনো সঙ্কোচ করবেন না। বলুন, আপনি যা মনে করেন।' তবু আপনি যা মনে করেন তা বলতে আপনি সঙ্কোচ বোধ করেন। বাঙালি রাজপুরুষ, আপনার আমার সঙ্গে অর্থাৎ জনতার সঙ্গে কথা বলেন একজন রাজপুরুষ হিসাবেই। রাজপুরুষ যে, সে রাজপুরুষই। এমনকি ক্ষুদ্র বাংলাদেশের রাজপুরুষও।

প্রেসিডেন্ট জিয়াকে কিছুটা কাছ থেকে দেখেছিলাম একবার যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলন কেন্দ্রে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সামনে দ্বিধাহীনভাবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং শিক্ষকদের প্রথম কাতার থেকে ধরে ধরে বক্তৃতা দিইয়েছিলেন। সেদিনকার সেই ঘটনাটির অনুভব আমার নিকট বেশ কৌতুকজনক মনে হয়েছিল এবং অনুষ্ঠান শেষে বাসায় ফিরে তাঁর একটি স্মৃতিচারণও সেদিন করেছিলাম। আর একদিন আরো একটু কাছ থেকে তাঁকে দেখেছিলাম বঙ্গভবনে, যখন তাঁর পক্ষ থেকে কিছু লেখক সাহিত্যিক, শিক্ষককে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এঁদের মধ্যে কেন আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তার ব্যাখ্যা আমার আজো জানা নেই। সে ডাকে যেতে যেমন সঙ্কোচবোধ করেছিলাম, তেমনি না যেতেও সঙ্কোচ হয়েছিল। যাওয়ার সঙ্কোচ : এমন রাজকীয় দাওয়াতে যাওয়ার আমি উপযুক্ত নই। তাছাড়া বঙ্গভবনে যাওয়ার একটা লাইন আছে। আমি সে লাইনে না থাকলেও বঙ্গভবনের দাওয়াত পেয়ে যাওয়াটাও বন্ধু-বান্ধবের মুখে সহাস্য এই মন্তব্যটি তৈরি করবে : শেষ পর্যন্ত অমুকও লাইন লাগিয়েছে। এই এক চিন্তা। আবার না যাওয়ার চিন্তা হচ্ছে সৌজন্যবোধ থেকে। রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডাকলে যাওয়াটাই তো কর্তব্য। তাঁর দাওয়াতে না যাই কোন যুক্তিতে। যাই হোক, সে সাক্ষাৎটি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। অপর সাথীদের সঙ্গে বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে চা-মিশাতা খেয়েছিলাম। মুখর সাহিত্যিক, অধ্যাপক বন্ধুরাই কথা বলেছিলেন, প্রস্তাব তুলেছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেছিলেন : আপনারা সাহিত্যিক, লেখক। দিন, আপনাদের স্কীম দিন। আপনারা কি চান বলুন। 'মানি উইল বি নো প্রব্লেম।' এর চেয়ে বড় ভরসা আর কী হতে পারে। দরিদ্র বাংলাদেশে প্রেসিডেন্টের দান যদি ব্যক্তিগত দান হয় তাহলে প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর নিরন্তর শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে ভ্রমণকালে স্কুলে, মাদ্রাসায়, মসজিদে, ক্লাবে, যুবসংঘে, মহিলা সমিতিতে যত টাকা দান করেছেন বা দান করার কথা ঘোষণা করেছেন, এমন ঘোষণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কিন্তু এর যে কেবল ইতিবাচক দিক, উৎসাহজনক দিকই ছিল, তা নয়। এর নেতিবাচক বা বিপজ্জনক দিকও ছিল। এটা বাংলাদেশে অনালোচিত নয়। প্রেসিডেন্ট হলেও একটা রাষ্ট্রের তিনি একজন কর্মচারী। তাঁর উচিত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত আইন কানুন মেনে চলা। তার উচিত নিয়মনীতির প্রতি তাঁর আনুগত্যই যে বড় এবং প্রথম তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। কিন্তু সদ্য স্থাপিত কোনো রাষ্ট্রের কোনো রাজারই বোধহয় এই বোধটি থাকে না। নিয়মের বাধ্য হওয়া তিনি চিন্তা করতে পারেন না। তিনি মনে করেন, আমি যদি নিয়মের বাধ্য হই, তাহলে আমি আর রাজা কিসের? এবং তাঁর এই অনুচ্চারিত মনোভাবটি তাঁর পার্শ্বচরদের সরব সমর্থনে একেবারে মহাসত্যে পরিণত হয়। তাঁর অনুগতগণ বলতে থাকেন : 'হুজুর, স্যার, আপনার আবার নিয়ম কী? আপনার ইচ্ছাই নিয়ম। আপনার হুকুমই আইন।' অথচ রাজা

প্রতিমুহূর্তে কিন্তু অপরকে, মানে জনতাকে আইনের কথা বলছেন। কিন্তু নিজে আইনের ঊর্ধ্বে উঠে অপরকে যে আইনের অধীনে আনা যায় না, এই উপলব্ধিটি আমাদের দেশের আধুনিক রাজাদের আসতে এখনো বেশ বিলম্ব আছে। বিলাতের রাজা বা রানীর মতো পানসে রাজা বা রানী হতে কোন আসল রাজা চায়? অবশ্য বিলাতের রাজা বা রানীও এত সহজে যে পানসে হয়েছেন তা নয়। কিন্তু সে আর এক ইতিহাস এবং আর এক দেশের ইতিহাস। আসলে কে কার ইতিহাস থেকে শেখে? কেউই বোধহয় কারুর ইতিহাস থেকে শেখে না। তার নিজের অভিজ্ঞতাই তাকে শেখায়। আমাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাও আমাদের শেখাবে। তার পূর্বে শেখ মুজিব রাজা হবেন এবং নিহত হবেন; মেজর জিয়া রাজা হবেন এবং নিহত হবেন। এবং রাজা হবেন এবং নিহত হবেন। ... ব্যক্তি হিসাবে আমার অবশ্য ইচ্ছা, আহা সব রাজার মৃত্যুকে অতিক্রম করে যদি আমি সব রাজার মৃত্যুকে দেখতে পেতাম। সে থাক। সে আশা তো অবাস্তব। কিন্তু দুই রাজার জন্ম এবং মৃত্যু তো দেখলাম। এদিক দিয়ে রাজার চেয়ে সাধারণ প্রজার ভাগ্যই ভালো। সে মারী, মহামারী, বেমারীতে যখন তখন মরলেও রাজার মতো তাকে মরতে হয় না। তাই বলি, আহা রাজারা কী অসহায়! মন থেকে প্রার্থনা জাগে, আমার যদি কোনো বড় শত্রু থাকে, জাগতিক জীবনে তার যত অমঙ্গল আমি কামনা করিনে কেন, এমন রাজার-মৃত্যু যেন তার ভাগ্যে না জোটে।

৩০শে মে ১৯৮১ তারিখে মর্মান্তিকভাবে নিহত জিয়ার লাশ যখন ঢাকায় আনা হল তখন মানুষের ঢল নেমেছিল তাঁর জানাজায় শরিক হতে। লক্ষ লক্ষ মানুষ। এখনো তাঁর মাজারে হাজারে হাজারে লোক আসে। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক নেতাদের এমন হত্যাকাণ্ড কামনা করে না। কখনো করেনি। ১৯৭৫ সালেও করেনি। অথচ কোনো কালের মানুষই সার্বিকভাবে কোনো শাসক বা শাসকগোষ্ঠীর শর্তহীন সমর্থক বা সমালোচক থাকে না। সাধারণ মানুষ রাজনীতিককে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে চায়। হত্যার মাধ্যমে নয়।

: তাহলে ১৯৭৫-এ মুজিব হত্যার পরে কেউ টু শব্দটি করল না কেন?

প্রশ্ন করলেন কয়েকদিন আগে জনৈক বন্ধু। আমি বললাম : এ প্রশ্নটির জবাব একটু ভেবে দিতে হয়। আমরা চিন্তা করে দি না বলেই মনে করি '৭৫-এর হত্যাকাণ্ডে জনসাধারণের সমর্থন ছিল—এমন অভিমত জনসাধারণের প্রতি অবিচার।

এমনকি আজো, জিয়ার হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঢাকা কিংবা অন্যত্র যে প্রকাশ দেখেছি সেই শোকের প্রকাশ চট্টগ্রামের মানুষের পক্ষে ঘটনার দিন ৩০শে মে কিংবা পরদিন চট্টগ্রামে দেখানো সম্ভব হয়নি। সে দুদিন দারুণ আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তায় চট্টগ্রামের মানুষকে শহর থেকে আশ্রয়ের সন্ধানে যেতে হয়েছে। এমনি আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি ছিল ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট। একথা

ঢাকাবাসীর অজানা থাকার কথা নয়। আমার বাসায় সামনের রাস্তাতে ট্যাঙ্কের দাপাদাপি এখনো আমার চোখে ভেসে ওঠে। আর শুধু ঢাকা নয়। ঢাকার সেদিনকার শাসকরা শেখ মুজিবের কোনো গায়েবানা জানাজার আহ্বান জানায়নি। কেউ শেখ মুজিবের মৃত্যুতে আহা শব্দ উচ্চারণ করুক এ ইচ্ছা সেদিনকার শাসকদের আচার-আচরণে প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছে এক বিপরীত ইচ্ছা। তাই ১৯৭৫ এর হত্যাকাণ্ডে দেশবাসী বিমূঢ় হয়নি এবং তাকে তারা সমর্থন করেছে, এটা বলার অর্থ শুধু অনির্দিষ্ট ও নৈর্ব্যক্তিক জনতার প্রতি অবিচার করা নয়; এর অর্থ, যদি একথা বলেন তাঁর নিজের উপরও অবিচার করা। এমন কোনো লোক কি পাওয়া যাবে যে বলবে কিংবা বলেছে : আমি শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করি বা সমর্থন করেছি। এমন কথা বলা অ-মানবিক বলেই যে কেউ বলতে পারে না, তাই নয়। রাজনৈতিক যুক্তি হিসাবে একথা কোনো নাগরিক বলতে পারে না। এ কথা বলার অর্থ, সে নিজেও অপর কারুর দ্বারা এমনিভাবে নিহত হোক, এ কথা বলা, এ ভাগ্য কামনা করা। না, এমন কথা কল্পনা করা যায় না।

* * *

জনাব জিয়া একদিন অপরিচিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সামনে এসেছিলেন। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের থেকে ঘটনাবলি তাঁকে রাজনৈতিক চরিত্রে পরিণত করেছে। তাই জনাব জিয়ার রাজনৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা দেশের স্বার্থে আবশ্যক।

জিয়ার অনুসারীদের পক্ষে তাঁকে বিভিন্নভাবে প্রশংসা করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট জিয়ার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড তাঁকে শত্রু-মিত্র সকলেরই সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছে। কিন্তু মিত্রদের আবেগময় প্রশংসার মাত্রায় যে আতিশয্য দেখা যাচ্ছে, সেটাতেই মরহুমের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

যেদিন জিয়ার লাশ এল ঢাকাতে, সেদিন বিমানবন্দর সরকারি বেসরকারি নেতাদের জমায়েত হয়েছিল। তাঁদের কাছে টেলিভিশন প্রেসিডেন্টের এমন জীবনাবসানের উপর মন্তব্যের অনুরোধ করেছিল। স্বাভাবিকভাবে সকলেই এমন ঘটনাতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সরকারি নেতাদের শোকবাণীর মধ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার তথ্যমন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর বাণীটি কানে ঠেকল। বাণীটি যেমন স্বাভাবিক তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। শোকাহত কণ্ঠে তিনি বললেন : 'এই মুহূর্তে আমি কী বলব। কেবল বলতে পারি প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাদের গণতন্ত্র দিয়ে গেছেন। এখন সে গণতন্ত্র কে রক্ষা করবে, আমি তা জানিনে। ...' শোকের মুহূর্তের কোনো কথা ধরতে নেই। তবু স্বতঃস্ফূর্ত এই অভিমতটির সত্য এখানে যে সরকারি দল এবং জিয়ার অনুসারীগণ তাঁকে দেখেছেন এমন সামরিক নেতা হিসাবে যিনি দেশকে গণতন্ত্র দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রশংসাবাণীতে এমন

অভিমিতও ব্যক্ত হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি ঘটেনি যে কোনো সামরিক নেতা দেশকে গণতন্ত্র দিয়েছেন। কিন্তু এই সার্বজনীন মনোভাবটির যেটা মারাত্মক দিক সে হচ্ছে এই যে এখানে গণতন্ত্রকে ব্যক্তিবিশেষের দান হিসাবে দেখার ও দেখাবার প্রয়াস রয়েছে। গণতন্ত্র ব্যক্তির দান হিসাবে আসতে পারে না। ব্যক্তির দান হিসাবে আসে স্বৈরতন্ত্র, গণতন্ত্র নয়। গণতন্ত্র দ্রব্য নয়, যা কোনো ব্যক্তি, সে যতই বিরাট, ধনী বা ক্ষমতাবান হোক, দান করতে পারে। গণতন্ত্র একটি জীবনপ্রণালী, জনসাধারণের অধিকারবোধ এবং সচেতন চেষ্টার মাধ্যমেই যার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এবং গণতন্ত্রের পরিমাণ ও গুণও নির্ভর করে জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশের মধ্যে এই অধিকারবোধ ও সংগ্রামের সচেতন প্রচেষ্টার গুণাগুণের উপর। আমরা যদি গণতন্ত্রকে কোনো সহৃদয় ডিক্টেটরের ব্যক্তিগত দানের ব্যাপার বলে মনে করি, তাহলেই গণতন্ত্রে অনিশ্চয়তা আসতে বাধ্য। তখনি প্রশ্ন জাগে, এই সহৃদয় ব্যক্তির তিরোধানের পর আমাদের অবস্থা কী হবে? আর এই মনোভাব থেকেই অভিমত বেরিয়ে আসে : 'তারপরে গণতন্ত্রকে কে রক্ষা করবে, তা আমি জানিনে।'

প্রেসিডেন্ট জিয়া সচেতনভাবে নিজের জন্য একটি মোহ বা ক্যারিজমা তৈরি করে তুলেছিলেন। দেশে তিনি ছাড়া তাঁর দলের মধ্যে কেউ বক্তা ছিল না। এবং তিনি ছাড়া কেউ কর্মী ছিল না। এমন কোনো সভার কথা আমাদের জানা নেই যেখানে তাঁর উপস্থিতিতে অপর কোনো বক্তা বক্তৃতা করে থাকলেও সেই নেতার বক্তৃতার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সচিত্র টেলিভিশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিদারুণ পরিশ্রমপূর্ণ উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতার রেকর্ড প্রচার করা হয়েছে। সে চিত্রে যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রাণান্তকর পরিশ্রমের মূর্তি, তেমনি ধরা পড়েছে তার পাশে এবং পেছনে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান সহকর্মী, সাথী ও অনুসারীদের ক্লান্ত, উদ্বেগপূর্ণ অসহায় মুখচ্ছবি।

প্রেসিডেন্ট জিয়া সম্পর্কে প্রশংসার আতিশয্যের প্রকাশ দেখা গেল তাঁর দলীয় পত্রিকা 'দেশ'-এর একটি রিপোর্টের শিরোনামে। শিরোনামটি ছিল : 'প্রেসিডেন্ট জিয়ার শোকে মাটি কাঁদে, গাছ কাঁদে, গাছের পাতা কাঁদে।'

একটি সরকারি পত্রিকা ১৬ই জুন তারিখে প্রেসিডেন্ট জিয়ার জাতীয়তাবাদী দলের সেক্রেটারী জেনারেল ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মরহুম জিয়ার 'জীবন ও দর্শন' শীর্ষক আলোচনার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে ডা. বদরুদ্দোজা বলেছেন : 'মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ারউর রহমান ছিলের শতাব্দীর এক বিস্ময়। তিনি ছিলেন একটি সামগ্রিক চরিত্র। মানুষ হিসাবে, রাষ্ট্রপতি হিসাবে এবং রাজনীতিবিদ হিসাবে এমন সফল ব্যক্তিত্বের নজির সমসাময়িক পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।' তাছাড়াও দলের মহাসচিব বলেন : 'এ দেশের মানুষের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার রাজনীতির যে ব্যাপ্তি ঘটেছে, আগামী কয়েক শ' বছরে তা অব্যাহত থাকবে।' ...

দলীয় নেতার এরূপ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা দলের দিক থেকে বোধগম্য। তবু এর আতিশয্যের দিকটি পরিণামে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্টই সাধন করে। তাঁর চরিত্র ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিকতা হারিয়ে কৃত্রিম হয়ে ওঠে। এবং যত সে কৃত্রিম হয়, যত তাকে দলীয় শক্তি বা সরকারি প্রচারযন্ত্র শক্তিশালী করে তুলতে চায়, মানুষের মনের কাছে তার স্বাভাবিক আবেদনে তত চিড় ধরতে থাকে।

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানুষের জীবন যৌথ জীবন। সংঘ ব্যতীত মানুষ অচল। সংঘের মধ্যে অবশ্যই নেতৃত্বের সমস্যা রয়েছে। নেতা এবং কর্মীর সমস্যা। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা। নেতা বলতে যে কেবল একজনকে বুঝাবে, তা নয়। কিন্তু যে সমাজ ও সংঘ যত দুর্বল, সে সমাজ বা সংঘেই একক নেতৃত্বের উপসর্গ তত বেশি। সেখানেই যৌথ নেতৃত্বের চেতনা কম। অনুসারীদের পক্ষে এমন সংঘের একক নেতৃত্বকে মাত্রাতিরিক্তভাবে বড় করে তোলা একটি মানবিক প্রবণতা। সমাজ ব্যবস্থা নির্বিশেষে এই প্রবণতার দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে কম নেই। যৌথ জীবনে সংঘের বিশিষ্ট, চতুর, বুদ্ধিমান বা সাহসী ব্যক্তি কিংবা নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু যে বিষয়ে নেতা ও কর্মীদের সতর্ক থাকা আবশ্যক তা হচ্ছে, এই ভূমিকাকে যেন পরিমিতির সীমা পেরিয়ে যেতে দেওয়া না হয়। তেমন হলে এমন ব্যক্তিও সংঘের সহায়ক শক্তি হিসাবে থাকে না। তখন সংঘই ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার যন্ত্রে পরিণত হয়। যাই হোক, এর তত্ত্বগত আলোচনার স্থান এটি নয়। এবং এর দরকারও করে না। কারণ, এটি আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু জানা এক কথা, আর তাকে মানা আর এক কথা। এমন সত্যকে মানা হয় খুব কম ক্ষেত্রেই। আর সেই না মানার মাশুলই আবার সেই সমাজ বা সংঘকে দিতে হয়।

ব্যক্তিক একক নেতৃত্বের প্রবণতা শেখ মুজিবুরের মধ্যেও তাঁর সরকার প্রতিষ্ঠার পরে প্রকট হতে আরম্ভ করে। তাঁর এই প্রবণতাকে তাঁর অনুসারীগণ আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে সাহায্য করে তাদের স্তাবকতা দিয়ে।

জিয়া সাহেবেরও ছিল একক নেতৃত্ব। একক পদ্ধতি। তিনি নাকি নিজে ক্ষোভের সঙ্গে বলতেন : আমার একাকেই সবকিছু করতে হয়। এই একক নেতৃত্ব, এই একক চিন্তা, একক কর্মব্যস্ততা, একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেমন একটি ব্যক্তির অস্বাভাবিক শক্তির দিক, তেমনি তিনি যে সমাজ, দল, সরকার বা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করেন তার মারাত্মক দুর্বলতারও দিক।

এমন এক নেতৃত্ব বা শাসককে স্বৈরশাসক বলি কিংবা সহৃদয় ডিক্টেটর বলি, তাতে কিছু যায় আসে না। সে এককই থেকে যায়।

এই একক শাসনের সমস্যার শুরু আজকের নয়। আদিকাল থেকেই এ চলে এসেছে। প্রাচীন পণ্ডিত এ্যারিস্টটল এই সমস্যাটির যে আলোচনা করেছেন, তা যেমন অন্তর্ভেদী তেমনি দূরগামী। আর তাই সে আলোচনা সমাজ জীবনের আলোচনাতে একটি চিরায়ত মর্যাদা লাভ করেছে।

এরিস্টটল তাঁর 'পলিটিকস' গ্রন্থে শাসনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি তুলেছিলেন। কোন শাসন শ্রেয়, ব্যক্তির, না আইনের? তিনি বলেছিলেন, ব্যক্তি যতই জ্ঞানী বা গুণী হোক না কেন, তবু সে মানুষ। তার রাগ, বিরাগ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা আছে। এবং তার শাসন সেই রাগ-বিরাগ ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। কিন্তু আইনের শাসন যতই কঠিন বা কঠোর হোক, আইন মানে যুক্তি ও প্রজ্ঞা। আর তাই আইনের শাসন রাগ-বিরাগ প্যাশন বা প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত। আর সে কারণেই ব্যক্তি যতই উত্তম হোক, আইনের শাসন ব্যক্তি-শাসনের চেয়ে শ্রেয়।

বৃহৎ নেতাদের সম্পর্কে একটা প্রশংসার বাক্য আমাদের দেশে বেশ প্রচলিত। আমরা যাঁকে বড় মনে করি তাঁকে সাধারণত এই বলে আখ্যায়িত করি যে, তিনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান ছিলেন। তিনি মারা গেলে বলি : হি ওয়াজ অ্যান ইনসটিটিউশন ইন হিমসেলফ। এমন আপ্তবাক্য আমরা হক সাহেবের উপর প্রয়োগ করেছি! এমন বাক্য আমরা শেখ সাহেবের উপর প্রয়োগ করেছি। ভাসানী সাহেবের উপর করেছি। এবং এমন বাক্য আমরা জিয়া সাহেবের উপর প্রয়োগ করছি। কিন্তু আসলে এটি কি কোন প্রশংসার বাক্য? চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে, এ বাক্যটি কেবল আতিশয্যের বাক্য তাই নয়। এ বাক্যটি নিন্দার বাক্য। যে ব্যক্তি নিজেই প্রতিষ্ঠান তিনি তো কোনো 'প্রতিষ্ঠানের' অধীন নন। সকলে তাঁর 'প্রতিষ্ঠানের' অধীন। এমন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বিকাশে কেবল যে কোনো সহায়ক শক্তি নন তাই নয় এমন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বিকাশের প্রতিবন্ধক। আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত যে আইনগত, শাসনগত, সমাজগত, দলগত কোনো প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়নি,—এমন প্রতিষ্ঠান যে ব্যক্তিকে অতিক্রম করে কার্যকর থাকে, যার নিয়ম, শৃঙ্খলা ও শক্তি সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনের মূল নির্ভর—তার কারণ এইসব 'অতিপুরুষগণ—যাঁরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে বলে বিবেচনা করেছেন এবং যাঁদেরকে তাঁদের অনুসারী এবং স্তাবকগণ বুঝিয়েছেন, তারা নিজেরাই এক একটা প্রতিষ্ঠান।

এ নিয়ে ক্ষোভ করে লাভ নেই। কোনো জনগোষ্ঠীর বিকাশের ইতিহাসে এ এক অপরিহার্য অভিজ্ঞতার পর্যায়। একে পাশ কাটিয়ে সহজ পথে প্রতিষ্ঠানের বিকাশের কোন উপায় নেই। আমাদের অতিপুরুষদের শক্তি, দান ও অ-দানের অভিজ্ঞতায় যদি এ শিক্ষা আমাদের হয় যে প্রতিষ্ঠানের উপরে ব্যক্তি নয়, অতিপুরুষ নয়, ব্যক্তির উপরই প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি নির্বিশেষে এ কথা সত্য, ব্যক্তির ভরসা ব্যক্তি নয়, অতিপুরুষ নয়, তথা মানুষের ভরসা তাদের যৌথ শক্তির সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান—তবে তাতেই আশা, তাতেই মঙ্গল।

১৯৮২

‘সাম্যবাদের ভূমিকা’র লেখক

০৮.০২.’৮২ : সকাল ১০টা। এই মাত্র অজয় (অজয় রায়) ফোন করে বললেন ‘অনিল দা গতরাতে মালেকাদের বাসায় যে ঘরে তিনি থাকতেন সেই ঘরে সকলের অজ্ঞাতে রাত তিনটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।’ গতকাল বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সম্মেলনে উপস্থিত থেকে তার পুনর্গঠনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে অজয় জানালেন। রাতের এই ঘটনার কথা সকালে দরজায় আঘাত করে জোর করে দরজা খুলে দেখার আগে কেউ জানতে পারে নি।

নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী কর্মময় একজন অতুলনীয় চিন্তাবিদের জীবনাবসান ঘটল। কী বিস্ময়কর যে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত নিজের আদর্শের বাস্তবায়নে সাংগঠনিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে তিনি দ্বিধা করেন নি। নিদারুণ অসুস্থ শরীরের হাসিমুখে স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তা পালন করেছেন। বোধহয় ৩১, জানুয়ারি তারিখেও এসেছিলেন আমাদের ইউনিভার্সিটির বাসায়। সন্ধ্যা থেকে প্রায় তিনঘণ্টা গল্প করেছেন স্বাতী আর তিতুর সঙ্গে। সেদিন সকালে নিজে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার বড় মেয়ে স্বাতী আর ছোট ছেলে তিতু কোথায়? ওদের সঙ্গে গল্প করতেই তিনি আমার বাসায় আসতেন। আমি বলেছিলাম, আপনি অসুস্থ, আপনি কেন আসবেন। আমি আপনার কাছে ওদের নিয়ে আসব। কিন্তু অনিল দা তা শুনতেন না। নিজে সেই দূর ওয়ারী থেকে নীলক্ষেত চলে আসতেন। এও যেন তাঁর রাজনীতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ছোটদের সঙ্গে আলাপ করা। স্বাতী, তিতুর কাছে অনিল দা ছিলেন ‘অনিল কাকু’। স্বাতীকে সেই প্রায় ষোল বছর আগে ‘ক, খ’ পড়ার বই কিনে দিয়েছিলেন। সে মেয়ে আজ মেডিক্যাল পড়ছে। তাতেই তাঁর আনন্দ।যখনি বিদেশে, মস্কো কিংবা প্রাগ গেছেন, তখনি সেখান থেকে ওদের জন্য চিন্তা করে একটি ব্যাগ কিংবা এক প্যাকেট পেন্সিল নিয়ে এসে ওদের হাতে দিয়েছেন।

আমাদের বাসায় এসে স্বাতী তিতুকে কাছে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কথা বলতেন। বুঝাতেন সকল সমস্যার মধ্যেও সবকিছু বুঝে শান্ত মনে কেমন করে পড়াশুনা করতে হয়। কখনো ওঠার তাড়া করতেন না। যেন ওদের সঙ্গে গল্প করা ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ নেই।

৩১ জানুয়ারি ছিল রোববার। রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলনের শেষ দিন। আমি কিছুটা সময় ছিলাম বাংলা একাডেমিতে এই সম্মেলনে। উদ্যোক্তারা বিরাট জনসমাগমে উন্মুক্ত মাঠে কেমন করে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' নাটক দেখাচ্ছে, তা দেখার জন্য। কিছু পরে বাসায় এসে দেখলাম, অনিল দা এসে গেছেন। স্বাতী এবং তিতুর সঙ্গে গল্প করছেন। এদিন অনেকক্ষণ আলাপ করলেন আমার বড় ছেলেটির মানসিক সমস্যা সম্পর্কে। ছেলেটি মানসিকভাবে বেশ অপরিণত। বাসায় নানা রকম সংকটের সৃষ্টি করে। বাসার শান্তি নষ্ট করে। তাকে শান্ত করা প্রায় সময়ই ভয়ানক রকমে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। দেশে এমন কোনো জায়গা নেই সেখানে তাকে দিতে পারি। যেখানে দিলে তার একটু উপকার হয়। সে সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। তারপরে, রাত দশটারও পরে, স্বাতী, তিতুকে আবার আদর করে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমি এগিয়ে দেবার জন্য বাসার গেটে, রাস্তায় এলাম। সহজে রিকশা পাওয়া গেল না। অনিল দার সঙ্গে কথা বলতে বলতে রিকশার খোঁজে বাসা থেকে মেডিক্যাল কলেজের দিকে এগুতে এগুতে জগন্নাথ হলের গেটে এসে একটা রিকশা পেলাম। সেই রিকশাতে তুলে দিয়ে অনিল দাকে বললাম, 'ফোন করবেন, অনিল দা। আবার আসবেন।' ...

তার পরদিনই আবার ফোন করেছিলেন। বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির কমিটিতে আমাকে থাকার কথা বলার জন্য। তাছাড়া আবার বলেছিলেন, আমার বড় ছেলেটির সমস্যার বিষয়ে। বলেছিলেন, 'ওর উপদ্রবে স্বাতী, তিতুর পড়াশুনারও তো অসুবিধা হয়। ওর সম্পর্কে একজন মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে আলাপ করবেন। ...

তারপরে আজকের এই খবর। আমরা কেউই বিশ্বাস করতে পারছি নে, অনিল দা মারা গেছেন। আমি দুবার গেলাম তাঁর অফিসে যেখানে পার্টির পতাকা দিয়ে তাঁর সেই পাশফেরা চিরনিদ্রায় শায়িত দেহটিকে আবৃত করে রাখা হয়েছে, সেখানে। আমার স্ত্রীও গেলেন বিকেল বেলা, তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে। স্বাতী গিয়েছিল একবার সকালে। তিতু গেল বিকেলে। অনিলদাকে এমন নীরবে শুয়ে থাকতে দেখে তিতু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। ওর কান্না আমার চোখেও পানি এনে দিল। ...

* * *

অনিলদা মানে 'অনিল মুখার্জী' : 'সাম্যবাদের ভূমিকা'র লেখক অনিল মুখার্জী বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট নেতা অনিল মুখার্জীর এই পরিচয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আজকে

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের উপর বাংলাতে; এ বাংলায়, ও বাংলায়, নানা বই আছে। কিন্তু চল্লিশের দশকে সমাজতন্ত্রের ভাবধারার সঙ্গে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের যারা পরিচিত হচ্ছিল, তাদের জন্য এ রকম সাবলীল ভাষায় রচিত সহজবোধ্য এবং বিশেষ করে এই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত সাম্যবাদী আলোচনা একেবারে বিরল ছিল। সেদিন শ্রমিক আন্দোলনের যারা কর্মী ছিলেন তাদের জন্য এমন প্রাথমিক বই-এর প্রয়োজন ছিল খুবই জরুরি। অনিল বাবু নিজেও ঢাকা জেলার শ্রমিক আন্দোলন, বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের সুতাকল শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগের কথা। তখনো পাকিস্তান হয় নি। ১৯৪০-৪২ সালের কথা। 'সাম্যবাদের ভূমিকা' তিনি সে সময় রচনা করেন। কোন সাহিত্যকর্ম হিসাবে নয়। শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক অনিল বাবু এ বই রচনা করেন। শ্রমিকদের জন্য সহজবোধ্য ক খানি প্রাথমিক বইএর চাহিদা পূরণের তিনি চেষ্টা করেন।

এই রচনার প্রয়োজন এবং সে সময়কার বাস্তব অবস্থার উল্লেখ করে অনিল বাবু ১৯৪২ সনে তার এই বই-এর প্রথম প্রকাশের ভূমিকাতে লিখেছিলেন : "নারায়ণগঞ্জের কাপড়-কল-অঞ্চলে যে শ্রমিক আন্দোলন চলিতেছিল, ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে আমি সেই আন্দোলনে যোগদান করি। ক্রমে আমরা যখন শ্রমিক বন্ধুদের সাথে মার্কসবাদ (সাম্যবাদ) সম্বন্ধে রীতিমতো আলাপ আলোচনা, পড়াশুনা শুরু করি তখন এই সম্বন্ধে কোনো সম্পূর্ণ এবং সহজপাঠ্য বাংলা পুস্তকের অভাবে বড়ই অসুবিধা হইত। আমাদের দরকার হইল এমন একটি পুস্ত ক যাহাতে মোটামুটি মার্কসীয় মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, যাহাকে ভিত্তি করিয়া ক্লাশ করা চলে এবং যে পুস্তক শ্রমিক-বন্ধুগণ তাহাদের সামান্য অবসর সময়ে নিজেরা পড়িয়াও মার্কসবাদ সম্বন্ধে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে।" ...

এই প্রয়োজন অনিলদা যেভাবে পূরণ করেন তাতে মানুষের সমাজ জীবনের বিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়াকে অনবদ্য সহজ ভাষা এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রকাশ করার তাঁর সহজাত ক্ষমতাটি ফুটে ওঠে। এ গ্রন্থ সেদিক থেকে আজ অবধি অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। এ বই-এর তাই একাধিক সংস্করণ হয়েছে। রাজনৈতিক সংকট-অবস্থায় গুপ্তভাবেও একে প্রকাশ করা হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়াতে সম্প্রতি এর একটি রুশ সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

অনিল বাবু রাজনৈতিক সংগঠনের দায়িত্ব পালনেই জীবন ব্যয়িত করেছেন। স্নেহ আর দরদী মনের মানুষ, অথচ সংসারে আবদ্ধ হলেন না। অপর রাজনৈতিক সাথী ও কর্মীদের সংসারকেই নিজের সংসার বলে ভেবেছেন। রাজনৈতিক দায়িত্বের দাবীতে আরো দুখানি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ : 'শ্রমিক আন্দোলনের হাতেখড়ি', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি, রচনা করলেও এর বাইরে আর কোনো বই তিনি রচনা করেন নি। অথচ ছোটদের জন্য গল্প বলার ক্ষমতাটিও ছিল

তাঁর মনোমুগ্ধকর, যার পরিচয় রয়েছে তার ছোটদের জন্য একটি রচনা : 'হারানো খোকা'য় ।

নিজের লেখার কথা আমরা কেউ বললেই তিনি বিনয়ের সঙ্গে লেখার ক্ষমতাকে অস্বীকার করতেন । অথচ অনিল বাবুর পক্ষে যে বইটি লেখা আজকের দিনের সময় পরিবর্তনের আন্দোলন, নতুন সমাজ তৈরির প্রয়াসে নিরত বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রী ভাবধারার কর্মীদের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার জন্য প্রয়োজন ছিল সে হচ্ছে তার নিজের আত্মজীবনী । কিন্তু এখানেও নিজের বিনয়বোধ এবং বর্তমানে শারীরিক দুর্বলতার কারণে রচিত হল না । এ ক্ষতি আমাদের জন্য অসামান্য ।

অনিল বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে সেই চল্লিশের দশকেই । বিশেষ করে '৪৩ কিংবা '৪৪ সনে । বয়সে তিনি জ্যেষ্ঠ তো বটেই । কিন্তু আচার আচরণে এত নম্র এবং স্নেহপরায়ণ যে অনিল বাবুকে 'অনিল দা' বলে সম্বোধনে আমার এবং আমার বয়স্ক অপর সাথীদেরও কোনোদিন কোনো সঙ্কোচ আসে নি । পাকিস্তানের কারাগারেও তাঁর সঙ্গে সময়ে সময়ে আমার থাকার এবং তাঁর সাহচর্য পাওয়ার সুযোগ ঘটেছে । সে সব দিনের কথাও এখন স্মৃতিতে ভেসে উঠছে । ...

০৮.০২.৮২

* * *

'সাম্যবাদের ভূমিকা'-র লেখক অনিল মুখার্জীর মৃত্যুতে আহূত শোকসভায় আমি একটু অংশ নিয়েছিলাম । অনিল বাবুর জীবনকাল : ১৯১২-১৯৮২, ৮ ফেব্রুয়ারি ।

অনিল দা'র সঙ্গে আমার পরিচয় সেই ১৯৪২-৪৩ সনে । কেবল আমি নই । আমি, মুনীর চৌধুরী, আবদুল মতিন, বাহাদুর (হেসামুদ্দীন আহমদ) : অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের একটি বিশেষ অংশের পরিচয় ঘটে অনিলবাবু এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে চল্লিশের সেই দশকে ।

অনিলবাবুর লেখার ধরণ ছিল অতুলনীয় । অথচ তিনি রীতিমাফিক সাহিত্যিক ছিলেন না । তাঁকে সাহিত্যিক বললে তিনি প্রতিবাদ করতেন । সংকুচিত বোধ করতেন । তিনি ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও নেতা । শ্রমিকদের জীবনযাপন, চাল-চলন, তাদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর পরিচয় । শ্রমিকদের সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠত ।

সেদিনকার সমাজতন্ত্রী আন্দোলন এবং সংগঠনের অবস্থা এবং আজকের পূর্ববাংলার তথা তার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের বিস্তার এবং সংগঠনের পার্থক্যের দিকটি অনিলবাবুর স্মৃতি নিয়ে কথা বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবে মনে ভেসে ওঠে ।

বর্তমানে বামপন্থী গণতন্ত্রী এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নানা সংগঠন ও ব্যাখ্যায় বিভক্ত। এটা যেমন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার এবং শক্তির প্রকাশ, তেমনি এর একটি অনিবার্য দুর্বলতার দিকেরও পরিচয় বাহক।

সে দুর্বলতার দিক হচ্ছে সংগঠনের এই বৈচিত্র্যকে বিভিন্নতা না ভেবে বৈরিতা হিসাবে বিবেচনা করা। বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী সংগঠনের আধিক্য থাকতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী শিবিরের সকল দলই যেন সকল দলকে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সংগঠন বলে গণ্য করে।

কিন্তু এমনটি প্রায়ই হয় না। প্রায়ই এদের একটি অপরটিকে শত্রু বলে বিবেচনা করে। ফলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সামগ্রিক শক্তি ক্ষুণ্ন হয়। অপরের শক্তিকে নিজের শক্তি বলে তখন আর গণ্য করা হয় না।

অনিল মুখার্জী ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ও নেতা ছিলেন। বাংলাদেশে এমন অনেক কর্মী আছেন যাঁরা মূলে এই কমিউনিস্ট পার্টিতেই সমাজতন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। অনিলবাবুর সাহচর্য লাভ করেছেন। কিন্তু হয়ত ঘটনাক্রমে কোনো প্রশ্নের মতপার্থক্যে তাঁরা মূল পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। সাম্যবাদকে লক্ষ্য রেখেই সংগঠন করেছেন। এবং সেদিক থেকে সমাজতন্ত্রী সংগঠন আজ যত অধিকই হোক না কেন, অনিল বাবু তাঁদের সকলেরই নেতা। অনিল বাবুর আমি ঘনিষ্ঠতা পেয়েছি। কিন্তু তাঁর মুখে আমাদের দেশের কোন বামপন্থী সংগঠন সম্পর্কে অশ্রদ্ধাপূর্ণ কোন মন্তব্য আমি শুনি নি।

এ কারণেই তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং এ কারণেই তাঁর মৃত্যুকে গণতান্ত্রিক সকল মহল এবং সমাজতান্ত্রিক সকল দল নিজেদের প্রিয়জনের মৃত্যু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে সকলে মর্মাহত হয়েছেন এবং মৃত্যুর দিনে যেমন, তেমনি এই শোকদিবসেও তাঁদের সকলে সমবেত হয়েছেন তাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে।

অনিলবাবুর এই জীবনাচরণটি বাংলাদেশের সকল সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দলের আচরণীয় আদর্শ বলে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক।

অনিল মুখার্জী প্রধানত ছিলেন দার্শনিক চরিত্রের। তিনি মিতভাষী, সহাস্যমুখের এবং দরদী মনের মানুষ ছিলেন। তাঁর সখ্য কেবল সমবয়সী বা রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর স্নেহ ও সখ্য বিস্তারিত ছিল কিশোর-কিশোরী পর্যন্ত। সমাজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পর্যন্ত। আমার নিজের পারিবারিক অভিজ্ঞতা থেকেই আমি তা জানি। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে, স্কুলে পড়ছে আমার যে ছোট ছেলেটি, সেও কান্নায় ভেঙে পড়েছে তার 'অনিল কাকু'র স্নেহ-মমতার কথা স্মরণ করে। নিজে অকৃতদার ছিলেন। নিজের আত্মীয়জনদের কাছে থাকেন নি। নিজের রাজনৈতিক কর্মস্থলকে নিজের অপরিবর্তনীয় স্বদেশ বলে গণ্য করেছেন। সেই স্বদেশে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। নিজের সেই

স্বদেশের ভাইবোনকে ভাইবোন বলে ভেবেছেন। ছোটদের নিজের সন্তানবৎ স্নেহ করেছেন।

বিচিত্র অভিজ্ঞতার মানুষ ছিলেন অনিলবাবু। ১৯৩০-এর দশক থেকে তাঁর রাজনীতিক কর্মজীবনের শুরু। কাজেই অর্ধ শতাব্দীর এক ইতিহাস ছিলেন তিনি।

তাঁর বিস্তারিত জীবনী এবং তাঁর সম্পর্কে স্মৃতি সংগ্রহ আমাদের সকলের জন্য, সে রাজনীতি করি কিংবা না করি, সকলের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। কারণ বর্তমানের অন্ধকার এবং হতাশার মধ্যেও আমরা বাঁচতে চাই। যখন যথার্থ মানুষের অভাবে আমরা দরিদ্র, তখন একজন যথার্থ মানুষের সাহচর্য থেকে আমরা বঞ্চিত থাকতে পারি নে। অনিল দার জীবনী এবং তাঁর স্মৃতির সাহচর্য আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

অনিলবাবুর 'সাম্যবাদের ভূমিকা', 'শ্রমিক আন্দোলনের হাতেখড়ি', 'স্বাধীনতার পটভূমি' প্রভৃতি রচনা দলমত নির্বিশেষে কর্মীমাত্রের অবশ্য পাঠ্য। এই সকল গ্রন্থকে আরো সুলভে এবং সার্বজনীনভাবে প্রচার করা আমাদের বামপন্থী সমাজতন্ত্রী সকল মহলের করণীয় বলে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক।

অনিল বাবুর মৃত্যুতে শোকের প্রশ্ন আসে না। যদিচ তাঁর কথা স্মরণ করলে; তিনি আর কোনো সেমিনার বা জনসমাগমে নির্বিষ্ট শ্রোতার মতো সামনের কাতারে এসে বসবেন না, কখনো মঞ্চে এসে তাঁর যুক্তিপূর্ণ মৃদুভাষণে শ্রোতা ও কর্মীদের যুক্তি বোধে অনুপ্রাণিত করে তুলবেন না এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবেন না, আমি কেমন আছি, আমার ছেলেমেয়েরা কেমন আছে : এ কথা ভাবলে চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে। তবু অনিলবাবুর মৃত্যুতে শোক নয়। অনিলবাবুর মৃত্যুতে আমাদের সমাজ জীবন, তার সমস্যা, মানুষের সমাজকে রূপান্তরিত করার যুগ যুগান্ত বিস্তারিত আদর্শে সকল ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে অবিচলিত থাকার যে চরিত্র তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা নিয়ে গর্ববোধ করার এবং অনুপ্রাণিত হবার আমাদের প্রয়োজন আছে।

অনিল বাবু হচ্ছেন বিপ্লবী চরিত্রের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত। সমরক্ষেত্রে সংগ্রামরত সৈনিক, যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজ দায়িত্ব পালন করার প্রশান্তিবোধ নিয়ে ছেদহীন নিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে বড় পাওয়ার জিনিস হচ্ছে, জীবনকে, সংগ্রামকে, সমাজরূপান্তরের স্বপ্নকে একটি দূরগামী দৃষ্টি দিয়ে দেখার দর্শন। সমাজ রূপান্তরের সংগ্রামে আমরা যতো সংকীর্ণ দৃষ্টির হব, যত আশু ফলাকাঙ্ক্ষী হব, যত অস্থির, অধৈর্য হব এবং যত নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন না হব, তত আমরা হতাশা বোধ করব। এবং সে হতাশা আমাদের নিজেদের জীবনকেই অর্থহীন করে তুলবে। অনিলবাবুর নিজের জীবন ব্যক্তিগত এবং সমাজগত সকল হতাশার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের জীবন। তিনি আমাদের মাঝে দীর্ঘজীবী হোন, সেই কামনাই আমাদের আজকের কামনা।

১৩.০২.৮২

কোথায় '৭১?

বাংলা একাডেমির মূল ভবনের পশ্চিমের যে ঘরটাতে আমি বসতাম সেখান থেকে ১৯৭১-এর ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে, অফিসের সময়ে, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সাদা পোশাকে গোপন দল আমাকে গ্রেপ্তার করে অপেক্ষমান একটা জীপে তুলে নিয়ে যায়।...

এখন বাংলা একাডেমির বাইরের চেহারার বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। হয়তবা ভিতরের চেহারারও। তাকে অনিবার্য বলেই আমার মতো প্রাক্তনকেও মানতে হয়।

মূল ভবনের দোতলার উপরে একটি তলা অবশ্য স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বের পর্যায়েই তৈরি হয়েছিল। সেই তলাটির পূর্ব দিকে ছিল পরিচালক তথা সেদিনের মহা পরিচালকের অফিস। পশ্চিম পাশের হল ঘরটাতে আমরা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনী ও সীমিত আকারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতাম। সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুষ্ঠানগুলির দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হত। তখন ঐ পদের নাম ছিল 'কালচারাল অফিসার'। সংস্কৃতি-অধ্যক্ষ। সেদিনকার সেই 'পর্যায়ে আমি বাংলা একাডেমির একজন কর্মচারী এবং কর্মী হিসাবে একাডেমিতে যোগদান করেছিলাম ১৯৬৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। তখন সৈয়দ আলী আহসান সাহেব একাডেমির পরিচালক। রাজবন্দী হিসাবে আমার কারাবাসের একটি পর্যায় শেষ হয়েছিল '৬২ সনের শেষের দিকে। ঠিক করেছিলাম, চরিত্রগতভাবে 'অ-রাজনৈতিক' আমার পক্ষে নিরীহ কিসিমের কিছু লেখাপড়া করার চেষ্টা করাই শ্রেয়। অবশ্য জীবনের কোনো ধনই ফেলা যায় না। কারা জীবনের অভিজ্ঞতাও জীবনের এক সম্পদ বিশেষ। কিন্তু সে পর্যায়ের কথা থাক।

এ পর্যায়ে বাংলা একাডেমির সঙ্গে যুক্ত হতে পারাটাকে কেবল কোন চাকুরি হিসাবে নিই নি। বাংলা একাডেমির সঙ্গে মনের আবেগগত সম্পর্কেরও একটি দিক ছিল। তাতেই বস্তুগত অন্য ক্ষয় ক্ষতি অনেকখানি পুষিয়ে যেত।

প্রথমে যোগ দিয়েছিলাম অনুবাদ বিভাগে। একজন সহকারী অনুবাদক হিসাবে। অনুবাদ বিভাগের তখন প্রধান ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চিন্তাবিদ আবু জাফর শামসুদ্দীন সাহেব। সৈয়দ আলী আহসান সাহেব, আবু জাফর শামসুদ্দীন সাহেব, লুৎফুল হায়দার চৌধুরী, আহমদ হোসেন : একামেীতে তখন কেবল এঁরা নন। পদে প্রধান না হলেও সবার মুরুব্বী ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সংকলন ও আঞ্চলিক ভাষা-অভিধান প্রকল্পের প্রধান সম্পাদক। তাঁর সহকারী ছিলেন গোলাম সামদানী কোরেশী। সংকলন বিভাগের অফিসার ছিলেন মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ। মুহম্মদ আবদুল কাইউমও সংকলন বিভাগে যোগ দেন। তাছাড়া ছিলেন শান্তিনিকেতনের এককালীন অধ্যাপক মুহম্মদ আদমউদ্দীন। শেখ মুহম্মদ শরফুদ্দীন সাহেবও ছিলেন। সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে তিনি তখন অবসর গ্রহণ করেছেন। কিছু পরে শিক্ষাবিদ এস. এন. কিউ জুলফিকার আলী সাহেবও এসে একাডেমিতে যোগ দেন।

অপর সহকর্মীদের নামও উল্লেখযোগ্য। স্মরণযোগ্য। তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সকলের নাম করতে গেলে কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। সেজন্য বাংলা একাডেমির পুরোন নথিপত্র দেখতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বর্তমান পর্যায়েরও বিশিষ্ট কর্মী ও সাহিত্যিক বশীর আল হেলাল সাহেব 'বাংলা একাডেমির ইতিহাস' রচনা করেছেন। এটি একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে সম্পাদিত হয়েছে।

কিন্তু আজ আমি সেকালের বাংলা একাডেমির কর্মীদের নাম উল্লেখ করতে বসি নি। আমার মনের একটি আফসোসের কথা বলতে চাচ্ছিলাম। এখনো আমি বাংলা একাডেমিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতে কিংবা আলোচনাতে যোগ দিতে যাই। একাডেমিতে গেলেই মূল ভবনের নীচের তলাতে আমার সেই পশ্চিমের ঘরটিতে যেতে ইচ্ছা করে। সে ঘরের এখন খুব পরিবর্তন না হলেও, ঘরটি এখন একাডেমির লাইব্রেরির একটি অংশ। ঘরে ঢোকার মুখে দরজার উপরের খিলানের দিকে চোখ যায়। না, এখন সেটি মজবুত। কিন্তু '৭১-এর ২৬ মার্চের পরে ২৭ মার্চ যখন বুকের দুরুদুরু কাঁপুনি নিয়ে এই ঘরটি দেখতে এসেছিলাম, তখন দেখেছিলাম এটি প্রায় বিধ্বস্ত। ২৫ মার্চ রাত্রে পাক হানাদারবাহিনী শহরের উপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রধান লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের হল, অধ্যাপকদের বাসভবন, শহীদ মিনার আর বাংলা একাডেমি, ২৫ মার্চ রাত্রিতে অধ্যাপকদের বাসভবনে হানা দিয়েছিল। ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবকে হত্যা করেছিল। তাঁর বাসভবন ছিল কালীবাড়ী বলে পরিচিত মন্দিরটির লাগ-পশ্চিম পার্শ্বে। সংখ্যাতত্ত্বের অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করেছিল শহীদ মিনারের বিপরীত অধ্যাপকদের ত্রিতল ভবনের নিচে। ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা তাঁকেও গুলি করেছিল তাঁর বাসার বাইরে, ধরে নিয়ে গিয়ে, সিঁড়ির নিচে।

শহীদ মিনারের স্তম্ভকে গোলার আঘাতে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। বাংলা একাডেমি একটা অফিস। লোকজন বাস করে না ভবনে। কিন্তু ২৫ মার্চ রাত্রে না হলেও ২৬ মার্চ সকালে নিশ্চয়ই রাস্তায় ট্যাঙ্ক কিংবা সাঁজোয়া বহর থেকে ভারি গোলা নিক্ষেপ করে বিধ্বস্ত করেছিল তেতলার পরিচালকের ঘর এবং নিচের তলার পশ্চিম পার্শ্বের আমাদের সংস্কৃতি আর সংকলন বিভাগের ঘর।

এই ঘরে ঢুকতে গেলেই বর্তমানের পরিবর্তনকে ভেদ করে আমার মনের চোখ চায় বিধ্বস্ত দরজার খিলানের দিকে। আর অন্বেষণ করে আমার বসার টেবিলের পেছনে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকত সাহিত্য-সংস্কৃতির পাণ্ডুলিপি আর নথি বুকে করে যে-লোহার আলমারিটি, সেই আলমারিটিকে।

আহা! ২৭ মার্চ এসে দেখি, সেই আলমারিটির বুক গুলির আঘাতে আঘাতে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এ ফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। ভিতরের তাক খুলে পড়েছে। পাণ্ডুলিপি দুমড়ে মুচড়ে গেছে। ঘটনার সময়ে তো ছিলাম না। কিন্তু পরে সেই ২৭ মার্চ যখন তাকে দেখি এবং ২২ বছর পরে আজো যখন কল্পনা করি সেই দৃশ্যটির তখনো বুঝতে পারি নে কেমন করে সেই আলমারিটি অমন করে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল। আলমারিটি কেবলমাত্র একটি নিরেট বস্তু ছিল না সেদিন আমাদের কাছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি স্মারক ছিল। তাই তাকে অমনভাবে আহত দেখে আমার মনে একটা মমতা ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি আলমারিটির উপর একটি রোজনামচাও লিখেছিলাম, 'গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত' এই নাম দিয়ে।

'৭১-এর পরে '৭২ সনে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর্যায়ে আমি বাংলা একাডেমি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি।

কিন্তু তাহলেও যখনি বাংলা একাডেমিতে গিয়েছি, তখনি আমার ঘরের, হানাদারদের গুলিতে ক্ষতবিক্ষত সেই সপ্রাণ আলমারিটির খোঁজ করেছে আমার মনের চোখ। হয়ত আরো কিছুদিন ছিল। এমন ঝাঁঝরা অপদার্থ একটা পদার্থের আর কী প্রয়োজন? তাই বোধহয় কিছুদিন পরে '৭১-এর পরবর্তী কর্মীরা তাকে আবর্জনার আধারে পরিত্যাগ করে দিয়েছেন। তাই আজ আর তার সাক্ষাৎ পাই নে। অথচ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদী আক্রমণের স্মারক হিসাবে আলমারিটিকে রক্ষা করা অসম্ভব ছিল না। মানসিক আবেগের দিক থেকে তার প্রয়োজনও ছিল। আলমারিটি যেমনভাবে আহত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, তেমনভাবে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার বুকে একটি পরিচয় লিপি উৎকীর্ণ করা যেত যাতে লেখা থাকত : 'পাক হানাদার বাহিনীর গোলার আঘাতে ক্ষতিবিক্ষত সাহিত্য-সংস্কৃতির আধার।'

এমনভাবে যদি '৭১-এর স্মারকটিকে রক্ষা করা হত তাহলে আজ বাংলা একাডেমির সর্বক্ষণের অনুষ্ঠানে নব প্রজন্মের যে-তরুণীরা একাডেমির চত্বরে এবং

তার ভবনে আগমন করেন, তাদের মনে তরল উচ্ছৃঙ্খলতার বদলে মহৎ ঐতিহ্যের স্মরণে কিছু দেশপ্রেমের আবেগ সঞ্চারিত হতে পারত।

তাই একাডেমিতে গেলে এখনো আমি আমার সহকর্মী ক্ষত-বিক্ষত সেই সাথীটির অনুসন্ধান করি। তার অসাক্ষাতে মন বেদনা বোধ করে।

হানাদাররা আর একটা ভারি গোলা নিক্ষেপ করেছিল বাংলা একাডেমির তেতলার পূর্বদিকের ঘর লক্ষ্য করে। এই ঘরই ছিল তখনকার পরিচালকের ঘর। পরিচালক, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বসতেন ঐ ঘরে। এই ঘর লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত গোলা ঘরের মধ্যে বিস্ফোরিত হওয়ার পরেও তার একটি বড় খণ্ড, প্রায় গোলার আকারে পড়ে ছিল মেঝেতে। গোলার সেই খণ্ডটিকে এখনো দেখা যায় নতুন ভবনে, আজকের মহা পরিচালক যেটিকে সম্মেলন কক্ষ হিসাবে ব্যবহার করেন, সেই কক্ষের চারপাশের টেবিল ঘেরা মাঝের জায়গাটিতে। একটি ছোট টেবিলের উপর রক্ষিত। তবু ভাল, গোলার এই খণ্ডটিকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করা হয় নি। কিন্তু কে একে '৭১-এর সেই পাকিস্তানি ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণের স্মারক হিসাবে চিনবে? কেমন করেই বা একজন দর্শক তাকে চিনবে? একাডেমির কার্যনির্বাহী পরিষদের কিংবা অপর কোনো আলোচনাতে যারা মিলিত হন তাঁদের কারুর যদি চোখ পড়ে এই অর্ধবিস্ফোরিত গোলার খন্ডটির উপর, তবু তিনি এর কোনো পরিচয় লাভ করতে পারবেন না। কেননা গোলার খণ্ডটির সঙ্গে কোনো পরিচয় লিপি যুক্ত করার আবেগ একাডেমির আজকের পরিচালকরা নিশ্চয়ই বোধ করেন না। তাই নির্বাক হয়ে ক্ষুদ্র টেবিলটির উপর অবস্থিত থাকে ইতিহাসের এই সাক্ষীটি। 'ইতিহাস কথা কও' বলে একটি কথা আছে, ঠিকই। কিন্তু ইতিহাসকে দিয়ে কথা না বলালে, সে কথা বলে না। লোহার এই খণ্ডটির মতো সে নির্বাক হয়েই পড়ে থাকে।

একাডেমির সম্মেলন কক্ষে কোন আলোচনা উপলক্ষে গেলে গোলার এই খণ্ডটির দিকে চোখ পড়তে মনে এই বেদনাটিও জাগে। তবু বেদনার কথাটি আমি পরিচালকদের কাছে ব্যক্ত করি নে। করলে তাঁরা নিশ্চয়ই কাঁধ ঝাঁকুনি দিবেন কিংবা আমার প্রশ্নকে দুর্বোধ্য কোনো বাক্য মনে করে অবাক দৃষ্টিতে আমাকেই প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করবেন।

থাক, বাংলা একাডেমির এই স্মারকের কথা। এখন বাংলা একাডেমি নতুন সংস্কারে সংস্কৃত। তার মূল ভবনের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করার চেষ্টা হচ্ছে। দক্ষিণ পার্শ্বের নতুন ভবন তৈরি হয়েছে। বাংলা একাডেমি যে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ২৫ মার্চের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, সে কথা বাংলা একাডেমিকে দেখে কোনো দর্শক, ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী কিংবা সাহিত্যিকের পক্ষে বুঝার উপায় নেই। অক্ষত বাংলা একাডেমি। সবুজ চত্বরে ঘেরা সাহিত্য—সংস্কৃতির মেলার অঙ্গন বাংলা একাডেমি। এই তার বর্তমান। আনন্দের বর্তমান। অতীতের দুঃখ ঘাঁটবার প্রয়োজন কি!

আসলে বাংলা একাডেমির কারুর কোনো অপরাধ নেই। বাংলাদেশের কোথায় গেলে আমরা সাক্ষাৎ পাব ১৯৭১-এর? মুক্তিযুদ্ধের কোন যাদুঘর নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া মসজিদ-মন্দির, সেতু, ভবন : কারুর কোন প্রতিমূর্তি নেই। শহীদ মিনারকে নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। বিরাট তার চত্বর। অগুনতি তাতে আরোহণের ধাপ। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারকে দখল, বেদখলের সংগ্রামই এখন প্রধান সংগ্রাম। এবং তা থেকেই শহীদ মিনার প্রায়ই 'মিনারের শহীদে' পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু এই শহীদ মিনার যে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আক্রমণে ২৫ মার্চ, '৭১-এর রাত্রিতে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তার আকাশচুম্বী দণ্ডকে ওরা নমিত করেছিল, তার কোনো স্মারক অবশিষ্ট নেই। তার কোনো প্রতিচিত্র নেই। শহীদ মিনারের বেদীর নিচে শিল্পীর কল্পিত যাদুঘর আছে। আছে তাতে দেয়াল চিত্রও। কিন্তু সে যাদুঘর স্মারকশূন্য।

'৭১-এর শূন্যতার বেদনাবোধ জাগে আমার 'রেসকোর্স ময়দানে' গেলেও। সে রেসকোর্স আজ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পরিণত। ফুল-ফলের নানা গাছগাছালিতে সে পূর্ণ। তরুণ-তরুণীর অনুরাগ, বিরাগের ছায়াঘেরা উদ্যান। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার এ এক অবদান বটে। এই রেসকোর্স সেদিন বৃক্ষশূন্য ছিল। এবং বিরাট এই উন্মুক্ত মাঠেই সেদিন ৭ই মার্চ তারিখে লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল। মাঠের উত্তর প্রান্তে সুউচ্চ মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণ, আর পূর্ব থেকে পশ্চিম : সর্বত্র স্থাপিত হয়েছিল মাইক্রোফোন ব্যবস্থা। এই মঞ্চে আরোহণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেদিন ঘোষণা করেছিলেন : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এই দৃশ্যপটের আর একটি অবিচ্ছেদ্য অলংকার ছিল সেদিন মাঠের দক্ষিণ দিকে এখনো যে পুকুর আছে, সেই পুকুরটির উত্তর পাড়ে সুউচ্চ চূড়া সমৃদ্ধ একটি মন্দির। কতকালের পুরোন ছিল মন্দিরটি, তা আমি জানি নে। কিন্তু আমার সেই কিশোর বয়সে, আমি যখন আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় আগে, ১৯৪০ সনে দূর বরিশাল থেকে এসেছিলাম ঢাকায় কলেজে পড়তে তখনো দেখেছি এই মন্দির এবং তার পার্শ্বের অন্যান্য ভবনকে। এখানে হিন্দু ধর্মের সারা ভারতব্যাপী প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের আগমন ঘটত। সন্ধ্যায় পূজার কাসরঘণ্টা বেজে উঠত। একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশের পরিচয় আমরা লাভ করতাম তখন রেসকোর্সের মাঠে বেড়াতে এসে। নিরীহ একটি মন্দির। কিন্তু বর্বর পাক বাহিনীর অধিনায়কদের কাছে অসহ্য। তাই এপ্রিলের কোনো একদিনে ডিনামাইট বসিয়ে ধূলিসাৎ করে দিল রমনার রেসকোর্সের সেই মন্দিরকেও। সে মন্দিরের স্থানটি আজ শূন্য। সে মন্দিরের সংস্কার করা হল না। মন্দিরটির আর পুনর্গঠন ঘটল না। হ্যাঁ, ইতিহাসকে তো অপরিবর্তিত রাখা যায় না। ইতিহাসের পরিবর্তন অনিবার্য। কিন্তু যে-ইতিহাস পরিবর্তনের সাক্ষ্যবিহীন, সে কি ইতিহাস কিংবা কেবল

পরিবর্তন? আমি আর আজকাল রেসকোর্সে যাই নে। কারণ, রেসকোর্সই নেই। পুকুরের ঘাটটিতেও যাই নে। কারণ, পুকুর পাড়ের সেই মন্দিরটি নেই। মন্দির বাদে এই পুকুর এখন অর্থহীন, সৌন্দর্যহীন।

'৭১-কে খুঁজতে এসে সোহরওয়ার্দীর উদ্যানের বাইরে আমাকে থমকে যেতে হয়। ৭ মার্চের সেই রেসকোর্স নেই। রেসকোর্সের সেই মন্দির নেই। আমি নিজেই এখন আর কল্পনা করতে পারি নে, এখানে ৭ মার্চ এসেছিল, লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ উচ্চারিত হয়েছিল : এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।...

* * *

'সংবাদ'-এর, পুরোন শহরের, মানসী সিনেমার বিপরীত দিকের ভবনও পাক বাহিনী জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এককালের বিপ্লবী কিশোর-সাহিত্যিক, যে নিপীড়িতা বন্দিনী ইলা মিত্রের উপর, রাজবন্দী থাকা অবস্থায়, অত্যদ্ভূত পরিণত চিন্তার এক কাব্যগাথা রচনা করেছিল, সম্প্রতি-কালে যে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল একটু স্নেহ, এবং প্রেমের অভাবে, সেই শহীদ সাবেরও ভস্মীভূত হয়েছিল জ্বলন্ত 'সংবাদ' ভবনের মধ্যে। মার্চের শেষে কিংবা এপ্রিলের শুরুতে। 'সংবাদ' এখন উঠে এসেছে পুরোন পল্টনের নতুন এক ভবনে। তার পুরোন ভবনের গায়েও সেদিনের পোড়া ঘায়ের কোন দাগ নেই। শহীদ সাবেরের প্রতিকৃতিই বা কোথায়?

* * *

এখন যেটা হোটেল শেরাটন। সেটাই ছিল যুদ্ধের সময়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল। তারই বিপরীতে, রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ছিল ইংরেজি দৈনিক 'দি পিপ্‌ল্'। একদিন দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল সেই 'পিপল'। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তখন ছিলেন যে-সব আন্তর্জাতিক সাংবাদিক, মার্চ এবং এপ্রিল মাসে, তাঁরা স্বচক্ষে সে দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আজ সে 'পিপ্‌ল্' বিলুপ্ত। তার ধ্বংসাবশেষেরও কোনো স্মারক নেই।

পাকবাহিনী জ্বালিয়ে দিয়েছিল 'ইত্তেফাক'কেও। বোধহয় ২৬ মার্চেই কারফিউর কারণে প্রেসে আটকা পড়েছিল অনেক সাংবাদিক। বিশেষ করে প্রেসকর্মী। দগ্ধভবন আর মেশিনের মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল নিহত প্রেসকর্মীদের মাথার খুলি। 'ইত্তেফাক' আজ দোতলার জায়গাতে বহুতল হয়েছে। শহীদ প্রেস কর্মীদের হয়ত নামের তালিকা আছে নতুন ভবনের কোনো স্থানে। আমি জানি নে কোথায়? কিংবা আছে কি প্রজ্জ্বলিত ইত্তেফাক ভবনের কোনো আলোকচিত্র বা তৈলচিত্র?

* * *

বন্ধুবর শিল্পী হাশেম খানকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আর কেউ না হোক, তিনি কি দেখেন নি, জগন্নাথ হলের বধ্যভূমিতে একপাল শকুনের লম্বা গলা উঁচিয়ে পাখা মেলে উপবিষ্ট থাকে, সেই দৃশ্যকে?

এখনো চোখ বুজলে সে দৃশ্য দেখে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি। এই মাঠেরই উত্তর দিকে নিহত ড. দেব আর তার সঙ্গীদের টেনে এনে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মাটি চাপা দিয়েছিল সে রাতের হন্তারা। জগন্নাথ হলের মূল ভবন থেকেও অগুনতি মৃত আর অর্ধমৃতদের টেনে আনতে বাধ্য করেছিল জীবিত যাদের রেখেছিল তাদের দিয়ে। এবং তারপরে তাদেরও মাঠের মধ্যে লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলিতে শেষ করেছিল। তারই ছবি, অস্পষ্ট হলেও, দূর থেকে তুলে রেখেছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী এক অধ্যাপক (অধ্যাপক নুরুল্লাহ) তাঁর দোতলা বাসার গোপন কোনো জায়গা থেকে।

হলের মাঠের গর্তে অর্ধ-পুঁতে রাখা শহীদদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নিশ্চয়ই গর্তের বাইরেও অর্ধাবৃত অবস্থায় পড়েছিল। আর তার উপর নজর পড়েছিল আকাশের শকুনদের। ওরা নির্ভয়ে সেদিন নেমে এসেছিল জগন্নাথ হলের মাঠে। শহীদদের দেহ দিয়েই ওদের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে দিনের পর দিন নিশ্চিন্তে পাখা মেলে বসেছিল সেই মাঠের মধ্যে! সে এক দৃশ্য! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের মাঠে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত শহীদ অধ্যাপক, ছাত্র আর কর্মচারীদের অর্ধ-পোঁতা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর একদল ক্ষুধার্ত শকুনের উপবেশনের দৃশ্য! এমন দৃশ্য আমি জীবনে কখনো কোথাও দেখি নি।

২৫ তারিখ রাত থেকেই আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। ২৬ পেরিয়ে ২৭ তারিখে গিয়েছিলাম বাংলা একাডেমিকে দেখতে। সে ছিল নির্বোধের দুঃসাহসের ব্যাপার। আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে : পরিবারের কেউ সে কথা জানত না। ২৭ কিংবা ২৮ তারিখে ঔৎসুকের টানে গিয়েছিলাম জগন্নাথ হলের মাঠের কাছে। টিএসসি থেকে শহীদ মিনার আর মেডিক্যাল কলেজের দিকে গেছে যে-রাস্তাটা, জগন্নাথ হলে মাঠটাকে হাতের ডাইনে রেখে, সেই রাস্তাটা দিয়ে এগুচ্ছিলাম আমি দক্ষিণ দিকে। আর তখনি জগন্নাথ হলের মাঠে সেই দৃশ্যকে আমি দেখেছিলাম : একপাল ভুক্ত শুকুনের দৃশ্য।

সে দৃশ্য কি আমাদের কোন শিল্পী দেখেন নি? যদি দেখে থাকেন তবে তাঁদের মধ্যে কেউ কি তার কোনো চিত্র এঁকেছেন? আছে কি তার প্রতিকৃতি কিংবা প্রতিচ্ছবি কোথাও? থাকলে শিল্পী-বন্ধুরা আমাকে বলবেন। আমি ফিরে যেতে চাই সেই দৃশ্যের কাছে, '৭১-এর জগন্নাথ হলের মাঠের সেই দৃশ্যে।

১৪.০৩.৯২

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

এই শিরোনাম দিয়ে কোনো লেখা লেখবার উপযুক্ত লোক আমি নই। সে কথা আমি জানি। আমি বহু বছর কেবল খোঁজ করেছি, বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৬৪ সনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় 'পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' নামে যে বৃহদাকার শব্দ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল তার বিস্তারিত পরিচয় কোনো সাহিত্যিক, ভাষাবিদ রচনা করেছেন কিনা। হয়ত করেছেন। সকল রচনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের ন্যূনতার কারণেই হয়ত আমি তা দেখি নি। এবং সে কারণেই নিজের মনে একটা ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ থেকে যাচ্ছে, যতটুকু পারি, আমি কিছু লিখি না কেন 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' এই নামে?

আসলে আধুনিক কালে পূর্বভারতীয় অঞ্চলের লোকভাষার উপর এরূপ অনন্য কর্মের বিস্তারিত পরিচয় দিতে পারেন এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সাহিত্যিক ও কর্মীবৃন্দ।

আমি নিজে এ কর্মের সঙ্গে কোনো পর্যায়েই জড়িত ছিলাম না। এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বাংলা একাডেমির একাধিক পরিচালক বা মহাপরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হক, সৈয়দ আলী আহসান এবং সম্পাদনার তত্ত্বাবধায়ক ও কর্মী হিসাবে জনাব গোলাম সামদানী কোরায়শী, জনাব লুৎফুল হায়দার চৌধুরী, জনাব আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম এবং সংকলন অধ্যক্ষ জনাব হাবিবুল্লাহ খন্দকার—এঁরা। কিন্তু সকল কাজের অন্তর্গত পরিশ্রম ও উদ্দীপনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে যে অবস্থিত ছিলেন অশীতিবর্ষ-প্রায় মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এটি আমি সেদিনও আন্তরিকভাবে অনুভব করেছি এবং সে অনুভূতিতে নিজে অনুপ্রাণিত বোধ করেছি।

কয়েকদফায় প্রায় দশ বছর কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করার পরে ১৯৬২ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আমি পুনরায় শিক্ষা ও সাহিত্যের জগতে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টায় ১৯৬৩ সালে যোগ দিয়েছিলাম বাংলা একাডেমির অনুবাদ

বিভাগে, একজন সহকারী অনুবাদক হিসাবে। সৈয়দ আলী আহসান সাহেব তখন বাংলা একাডেমির পরিচালক। এখন বাংলা একাডেমির প্রশাসনিক পরিচালককে মহাপরিচালক বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর আগ্রহ এবং আনুকূল্যে আমার পক্ষে সেদিন বাংলা একাডেমিতে যোগদান করা সম্ভব হয়েছিল। সে জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা বোধ করি। অনুবাদ বিভাগের পরিচালনায় ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন।

আমরা বিভাগ হিসাবে কাজের জন্য বসতাম বাংলা একাডেমির মূল ভবনের দোতলাতে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরটিতে। অভিধান প্রকল্পসমূহের প্রধান সম্পাদক হিসাবে তখন বাংলা একাডেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি বসতেন মূল ভবনের নিচের তলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরটিতে।

আমি যখন একাডেমির কাজে যোগ দিতে যাই তখন প্রথমেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ঘরে গিয়ে তাঁর কদমবুসী করে সালাম জানিয়েছিলাম। আমি এক কালে তাঁর ফজলুল হক হলের ছাত্রও ছিলাম। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আমি ছাত্র নই। সে হিসাবে আমাকে তিনি চিনবেন, এমন আশা আমি করতে পারি নি। তবু আমি ভাষার বাইরে চল্লিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যকার সামাজিক-সাহিত্যিক-রাজনৈতিক নানা আন্দোলন-আলোড়নের কারণে তাঁর স্নেহ-প্রীতি লাভ করেছিলাম। এই নতুন পর্যায়ে এসে যখন আমি তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলাম : স্যার, আপনি আমাকে চিনতে পারেন, আমি ফজলুল করিম, আপনার হলের ছাত্র ...? তখন তিনি আমাকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন : তোমাকে চিনব না? তোমার কথা আমি জানি। কত দীর্ঘদিন তুমি কারানির্যাতন ভোগ করেছ। তোমার উচিত, তোমার সে জীবনের কথা লেখা। ...

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কোনো একটি মাত্র ভুবনের লোক ছিলেন না। দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক, শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনে তিনি বহু ক্ষেত্রের আমৃত্যু কর্মী ছিলেন। ছিলেন একাধিক ভুবনের পথ প্রদর্শক ও চিন্তাবিদ। তাই আমার মতো সাধারণ একজন কর্মীর জীবনও তাঁর নিকট অপরিচিত ছিল না। এবং সে কথা স্মরণ করে আমাকে উৎসাহিত করাতে তাঁর অকৃপণ উদারতা প্রকাশে কোন দ্বিধা ছিল না।

বাংলা একাডেমির অফিসে আমি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আর একটু সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বটি লাভ করার পর। তখন আমাকেও বসতে হত নিচের তলার পশ্চিম পাশের ঘরটিতে। এই ঘরটিতে একটি টেলিফোনও ছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সেই সকাল সাড়ে ন'টায় অফিসে আসতেন। আর বাসায় ফিরতেন সেই বিকেল সাড়ে চারটা কিংবা পাঁচটায়। দুপুরে অফিসেই তিনি মধ্যাহ্নের খাবার খেতেন। কখনো টেলিফোন করার

প্রয়োজন পড়লে তিনি তাঁর নিজের ছোট ঘরটি থেকে আমাদের ঘরে চলে আসতেন। দুপুরের খাবারের পরে হয়ত তাঁর ঘরের ক্যাম্প-চেয়ারটিতে একটু বিশ্রাম নিতেন। কিন্তু সে সামান্য সময়ের জন্য। তা না হলে সারাটা সময়ই তিনি লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকতেন।

সেই '৬৩-'৬৪তে তিনি ব্যস্ত ছিলেন প্রধানত পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সম্পাদনা ও প্রকাশনায়। বিভিন্ন সংগ্রাহকদের দ্বারা একাডেমি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার দেড় লক্ষাধিক শব্দ তার অর্থ, প্রয়োগ ও দৃষ্টান্তসহ সংগ্রহ করেছিল।

'৬২ সাল থেকে '৬৪ সাল পর্যন্ত চলছিল তার মুদ্রণের কাজ। সম্পাদনা বিভাগে গোলাম সামদানী কোরায়শীর মতো ইংরেজি, বাংলা, আরবি ও ফার্সি জানা দক্ষ সহ-সম্পাদক ছিলেন। প্রেস থেকে মুদ্রিত ফর্মার প্রথম সংশোধন তাঁর হাতেই হত। কিন্তু মুদ্রণের শেষ আদেশ ড. শহীদুল্লাহর হাত দিয়েই হত। এবং শব্দের উচ্চারণ, তার জেলাগত উৎস, অর্থ এবং ব্যবহারের দৃষ্টান্ত, এবং নির্দিষ্ট শব্দের সঙ্গে অপর কোনো ভাষার কোন শব্দের সাদৃশ্য বা এর বিবর্তন প্রক্রিয়া—এর প্রত্যেকটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সিদ্ধান্তই ছিল শেষ সিদ্ধান্ত।

যে একনিষ্ঠ পরিশ্রমের কথা এই প্রকল্পের বাইরের একজন উৎসাহী হিসাবে আমি অনুমানের ভিত্তিতে এখানে উল্লেখ করলাম তার অভিজ্ঞতার কথা বললেন জনাব আবদুর রাজ্জাক। তিনি আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সংগৃহীত শব্দের বিন্যাসকরণ ও লিপিবদ্ধকরণের বিস্তারিত কাজের ক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অন্যতম সহকারী হিসাবে বেশ কয়েক বছর বাংলা একাডেমিতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। আমার ব্যক্তিগত অনুরোধে স্মৃতিচারণ করে তিনি বললেন : যে জিনিসটি স্যারের এই বৃদ্ধ বয়সেও আমাদের সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করত তা তাঁর অনলস পরিশ্রম এবং তীক্ষ্ণ বিচারমূলক একাগ্রতা। বস্তুত '৫৯ সনের ডিসেম্বরের শেষে বাংলা একাডেমিতে যোগদান থেকেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একাডেমির আদর্শ অভিধান শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে নিবদ্ধ ছিলেন। কোনোদিন তিনি বিলম্বে অফিসে আসেন নি। যে হাজার হাজার শব্দের কার্ড আমরা তাঁর পরীক্ষা ও সংশোধনের জন্য পেশ করেছি তার প্রতিটি কার্ডকে তিনি গভীরভাবে বিবেচনা করতেন। কোনো শব্দের অনুরূপ শব্দ অভিধানের অপর কোথাও থেকে থাকলে সেই শব্দের সঙ্গে এই নির্দিষ্ট শব্দের তুলনামূলক বিচারের জন্য সেই শব্দকে তিনি তুলে আনতেন। মোটকথা এই কঠিন পরিশ্রমের কাজে 'ফাঁকি' বলে যদি কোন শব্দ ব্যবহার করা যায়, তবে আর যার ক্ষেত্রেই সেটি প্রয়োগ করা যাক না কেন, বৃদ্ধ মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে নয়।

জনাব রাজ্জাক আরো বললেন : আসলে এই কাজটির গুরুত্ব আমরা কিংবা তাঁর অপর কোনো সহকর্মী বা সাহিত্যিক যথার্থভাবে অনুভব করতে পারেন নি। তাই এই কাজটি শেষ করার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন নানা তরফ থেকে সেদিন উঠেছিল। কিন্তু আজ মনে হয়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে নিজের পরিশ্রমে নিজের জীবদ্দশায় এই কাজটি সম্পন্ন করে গিয়েছেন, এটি আমাদের জাতীয় ভাগ্যের কথা। তাঁর অবর্তমানে এ কাজ আদৌ সম্পন্ন হত না।' জনাব রাজ্জাকের এ কথা যথার্থ।

এই অভিধান প্রথমে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সনে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় মুদ্রণ হিসাবে ১৯৭৩ সনে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এর পুনঃপ্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশ ছিল দুই খণ্ডে। এবং তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল প্রথম খণ্ডে ভূমিকা ও প্রসঙ্গকথা বাদে ৪৬৮ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় খণ্ড ছিল ৫৯০ পৃষ্ঠার। অর্থাৎ মোট এক হাজার পৃষ্ঠার অধিক।

এমন গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন কি এর কোনো প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল? আমার স্মৃতিতে এমন ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে না। অথচ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তখনো জীবিত। এই মহৎকাজের জন্য তাঁকে কি কোনো আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল? না, তেমনও আমার স্মরণে আসে না। কেবল মনে পড়ে একটি ঘটনার কথা। '৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে। সে যুদ্ধের উপলক্ষে আমাদের তরুণ, প্রবীণ সাহিত্যিক অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকে নানা সরকারি খেতাব আর পদক উপার্জন করেছেন।

একদিন মধ্যাহ্নে 'স্যার' (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে আমরা আনন্দ আর গর্বের সঙ্গে কাছ থেকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করতাম।) তাঁর ছোট ঘরটি ছেড়ে হয়ত টেলিফোন করতে আমাদের ঘরে এসেছেন। এমন সরল মানুষ আমি জীবনে কম দেখেছি। কথা প্রসঙ্গে আলাপ উঠেছিল সেদিন আমাদের সাহিত্যিক আর অধ্যাপকদের এইসব খেতাব, পদক আর সম্মান প্রাপ্তি নিয়ে। আকস্মিকভাবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বিশিষ্ট আনুনাসিক উচ্চারণে বলে উঠলেন : দেখ তো, তোমাদের কতো জনে কতো কিছু পেলে। কিন্তু আমি কী পেলাম?

এমন সরল সত্য প্রশ্নের জবাব দানের কোনো ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি আন্তরিকতা নিয়ে শুধু বললাম : স্যার, আপনি যে কিছু পেলেন না, এটিই ইতিহাসে আপনার বড় পরিচয় হয়ে থাকবে ...।' আমি জানি, এমনভাবে প্রবোধ দেওয়া আমার উচিত হয় নি। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সত্য ভাষণের অমন জবাবদিহিতে আমা নীরব থাকা ছাড়া কী গত্যন্তর ছিল? কিন্তু তাঁর প্রশ্নে নীরব থাকা তাঁকে অশ্রদ্ধা জানাবার সামিল হত। তাই আমার এমন উক্তি। কিন্তু সে উক্তিতে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। কারণ, আমি সেদিনও বুঝেছিলাম সিতারা-ই-পাকিস্তান, ইমতিয়াজ-এ পাকিস্তান বা আদমজী-দাউদের পুরস্কার একদিন পুরস্কার প্রাপ্তদেরই পরিহাস করবে। এবং তার বিপরীতে খেতাবহীন ড. মুহম্মদ

শহীদুল্লাহই শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্তরকাল দ্বারা স্মৃত হবেন। কিন্তু আমার সান্ত্বনাদানে শিশুর মতন সরল-প্রাণ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে তৃপ্ত হতে পারেন নি, সে কথা আমার স্মৃতিতে এখনো ভাসছে। আমার কথায় আবার তিনি আর একটু ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট উচ্চারণে বললেন : "আঁ, এতে আমার কী লাভ? আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমার কবরকে ফুলই দাও কিংবা তুচ্ছই কর, তাতে আমার কি আসবে যাবে?' তাঁর এমন জিজ্ঞাসারও সত্যি কোনো জবাব ছিল না। এই ক্ষোভ নিয়েই সেদিন তিনি বলেছিলেন : দেখ, অন্যরা খেতাব পায় আর আমাকে ভারত থেকে একটি ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনে কেন দাওয়াত করা হয়, আমার কাছে পাকিস্তান সরকার থেকে তার কৈফিয়ৎ তলব করা হয়।' এ অভিযোগ অসত্য নয়। কিন্তু এর বিস্তারিত তথ্য বাংলা একাডেমির নথি এবং ড. শহীদুল্লাহর জীবনীকাররাই দিতে পারবেন।

বাংলা একাডেমি থেকে বিদায়কালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে একটি বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। তাতে সম্মান ও শ্রদ্ধার সূচক হিসাবে বাংলা একাডেমির সকল গ্রন্থের একটি সেট তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। সেসব গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম ছিল 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'। এই সংবর্ধনাটিতে হয়ত উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আবদুর রাজ্জাক। তিনি আমাকে এই সংবর্ধনার একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন : 'স্যার, আপনার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলনের এই কাজ একটি ঐতিহাসিক অবদান হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' এমন কথায় সেদিনও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নাকি ক্ষোভের সঙ্গে জনাব রাজ্জাককে বলেছিলেন : 'আঁ, তুমি একথা বলছ? কিন্তু কই, আর কেউ তো এমন কথা বলে না।'

না, বাংলাদেশের অপর কেউ না বললেও বাংলা ভাষার আর এক কৃতীপুরুষ সুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায় এই আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রসঙ্গে অকাতরে প্রশংসা করে বাংলা একাডেমিকে পত্র লিখেছিলেন।

আর এই তথ্যের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলা একাডেমির অপর এক কর্মী জনাব নূরুল ইসরামকে। তিনি পূর্বে বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগারে ছিলেন। বর্তমানে তার সাহিত্য শাখার একজন অফিসার। কিন্তু তাঁর বিশেষ আগ্রহ এবং উদ্যোগ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর স্মৃতিকে জাগরুক রাখা। নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বেশ কিছু মূল্যবান পত্র সংগ্রহ করে 'পত্র সাহিত্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' নামে একখানি সংকলন প্রকাশের চেষ্টা করছেন। এর পাণ্ডুলিপি বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কাছে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁর এই পাণ্ডুলিপিখানা প্রকাশিত হলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটি আন্তরিক পরিচয় আমরা লাভ করতে পারব। জনাব নূরুল ইসলামের কাছেই ১৯৬৪ সনের ডিসেম্বর ২৩ তারিখে লেখা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'আঞ্চলিক ভাষার

অভিধানের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক দীর্ঘ চিঠির কপিটি আমি দেখতে পেলাম। বাংলা একাডেমির সেক্রেটারীর নিকট থেকে পশ্চিম বাংলার বিধান পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের একটি উপহার-কপি পেয়ে তার জবাবে একাডেমির সেক্রেটারীকে এই ধন্যবাদপত্র পাঠান। ইংরেজিতে লিখতে হচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন : '... আমাদের বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত এ ধরনের কাজ আর হয় নি। এবং আপনাদের একাডেমি তাঁদের এই কাজ দ্বারা কেবল যে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনেই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তাই নয়। সমগ্র ভারতের কাছেই এ একটি দৃষ্টান্ত বিশেষ। ... আমি কেবল আশা করব এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাব যেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং তাঁর সহকর্মী সম্পাদকবৃন্দ তাঁদের আবদ্ধ এই বৃহৎ কর্মকে সমাপ্ত করার আয়ুষ্কাল লাভ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিকট পত্র লেখার সুযোগের অপেক্ষায় থেকে আজ আপনার মাধ্যমে তাঁকে এবং তাঁর সহকর্মীদের আমি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞান করছি।"

'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'-এর প্রথম সংস্করণের প্রসঙ্গকথা লিখেছেন একাডেমির পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান। সেখানে তিনি উপযুক্তভাবেই ভাষার পরিবর্তনশীলতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কী প্রকারে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার নমুনা বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে, তার পরিচয় দিয়েছেন। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এবং মুনীর চৌধুরীসহ যে সব সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ তাঁদের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'সংগৃহীত শব্দের উচ্চারণ ও বানান নির্ধারণের জন্য "ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে সতেরটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়।" "অশীতিবর্ষ যখন অতিক্রান্তপ্রায় তখনও শ্রদ্ধেয় ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রধান সম্পাদক হিসাবে উহার সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণে কোনো দ্বিধা দেখান নাই।"

কিন্তু আমার দুঃখ সেই অশীতিবর্ষ অতিক্রান্তপ্রায় প্রধান সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিজের জবানীতে বা একাডেমির পরিচালকের প্রসঙ্গকথায় এই কাজের অন্তরালের অন্তরঙ্গ কাহিনীটি বিবৃত দেখতে পাই নে আমরা, আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের ভূমিকার কোন অংশে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটি ভূমিকা আছে। সেখানে তিনি তাঁর স্বভাবজাত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ভাষার বিবর্তনের কথা বলেছেন। আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্বের প্রসঙ্গে এই ভূমিকার এক স্থানে তিনি লিখেছেন : "ম্যাকসমুলার বলিয়াছেন "দি রিয়াল এ্যান্ড ন্যাচারাল লাইফ অব ল্যাংগোয়েজ ইজ ইন ইটস ডায়ালেকটস"— অর্থাৎ ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন তাহার উপভাষাগুলিতে। এই জন্য ব্যক্তিগতভাবে বহুদিন হইতে অনেক এই কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহাদের

প্রবন্ধগুলি প্রধানত কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে আমি ১৩২৭ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আহূত ছাত্র সম্মিলনীতে মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে যে ভাষণ প্রদান করি তাহাতে বলিয়াছিলাম, "ভাষা তত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান প্রাদেশিক বিভাষার (উপভাষার) সাহায্যে হইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষার সহিত তুলনা করিলে দেখিবে মূলে ছিল 'মুই' এক বচন এবং 'আমি' বহুবচন। এমনকি আসামীতে 'ময়' এক বচন এবং 'আমি' বহুবচন। প্রাচীন বাংলায় যে এইরূপ প্রয়োগ ছিল, তাহা চট্টগ্রামের 'চাকমা' বুলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। চাকমায় 'মুই' একবচন এবং 'আমি' বহুবচন। বাঙ্গালায় 'আমি যাই, চাকমায় 'মুই যাং', বাঙ্গালায় 'আমরা যাই' চাকমায় 'আমি যেই'। দি ইংলিশ ডায়ালেকট ডিকশনারী প্রায় তিনশত স্বেচ্ছাসাহিত্যসেবকের যোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের প্রাদেশিক বিভাষা সংগ্রহের জন্য আমরা কি বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করিয়া উদ্যোগী ছাত্র সাহিত্য-সেবক পাইব না?" (পৃ. ঝ. দ্বিতীয় মুদ্রণ, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ১৯৭৩)

বস্তুত যে প্রশ্ন তিনি তাঁর যৌবনকালে ১৩২৭ তথা ১৯২০ সালে উত্থাপন করেছিলেন সেই প্রশ্নের জবাব হিসাবেই যেন আশি বছর বয়সে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনার দায়িত্ব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নির্বাহ করেছিলেন। তা না হলে এমন কাজের প্রশ্নে ড. শহীদুল্লাহর সেই বৃদ্ধ বয়সে জীবিকা নির্বাহের কোনো কথা চিন্তা করা যায় না। ভাষা এবং বিশেষ করে বাংলা ভাষার বিবর্তনের বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যে লৌকিক এবং গণতান্ত্রিক বোধ তাঁর যৌবনকাল থেকে সক্রিয় ছিল সেই গণতান্ত্রিক বোধ থেকেই তিনি বাংলা ভাষাকে সেবা করার সুযোগ হিসাবে 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

১৩২৪ অর্থাৎ ১৯১৭-১৮ সনে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বয়স যখন বত্রিশ বছর মাত্র তখন তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে ভাষার বিবর্তনের প্রশ্নে যে অভিমত তুলে ধরেছিলেন সেটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

এই মুল্যবান প্রবন্ধের বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিবার স্থান এটি নয়। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আযৌবন গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর এ এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য। তাই আঞ্চলিক ভাষার অভিধান তৈরি তাঁর কাছে ছিল ভাষার বিকাশে গণতান্ত্রিক প্রবাহের অগ্রগতিতে নিজের বিশ্বাস ও সেবার সংযোগ সাধন। কাল থেকে কালে লৌকিক ভাষাই সাধু ভাষাকে একদিক দিয়ে যেমন তার সাহিত্যের বাহন হওয়ার ভাব ও শব্দ সম্ভার যোগান দিয়ে এসেছে, তেমনি সেই স্রোতে সাধুভাষার জনজীবন বিচ্ছিন্ন ধারাকে ক্রমাধিকভাবে অপসারিত করে ভাষা ও সাহিত্যকে জনগণের নিকটবর্তী করে তুলেছে। এই প্রবাহ আজো সক্রিয়।

আধুনিক জীবনে সে বরঞ্চ অধিকতর শক্তিশালীভাবে সক্রিয়। বাংলার জেলা থেকে জেলায়, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে শব্দের রূপ এবং উচ্চারণ আমাদের সাধু বা বইএর ভাষা থেকে ভিন্ন বটে। কিন্তু যাকে আমরা সাধু স্ট্যান্ডার্ড ভাষা বলে অভিহিত করি তার উৎস হচ্ছে এই লোক ভাষা। সেখান থেকেই আসে উপমা, দৃষ্টান্ত, প্রয়োগ এবং চিত্রকল্পের বৈচিত্র্য। আঞ্চলিক বা লোকভাষা হচ্ছে আমাদের তথাকথিত সাধু বা বই এবং বক্তৃতার ভাষার জননী স্বরূপ। সে যত সমৃদ্ধ, আমাদের বক্তৃতা এবং সাহিত্যের ভাব ভাষা তত সমৃদ্ধ। লোকভাষার কাছে আমাদের শিক্ষিতজনের সাধু ভাষার এই ঋণকে উপলব্ধি করবার মহৎ দায়িত্ববোধ থেকেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আমাদের লোকভাষার অপূর্ব সম্পদের দৃষ্টান্ত হিসেবে 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সম্পাদনা করেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি তথা বাঙালির ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যের আলোচনার দিনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই দানকে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য।

১০.০২.৮৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সেকাল, একাল

এ বছরের এ, কে, নাজমুল করিম স্মারক বক্তৃতার শিরোনাম সমাজতত্ত্বের দর্শন বা দর্শনের সমাজতত্ত্ব নয়। এ আলোচনার ইংরেজি শিরোনাম হতে পারে : 'র‍্যানডম টক'। বাংলায় বললে এলোপাতাড়ি আলাপ।

সেই শিরোনামেই বলছি।

১৯৪২ সালের কথা : ৪৭ বছর তো বটেই। '৪০ থেকে ধরলে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

সেদিনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজকের তুলনাতে, ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যায় এবং সংগঠন ও পরিবেশগতভাবে ছিল একটি 'আশ্রম' বিশেষ। এ আশ্রমের বাইরে যুদ্ধ, বিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল, একথা সত্য। তবু চল্লিশের দশকের মেষ তথা দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রমিক পরিবেশ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ঝড় উঠেছিল। বিপর্যয়ের আলামত আসছিল। কিন্তু আমার এবং জ্যেষ্ঠপ্রতিম নাজমুল করিমের প্রিয় যে স্মৃতি সেই আশ্রমের ছিল, সে স্মৃতি ছাত্র-শিক্ষকদের স্নেহ-শ্রদ্ধা, নৈকট্য এবং সাহচর্যের স্মৃতি।

'৭৫-এর পরবর্তীতে নাজমুল করিম যখন নানা জটিল রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন তখনো তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা থেকে অনতিদূরে আমার ফ্লাটে হাঁটতে হাঁটতে এসে জিজ্ঞেস করতেন : সরদার, আপনার মনে আছে রবি গুহ আর মদন বসাকের কথা। সেই '৪২-৪৩-এর কথা? আমাদের শিক্ষক অজিত সেনের কথা?

এমন কথাতে অতীতের জন্য একটি আফসোসের সুর ভেসে উঠতে পারে। কিন্তু আমরা তো জানি প্রতি মুহূর্তে বর্তমান অতীত হয়ে যাচ্ছে। এবং অতীতকে বর্তমানে প্রত্যাবর্তন করানো যায় না। আমাদের এমন স্মৃতিচারণে অতীতকে অপরিবর্তিত রাখার চিন্তা আমরা করতাম না। আমরা জানতাম, অতীতকে

বর্তমানে ফিরিয়ে আনা যায় না। এবং অতীত মানেই সবকিছু মহৎ নয়। এবং বর্তমান মানেই সবকিছু অকাম্য নয়। অবশ্য একটা বয়সের পরে ব্যক্তিমাত্রের দৃষ্টিই সামনের চাইতে পেছনের দিকে নিক্ষিপ্ত হয় অধিক। সে বয়স যাদের হয় নি সেই প্রজন্মের দৃষ্টি থাকে ভবিষ্যতের দিকে। কিন্তু অতীত ব্যতীত বর্তমান যেমন অকল্পনীয়, তেমনি কোনো বর্তমানই কেবল অতীতের রোমন্থনে বদ্ধ থাকতে পারে না। আমরা বলতাম : অতীতের মহৎ কিছু অনুভূতি এবং মূল্যের কথা। অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু অভিজ্ঞতার কথা। সেই মহৎ ঐতিহ্য সম্পর্কে বর্তমানকে অবগত করার যথাসাধ্য চেষ্টার দায়িত্ব আমরা বোধ করতাম।

'৪১-৪২-এ ঢাকা কলেজ : ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের সময়ে নির্মিত হয়েছিল যে লাট ভবন, কার্জন হলের বিপরীতে, উন্মুক্ত অঙ্গনের সেই ভবনে আমার সহপাঠী, বিজ্ঞানের ছাত্র আবদুল মতিন এখনো জীবিত। স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে বাসকারী হলেও তিনি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজো সক্রিয়। এককালের প্রখ্যাত সাংবাদিক। তাঁর ছাত্রজীবনের একটি গল্প-সংকলন ইংল্যান্ডে বসে সম্প্রতি প্রকাশ করতে গিয়ে সংকলনটির উৎসর্গ পত্রে তিনি তাঁর সমকালের যে কয়েকজন সাথীর নাম উল্লেখ করেছেন তাঁর অন্যতম হচ্ছেন, নাজমুল করিম।

তিনি লিখেছেন :

"ছাত্রজীবনে যাঁরা আমাকে নবজীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবি গুহ, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দীন, সানাউল হক, সরদার ফজলুল করিম, নূরুল ইসলাম চৌধুরী ও এ. কে. নাজমুল করিম। এই গল্প সংগ্রহ তাঁদের উদ্দেশে নিবেদিত।"

সেদিনের ঢাকার প্রগতিশীল অংশটির আভাস দেবার জন্য বন্ধুবর মতিন তাঁর 'কাস্তে' সংকলনটির ভূমিকায় লিখেছেন : "সম্ভবতঃ ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে আমাদের প্রতিষ্ঠানটি 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে পরিচিত হয়। সংঘের মুখপত্র হিসাবে 'প্রতিরোধ' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। যতদূর মনে পড়ে, সদস্যর মাসে একবার করে মিলিত হয়ে সাহিত্যে সমস্যা, সাহিত্যিকের দায়িত্ব, শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব, কোন বিষয়ে লিখবো, কার জন্য লিখবো ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন। গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পড়া হত এই সভায়। লেখাগুলো পড়ার পর প্রত্যেক সদস্য তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন। এই সাহিত্য সভার মাধ্যমে রণেশ দাসগুপ্ত, সত্যেন সেন, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, অধ্যাপক অজিত গুহ এবং সরলানন্দ সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ নূরুদ্দীন এবং সানাউল হক সংঘের উৎসাহী সদস্য ছিলেন।"

দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উল্লেখ করে মতিন লিখেছেন : প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষ তখন এক অত্যন্ত অনিশ্চিত ও সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পার হচ্ছিল। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, ১৯৪৩-এর সর্বগ্রাসী মন্বন্তর,

১৯৪৫-এ নাৎসী বিরোধী যুদ্ধের অবসান, ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে বোম্বের নৌবিদ্রোহ, ২৯ জুলাই ডাক ধর্মঘটের সমর্থনে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট, ১৬ আগস্ট কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাংগা, ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগ আমাদের জীবনে বহু অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের জন্য দায়ী।"

হ্যাঁ, নাজমুল করিম, রবি গুহ, আবদুল মতিন, আমি, সৈয়দ নূরুদ্দিন, মুনীর চৌধুরী : সেদিনকার তরুণরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সেদিনের সেই জ্ঞানাশ্রমের শান্তিসুধা সচেতভাবে আকণ্ঠ পান করে আমরা আনন্দ এবং উজ্জীবিত বোধ করতাম। মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা বাড়ছিল। ধরা যাক '৩৯-৪০ সাল থেকে। হিন্দু ছাত্ররা ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে বলত : মক্কা ইউনিভার্সিটি। তবু '৪৩-'৪৪ সালেও ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীই ছিল সংখ্যায় অধিক। শিক্ষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ তো বটেই। ধর্মীয় বিভাগ ব্যতীত প্রায় সকল বিভাগেই অধিক সংখ্যক শিক্ষক ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। এবং সেদিনকার শিক্ষকদের অনেকেই ছিলেন অবিভক্ত ভারতের প্রখ্যাত গবেষক ও শিক্ষক। এঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন বসু, হরিদাস ভট্টাচার্য, এন, এম বসু, কালিকারঞ্জন কাননগু, ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ড. এইচ, এল দে, ডি, এন, বানার্জী, অজিত সেন, অমিয় দাশগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার। মুসলিম শিক্ষকদের মধ্যেও ছিলেন : স্যার এফ রহমান, ড. এম, হাসান, ড. মাহমুদ হোসেন, ড. শহীদুল্লাহ, কবি জসিম উদ্‌দীন। 'মক্কা ইউনিভার্সিটির' অধিকসংখ্যক শিক্ষক হিন্দু। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প চারদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। তার তেজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু '৪৫-৪৬ সাল পর্যন্তও শিক্ষকদের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির মানসিকতা ছিল না। কোনো মুসলমান ছাত্রের প্রতি কোন হিন্দু শিক্ষক কোনো অপ্রীতিমূলক এবং কোন বৈষম্যমূলক আচরণ, বিশেষ করে তাকে জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে, তার জ্ঞানের আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, করেছেন এমন অভিযোগ ত্রিশের ছাত্র আবদুর রাজ্জাক কিংবা চল্লিশের দশকের আমাদের পরিচিত কোনো মুসলমান ছাত্রের কাছেই আমরা শুনি নি। পরবর্তীতে অধ্যাপক রাজ্জাকের সেই স্মৃতিচারণটি উল্লেখযোগ্য, যেখানে তিনি বলেছেন : আমার প্রতি আমার শিক্ষকদের স্নেহের এই এক পরিচয় যে, আমি আমার এম. এ. পরীক্ষার ভাইভাতে উপস্থিত হচ্ছি নে কেন তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁরা লোক পাঠিয়েছেন আমার আস্তানায়, আমাকে ধরে নেবার জন্য।

ইতিহাস এবং মহৎ ঐতিহ্য : শব্দ দুটি বেশ ভারি। কিন্তু 'ইতিহাস এবং মহৎ ঐতিহ্য' স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনা থেকে রক্ষিত হয় না। তাকে রক্ষা করতে হয়। গবেষণার মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করতে হয়। যত্নে তাকে লালন করতে হয়।

নাজমুল করিম এবং আমার : তথা সেই '৪২ থেকে '৪৬ সালের আমাদের শিক্ষক অজিত কুমার সেনের ছবিটি এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। শুভ্র ধুতি-চাঁদরে আচ্ছাদিত দীর্ঘকায় মৌন-গম্ভীর পুরুষ। কিন্তু কালের হাওয়া থেকে

ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর সে ব্যতিক্রমী চরিত্র সেদিনের কিশোর আমাদের কাছেও ধরা পড়ত। আমরা তাতে অনুপ্রাণিত হতাম। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক। সেদিন সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব বলে কোনো ভিন্ন বিভাগ ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু অজিত সেনের অধিকতর আগ্রহ ছিল সমাজ পরিবর্তনের দিকে। সমাজের বিশ্বাস, আচার-আচরণ, প্রবাদ : এদের সামাজিক-ভৌগোলিক-আর্থিক মূলের দিকে। আমাদের কাছে তিনি তা বিশ্লেষণ করে বুঝাতেন। বুঝাতেন বাংলাতে। সেই ইংরেজি প্রাধান্যের যুগে। আমাদের টিউটরিয়াল খাতায় মন্তব্য করতেন বাংলায়। নিজের নাম সহি করতেন বাংলায়। শুনেছিলাম, ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ কিংবা বিভাগের অধ্যক্ষ : এঁদের কাছে কোনো আবেদন কিংবা পত্র পাঠাতেন তিনি বাংলায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষকবৃন্দ 'এ, কে নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশ করে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। এ, কে নাজমুল করিম ঢাকা ইইনভারসিটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এ, কে নাজমুল করিম যেমন সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎ ছিলেন, তেমনি আজ লোকান্তরিত নাজমুল করিম নিজেও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছেন। এ, কে নাজমুল করিমের নিজের জীবনের, তাঁর চিন্তা ও চেতনার সমাজতত্ত্ব।

কথাটি আমার মনে হয় 'এ, কে নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থে' মুদ্রিত চল্লিশের দশকের যুবক নাজমুল করিমের কয়েকটি রচনা আবার পাঠ করে। এদের মধ্যে রয়েছে : 'মুসলিম অভিজাত ও মধ্যবিত্ত', 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি', 'পূর্ব সীমান্তের অধিবাসী', 'ভূগোল ও ভগবান', 'ধর্মের বিবর্তন ও মার্কসবাদ', এই শিরোনামের কয়েকটি রচনা। নাজমুল করিম বেঁচে থাকতে তাঁর তরুণ বয়সের এসব রচনার কোনো সংকলন প্রকাশ করেন নি। তাঁর জীবনকালে ষাট কিংবা সত্তরের দশকের কেউ তা করতে চাইলেও তিনি তাঁকে উৎসাহিত করেন নি। এ বিষয়টির সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা আবশ্যক। তরুণ নাজমুল করিম একদিন যা বিশ্বাস করেছেন, রাষ্ট্রীয়-সামাজিক জীবনের উত্থান-পতনে বিব্রত, বিত্রস্ত এবং শারীরিকভাবে পীড়িত প্রবীণ রাজমুল করিম তাকে স্বীকার এবং প্রচার করা হয়ত সম্ভব বা উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি। এ প্রবণতা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু প্রবীণ নাজমুল করিমের স্বীকার-অস্বীকারের উর্ধ্বে এ সকল রচনার একটি সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে। এসব রচনায় সেদিনের নাজমুল করিমের মুক্ত এবং অগ্রগামী চিন্তার আন্তরিক এবং দ্বিধাহীন প্রকাশের চিহ্ন রয়েছে।

তাঁর 'ভূগোল ও ভগবান' '৪৬ সালের রচনা। প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিকীতে।

ভগবান ভূগোল সৃষ্টি করার চাইতে ভূগোলই যে ভগবান তথা ধর্মকে সৃষ্টি করেছে, ধর্মের বিশ্বাস ও বৈচিত্র্য যে তার ভৌগোলিক এবং আর্থিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত, ধর্ম ব্যাপারটা যে অলৌকিক কোন ব্যাপার নয়, মানুষের বাঁচার লৌকিক প্রয়োজন থেকেই যে ধর্মের উদ্ভব এবং রূপান্তর : একথা সেদিনকার নাজমুল করিম যেরূপ আদর্শ স্পষ্টতা এবং প্রাঞ্জলতার সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন, তেমন স্পষ্টতা বয়স এবং বৈরী অবস্থায় পোড় খাওয়া প্রবীণ নাজমুল করিমের অপর কোনো রচনায় বিরল বলেই আমার মনে হয়। স্পষ্টতার কারণে সাহসেরও বটে। তাঁর সহপাঠী অধ্যাপক সৈয়দ হেসামুদ্দীন আহমদ কয়েকদিন পূর্বেও ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন : এই লেখার—গুরু-তাৎপর্য উদ্ধার করে সেদিনের রক্ষণশীল সমাজ নাজমুল করিমের মনে আতঙ্ক সৃষ্টিরও চেষ্টা করেছিল।

কেবল 'ভূগোল ও ভগবান' নয়। নাজমুল করিমের জীবনের এই সূচনাপর্বে এরূপ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনার আমরা সন্ধান পাই। আমাদের ফজলুল হক হলের ১৩৫১ তথা ১৯৪৪ সালের বার্ষিকীটির নামকরণ করেছিলাম আমরা 'কলাপী'। ... এই সংখ্যায় নাজমুল করিমের একটি রচনা প্রকাশিত হয়। লেখাটির নাম 'অবকাশ ও সভ্যতা'। নাজমুল করিম হয়ত তখন এম. এ. ক্লাসের শেষ পর্বের ছাত্র। এই লেখাটিতে তরুণ নাজমুল করিমের সমাজবাদ সমর্থনকারী মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। লেখাটিকে ৪০ বছর পরে আবার পাঠ করে আমার ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে, মানুষের যৌবনের সৃষ্টিই তার আবেগে, আন্তরিকতায় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নাজমুল করিমের প্রবীণ বয়স এই লেখাটির কথা তাঁর নিজের মুখে আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না। হয়ত লেখাটিকে জীবনের নানা টানাপোড়েনে এবং ঘটনা দুর্ঘটনায় পোড় খাওয়া অধ্যাপক নাজমুল করিম কিশোর কালের কাঁচা রচনা বলে গণ্য করেছেন। এক নিজের বলে আর গর্ব বা দাবী করেন নি হয়ত এমন আশংকায়, পাছে এই ডান-বামের টানাটানি আর দ্বন্দ্বের যুগে তাঁকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আজ যদি নাজমুল করিমের দীর্ঘদিনের শিক্ষাদানের দীক্ষায় দীক্ষিত তরুণরা তাঁর গবেষণামূলক অপর রচনায় মুগ্ধ হন, তবে তাঁদের যুবক নাজমুল করিমের এই রচনার কথাটিও জানতে হয়।

রবি গুহের কথা আমি উল্লেখ করেছি। '৪২-'৪৯ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র রবি গুহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে সেদিন বেশ পরিচিত ও জনপ্রিয় কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন। খুব সামাজিক, প্রাণময় এবং কমিউনিস্ট আদর্শে একনিষ্ঠ। নাজমুল করিমের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহপাঠী ছিলেন রবি গুহ। ঢাকারই সন্তান। বিক্রমপুরের। দেশ ভাগের পরিস্থিতিতে পরবর্তীতে তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে হয়। স্মারক গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক ড. রংগলাল সেন নিজের উদ্যোগে রবি গুহের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন

করে নাজমুল করিমের উপর নাতিদীর্ঘ একটি স্মৃতিচারণমূলক লেখা সংগ্রহ করেছেন। নাজমুল করিমের মূল্যায়নে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রবি গুহের এই লেখাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২ সনে নাজমুল করিম যখন বিদেশে অবস্থান করছিলেন তখনো তিনি বিদেশ থেকে বন্ধু রবি গুহের কাছে পত্রের মাধ্যমে দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নিজের মানসিক বেদনার কথা প্রকাশ করেছেন। রবি গুহ তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন—

... "অনার্স ক্লাসের ৫/৬ জন ছাত্রের মধ্যে আমিই একমাত্র হিন্দু। অন্তত আমাদের ক্লাসে, এই সম্প্রদায়িক মানসিক ব্যবধান দূর হল নাজমূলের উদ্যোগে ও চেষ্টায়। হরগঙ্গা কলেজের বন্ধু হেসামুদ্দীন আহমেদ ঢাকাতেও আমার সহপাঠী হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আরো কিছু বন্ধু জুটে গেল যাঁরা আমাদেরই মতো চিন্তাভাবনা করতেন। আমি এবং অমূল্য চন্দ, অজিত রায়, মদন বসাক, দেবপ্রসাদ মুখার্জী, নিতীন বসু, সুনীল রায়, অনিল বসাক প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে থেকেই সক্রিয় রাজনীতি করতাম। নাজমুল করিম অল্প দিনেই তা জানতে পেরেও ক্রমশঃই আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়। এক বছর বাদে সরদার ফজলুল করিম যখন ঢাকা বোর্ডে দ্বিতীয় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে নাজমুল করিমই আমাদের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্যদের মধ্যে সানাউল হক, এ, কে, এম আহসান, আহমদুল কবির, সৈয়দ নুরুদ্দীন, আবদুল মতীন, মুনীর চৌধুরী, মোহাম্মদ তোহা, মুজাফফর আহমদ প্রভৃতি অনেকে আমাদের ঘনিষ্ঠ হলেন। তখনো আমরা একটি ছোট গোষ্ঠী অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের জন্য কাজ করে চলেছি। পরবর্তীকালে তা আরো জোরদার হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করে। এসব কাজে নাজমুল করিমের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সকলের অগোচরে সে কাজ করেছে। কখনো সামনে আসে নি। সকলের কাছে অজানা থেকে এক বিরাট পরিবর্তনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তার কাজের ধরনই ছিল আলাদা। গায়ে ছাপ না লাগাবার প্রধান যুক্তি ছিল তখনকার পরিবেশে অনগ্রসর মুসলিম সমাজের একজন হয়ে ভেতর থেকে পরিবর্তনের কাজ সহজ করা। তার পরামর্শ মতো চলে ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক কাজ করতে পেরেছি। তার কাছে আমার ব্যক্তিগত ঋণের কথা ছেড়ে দিলেও, চল্লিশ দশকের ঢাকার প্রগতি আন্দোলনে তার অবদান ভোলার নয়। আমাদের ছাত্র জীবনে '৪২-এর আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, নোয়াখালী-বিহারের দাঙ্গা, পাকিস্তানের দাবী নিয়ে আন্দোলন ও তার বিরোধিতা এক জটিল পরিস্থির সৃষ্টি করে। এ সমস্ত বিষয়ে তার স্বচ্ছ চিন্তা-ভাবনা ছিল এবং কোনো না কোনোভাবে তখনকার সব আন্দোলনেই সক্রিয় ভূমিকা ছিল।" ... রবি গুহ তাঁর স্মৃতচারণের শেষে লিখেছেন : "অনেক সময়েই সে এক কৃত্রিম আচরণে নিজেকে ঢেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ... তাকে ভুল বুঝেছে অনেকে, এমনকি বন্ধুরাও ... আমাদের সময়ে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সূচনা হয়, তার ঐতিহাসিক রূপ আমরা দেখেছি। সমস্ত আপাত পরিচয়ের বাইরে এই গতিশীল যুগ পরিবর্তনে এক স্থপতি হিসেবেই তাঁর পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।" (স্মারক গ্রন্থ পৃ. ২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১)।

নাজমুল করিম সম্পর্কে আমার স্মৃতিচারণ কেবল আমার ও তাঁর যৌবনের স্মৃতিচারণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাজমুল করিম শিক্ষক হিসাবে যোগদানের পরবর্তীকালে তাঁর অবদান ও কার্যক্রমের পরিচয় তার ছাত্র এবং সহকর্মীবৃন্দ জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যৌবনের নাজমুল করিমের সঙ্গে পরিচিত জনের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ক্রমাধিক পরিমাণে সংখ্যাল্প হয়ে আসা মানুষের মধ্যে আমি এখনো জীবিত এবং পরবর্তীতে জীবিত থাকবো না বলেই একালের তরুণ-তরুণীর কাছে এই স্মৃতিচারণটি উপস্থিত করার কিছুটা দায়িত্ব আমি বোধ করেছি।

নাজমুল করিমের অবশ্যই তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিশেষ করে শেষের পর্যায়ে, বিদ্যমান সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে মনের দ্বন্দ্ব এবং টানাপোড়েন ছিল। কার না থাকে? এবং এমন দ্বন্দ্ব অবশ্যই জীবনের চিহ্ন। আমরা কেউ নিজের চরিত্রের দিকে তাকাই নে। আমরা প্রত্যেকে অপরের চরিত্রের মধ্যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ বা ইচ্ছার দ্বন্দ্বহীন চরম প্রকাশ দেখতে চাই। আমরা বলি : তার চরিত্রে যেমন 'হ্যাঁ, বলতে আমরা খুশি। না।' বলতে আমাদের আফসোস। আহা! সেই 'ভূগোল ও ভগবানের' নাজমুল করিমকে আমরা কোথায় পাই পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে 'পাকিস্তান এ্যান্ড এসলামিক এস্টেটের মধ্যে?' এ রকম উক্তি অবান্তর উক্তি। এমন উক্তি সমাজবিজ্ঞানীর যথার্থ উক্তি হতে পারে না। যেমন সমাজের জীবনে পর্যায় থেকে পর্যায়ান্তর তথা পরিবর্তন অমোঘ সত্য, তেমনি ব্যক্তির জীবনেও পর্যায় থেকে পর্যান্তার : পরিবর্তন। তরুণ, প্রবীণ এবং বৃদ্ধ : এক ব্যক্তি নয়। একই নামধারী হলেও। আমরা চাই তরুণ চিরদিন দেহ এবং মনে তরুণ থাকবে। চির তরুণ। আমরা চাই বিদ্রোহী চিরকাল বিদ্রোহী থাকবে। বিপ্লবী বিপ্লবী থাকবে। কিন্তু এমন আশা এবং উক্তি কল্পনা বিলাসীর আশা এবং উক্তি। শুধু যে তরুণ পরিবর্তনের মাধ্যমে যুবক এবং যুবক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রবীণ এবং প্রবীণ পরিবর্তনের মাধ্যমে বৃদ্ধ হয়, তাই নয়। বিপ্লবও বিপ্লবের পরে আর বিপ্লবী থাকে না। সে রক্ষণশীল হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এককালে স্বপ্ন দেখতাম রুশ বিপ্লব সর্বকাল বিপ্লবী থাকবে। যে বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী ১৯১৭ সালকে সংঘটিত করেছে তারা ১৯৩০-এও তেমনি বিদ্রোহী আর বিপ্লবী থাকবে। ১৯৪০-এর দশকে মার্কসবাদের পরিচয়ে আমরা যারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম তাদের সকলেই আজ প্রবীণ। যারা জীবিত আছেন তাঁদের অনেকের মুখে সোভিয়েত রাশিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাম্প্রতিক ঘটনাতে উদ্বেগের এবং হতাশার কথা শুনি। তারও কারণ, আমরা যে রোমান্টিকতা সেদিন পোষণ করতাম সেই রোমান্টিকতাকে অপরিবর্তিতভাবে আজো পোষণ করতে চাই।

কিন্তু এ যদি প্রবীণদের সমস্যা হয়, তবে আজকের তরুণদের কী সমস্যা? এর জবাব কেবল তরুণরা দিতে পারেন। আজকের যুবকরা বলতে পারেন। তাদের কাছ থকে সেই জবাব পাওয়ার জন্য আমরা প্রবীণরা আমাদের পর প্রজন্ম; তথা আমাদের সন্তান-সন্ততির দিকে তাকাই। মানসিক এই চাহিদা থেকেই ১৯৭২ সালে আমি প্রত্যাবর্তন করেছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। ১৯৪৮ সালে পলায়ন আর ১৯৭২-এ প্রত্যাবর্তন। ইতোমধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ঘর-বাড়ির, ছাত্র-ছাত্রীর, প্রক্টর-প্রভোস্ট, চ্যানেসলার, ভাইস-চ্যান্সেলরের কী বিপুল পরিবর্তন। সংখ্যার পরিবর্তন তো বটেই। সেদিনের হাজার থেকে আজকের হাজারে হাজারে। সেদিন যদি রমনার একটি আশ্রমে আমরা প্রবেশ করেছিলাম, আজ সে আশ্রম এক বিরাট কারখানায় রূপান্তরিত। এখন যথার্থই পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলছে এখানে : ডিগ্রিধারী মালের উৎপাদনে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীক এবং সামাজিক অবস্থা এমন যে এই কারখানার পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজ : প্রক্টর, প্রভোস্ট, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার, টিএসসি, ক্যাফেটরিয়া ইত্যাদি যত বাড়ছে, উৎপাদনের ওভারহেড খরচ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের মান এবং মূল্য বাজারে তত কমে যাচ্ছে। এটা আমার কোন হতাশামূলক উক্তি নয়। উৎপাদনের পরিমাণের বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য। যথার্থ প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন তো নগণ্য। তবু সেই নগণ্য উৎপাদনও বাজারে অতি উৎপাদনের সমস্যা সৃষ্টি করছে। এই সমস্যার মোকাবেলা এ কালের নতুন রোমান্টিক তরুণ এবং যুবকদের তো করতে হবে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে তার গুণের বৃদ্ধির কৌশলকে আয়ত্ত করতে হবে। চল্লিশের দশকের আশ্রমে আর আমার প্রত্যাবর্তনের উপায় নেই। প্রত্যাবর্তন প্রগতি নয়। পরিবর্তমান পৃথিবীতে, পরিবর্তমান বিশ্বে এবং পরিবর্তমান সমাজে প্রত্যাবর্তন বলে কোনো ঘটনা নেই। কেবল সামনে চলা : এগিয়ে চলা। আজকের সমাজবিজ্ঞানীকে কেবল পরিবর্তনকে স্বীকার করলেই চলবে না।

'ডাইনামিকস অব সোসাইটি' : ইংরেজি কথাটি সমাজবিজ্ঞানের নিশ্চয়ই একটি মৌলিক কথা। ডাইনামিকস : গতি! ডাইনামিকস অব সোসাইটি : সমাজের গতিময়তা। এর বিজ্ঞান। সামজের গতির বিজ্ঞান। 'চেঞ্জিং সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান, ব্যতীত নাজমুল করিমের অন্যতম গবেষণা গ্রন্থের নামও হচ্ছে 'দি ডাইনমিকস অব বাংলাদেশ সোসাইটি'। বস্তুত তাঁর পারিবারিক বিকাশের পরিচয়মূলক 'ফাল্গুন করা' থেকে 'ডাইনামিকস অব বাংলাদেশ সোসাইটি' পর্যন্ত সকল গ্রন্থ এবং রচনার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আমাদের সমাজ জীবনের পরিবর্তনকে অনুধাবনের চেষ্টা। কিন্তু এ অনুধাবন কেবল কি পরিবর্তনের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ? নাজমুল করিমের রচনার এই এক বৈশিষ্ট্য যে তিনি সমাজবিজ্ঞানকে কেবল 'পজিটিভ' তথা বর্ণনামুলক কিংবা 'ভ্যালুফ্রি' গবেষণা বলে মনে করেন নি। বিষয়টি জটিল : 'ভ্যালু ফ্রি' না 'ভ্যালুড' : পজিটিভ না নরমেটিভ : সমাজ বিজ্ঞানের এক মৌলিক বিতর্কের বিষয়। আমি তার মধ্যে

যেতে চাই নে। কিন্তু আমার মনে হয়, বর্তমানে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে ক্ষুদ্র এই পৃথিবী গ্রহে পরিবর্তনের যে অবিশ্বাস্য প্রবাহ চলছে : তার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তার মধ্যকার মানুষের পারস্পরিক পরিচয় এবং নৈকট্যে এবং ঘনিষ্ঠতায়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য : ইত্যাকার শব্দগুলির পুরাতন অর্থের বিলোপ এবং রূপান্তর (এ, কে নাজমুল করিমের একটি কন্যার স্বামী শুনেছি মার্কিন এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশের কুমিল্লার এ, কে, নাজমুল করিমের বেয়াই বাড়ি আমেরিকার আরিজোনা) : এই সব নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তনের প্রবাহের চাইতেও অধিক, পরিবর্তনের যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে তাতে সমাজ বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য তথা মানুষের সমাজকে মানুষের সীমাহীন বিকাশের শক্তিতে সমৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিকতার দ্বন্দ্বমূলক ঐক্যে আবদ্ধ এক মানবিক সমাজ তৈরির স্বপ্নকে বাস্তব করার দায়িত্বও সমাজ বিজ্ঞানীর বহন করতে হবে। কেবল বর্ণনা নয়। কেবল সংখ্যার চিত্র বা সারণি নয়। কী অর্থ এই পরিবর্তনের। সে কথাও আজকের সমাজবিজ্ঞানীর ভাবতে হবে। এ এক নতুন স্বপ্নের কথা। নতুন রোমান্টিকতার কথা। আমাদের সেকালের স্বপ্নের চাইতে অনেক বৃহৎ স্বপ্ন। বাংলাদেশ বিমানের বিজ্ঞাপনটি অর্থবহ : পৃথিবীটা ক্ষুদ্র হয়ে আসছে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হওয়ার অনিবার্য প্রক্রিয়ায় রত এই পৃথিবীর মানব সমাজকে ক্রমাধিক পরিমাণে মানবিক করার স্বপ্ন। কেবল ডাইনামিকস অব বাংলাদেশ সোসাইটি নয় : ডাইনামিকস অব ইন্ডিয়ান এশিয়ান বা আমেরিকান সোসাইটি নয়। ডাইনামিকস অব হিউম্যান সোসাইটি : পৃথিবী গ্রহের মানুষের সমাজের ডাইনামিকস। তথা গতিময়তা। এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা অবশ্যই আছে। নানা মাইক্রো স্টাডি। অণু অধ্যয়ন। উপাদানের অধ্যয়ন। কিন্তু সেই মাইক্রো যেন 'ম্যাক্রো' মানব সমাজকে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ ও মানবিক করার লক্ষ্য থেকে আমাকে ভ্রষ্ট না করে, সেই চেতনাকেও আমাদের জাগ্রত রাখতে হবে।

এ, কে নাজমুল করিমের রচনাতে কেবল মাইক্রোর বিশ্লেষণ নয়, ম্যাক্রোকে অনুধাবনের প্রয়াসও আমরা লক্ষ্য করি। সেদিক থেকে নাজমুল করিমের জীবন ও কর্মের, রচনার ও চিন্তার সমাজতাত্ত্বিক বিচার আমাদের বর্তমানকে অনুপ্রাণিত এবং উপকৃত করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

১৯৮৯

যাহা ইংলিশ, তাহা গ্রীক

অধ্যাপক রাজ্জাককে সামনে রেখে কথা বলা আমার পক্ষে মুশকিল। আমি অবশ্য পরিহাস করে স্যারকে বলি : 'স্যার, আপনিও বুড়ো হয়েছেন, দেখুন আমিও বুড়ো হয়েছি। এখন তো আমরা সমান!' কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তাঁর সমান হতে পারি নে। এ প্রায় পিতা-পুত্রের পার্থক্যের ব্যাপার। কিন্তু এ পার্থক্যকে কে আজকাল মানে? পুত্রই ধমক দেয় পিতাকে : 'তুমি কী জান? তুমি কী বুঝ? এ কাল তোমাদের সেকাল নয়।' কথাটা খুবই সত্য। এ কাল সেকাল নয়। এ কথা রাজ্জাক স্যারকে তাঁর পুত্র-কন্যাসম ছাত্র-ছাত্রী, ভাইবোন, ভাইঝিদের কজন বলে তা আমি জানি নে। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা রোজ আমাকে বলে। এবং তাদের সামনে কোনো কথা সাহসভরে বলতে আমি যথার্থই আতঙ্কিত হই। আতঙ্কটা অহেতুক নয়। আমার যে-ছেলে বা ছাত্রের হাতে ডাণ্ডা আছে তাকে ভয় না পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আহত এবং নিহত হওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতা এখনো আমার আসে নি। হয়ত আরো পরে আসবে। কিন্তু কথাটা কেবল এদিক থেকে নয়। কথাটা অন্যদিক থেকেও সত্য। আমার ছেলে বা ছাত্রের হাতে ডাণ্ডার আছে কিংবা নাই। তবু তাদের হাতেই তো বর্তমান এবং অধিকতরভাবে ভবিষ্যৎ। তারাই তো বানাচ্ছে বর্তমান। তারাই তো বানাবে ভবিষ্যৎ। কাজেই কেবল ভয় নয়। অনিবার্যভাবে তাদের উপর ভরসাও আমাদের রাখতে হবে।

কোনো অহঙ্কার নয়। কেবল দায়িত্ববোধ থেকেই প্রায় ছ বছর আগে এই কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম। এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস্'-এর বাঙলা অনুবাদের কাজে। দায়িত্ব বোধ করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করতে এসে। অবোধ, নির্বোধ যাই বলি, আমাদেরই ছেলেমেয়েরা তো ক্লাসে আমাদের সামনে এসে বসে। দু কথা শুনতে চায়। জ্ঞানের কথা। মানুষের ইতিহাসের কথা। সমাজের বিবর্তনের কথা। কিন্তু সে কথা তো ভাষায় লেখা। হয় গ্রীকে, নয় রাশিয়ানে, নয় ইংরেজিতে। বাংলাতে খুবই কম। যাদের সামনে কথা বলি, আমার অল্প জ্ঞানের

অহমিকা নিয়ে তাদের যেই ধমক দিতে যাই : পড়েছ এ্যারিস্টটল, পড়েছ প্লেটো, পড়েছ অগাস্টিন, এ্রাকুইনাস, ম্যাকিয়াভেলী, হবস, লক, রুশো? তখনি তারা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে আমার দিকে। সে চাহনির জবাব এই যে : কেমন করে আমরা পড়ব? এ সব তো ইংরেজিতে লিখিত। আর আমরা ইংরেজি যে একেবারেই বুঝি নে।' তখন চেতনা আসে : যথার্থই এ ধমক দেওয়ার আমাদের অধিকার নেই। শতের মধ্যে পাঁচটি যে ইংরেজি বুঝে না, তা নয়। কিন্তু শতের পঁচানব্বই জনই বুঝে না। তাদের যদি আমি যথার্থই সাহায্য করতে চাই, যদি তাদের ধমক দিতে চাই, কেন তারা পড়ে না, তবে আগে বাংলাতে তাদের পঠনীয় সব মালমশলাকে আমাদের হাজির করতে হবে। তা না হলে অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের, ইংরেজি কেন পড় না, ইংরেজি কেন বুঝ না বলে ধমকানো, গ্রীক কেন পড় না, গ্রীক কেন বুঝ না বলে ধমকানোরই সামিল। আমাদের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেই যাহা ইংলিশ, তাহা গ্রীক। কিন্তু এ কথাটায় অস্বাভাবিকতা বা লজ্জার কিছু নেই। বেশিরভাগ জাপানি ছেলেমেয়েদের কাছেও যাহা ইংলিশ, জার্মান বা ফ্রেঞ্চও তাহা গ্রীক। মোট কথা সকল দেশের ছেলেমেয়েদেরই জ্ঞানের সঙ্গে যা কিছু স্বাভাবিক পরিচয় ঘটে, তা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই ঘটে। দিন রাত যার চর্চার হয় তা মাতৃভাষারই চর্চা। এর অর্থ এই নয় যে, জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে অপর ভাষা সমূহের চর্চা হয় না, হবে না। কিন্তু মাতৃভাষাই ভিত্তি। মাতৃভাষার উপর দাঁড়িয়েই অপর সব ভাষার চর্চা।

কথাটা ছোট করি। এই বোধ থেকেই আমরা। সিরাজুল ইসরাম চৌধুরী, নূর মোহাম্মদ মিঞা, আমিনুল ইসলাম এবং অন্যান্যরা ইংরেজি ভাষা থেকে কিছু চিরায়ত সৃষ্টি ও সাহিত্যকে বাংলা ভাষায় নিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের কাছে হাজির করার চেষ্টা করেছি।

সেই চেষ্টারই অংশ এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস্'-এর বাংলা অনুবাদ। এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস'-এর প্রয়োজনীয়তা, তার প্রাসঙ্গিকতা, বিশেষ করে বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় : এ সবের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

আমার অনুবাদ আদৌ এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস'-এর উপযুক্ত অনুবাদ নয়। আমার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা যে কতো, তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আসলে এ রকম কাজে আদৌ আমি হাত দিতাম না যদি না অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের শুরু থেকেই কেবল ধমক দিয়ে বলতেন : 'বেহুদা ক্যান্ লেখা পড়া করছেন? বাপমায়ের টাকা-পয়সা এভাবে নষ্ট করার কি হকটা আছে? যদি এ টাকার ঋণ কিছু শোধ করতে চান, তবে যা একটু 'জানছেন-টানছেন' তা বাংলায় দেন। বাংলায় পেশ করেন। আপনার বাবা তো আপনার ইংরেজি পইড়া বুঝবো না, পোলা তার কত জিনিস জানছে, আর সে জিনিসে তার কত উপকার হইতেছে আর হইবো!'

এ ধমকের কোনো জবাব নেই। এ ধমকের দাবিতেই বাংলাতে কিছু প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই চেষ্টার ইতিবৃত্তও আজ দেওয়ার জন্য এ আলোচনার আয়োজন নয়।

এই বাংলায় প্রকাশের চেষ্টারই একটি নমুনা হিসাবে কয়েদিন পূর্বে অধ্যাপক রাজ্জাককে 'এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস'-এর মুদ্রিত ফাইল কপি দিয়ে বলল :

'স্যার, একটু দেখবেন। ভালোমন্দ যাই হোক, এটি যে প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্য এবং তা জানাবার জন্যই একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এবং তাতে এই বেয়াড়া সময়, বিকেল চারটাতে, আপনাকে হাজির থাকতে হবে।' আমাদের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা যে তিনি সহাস্যে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলেছেন : 'থাকমু। কেবল মনে কইরা একটু নিয়া যাইবেন।'

কিন্তু যে কথাটা বলার জন্য অধ্যাপক রাজ্জাকের কথা বলছি সে এই যে দ্বিতীয় দিন যখন দেখা করেছি এই বই প্রসঙ্গে, তখন তিনি সানন্দে বলেছেন : 'সরদার, আপনার অনুবাদের ভূকিকাটা আমি পড়েছি। তবে আমি হলে, ব্যাপারটার মধ্যে আর একটু লজিক্যালিটি আনার চেষ্টা করতাম এবং সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের মূল যে অবদান, মেথোডলজি তথা কোনো বিষয়কে আমি কোন উপায়ে বুঝার চেষ্টা করব, কোনটা যথার্থই বৈজ্ঞানিক উপায় হবে, তার উপরই আমি অধিক জোর দিতাম।' অধ্যাপক রাজ্জাকের এ মূল্যায়নটি যথার্থ। এ মূল্যায়নে আমরা সবাই উপকৃত বোধ করব। কিন্তু রাজ্জাক স্যার এর পরে যে ধমকটি দিয়েছেন সেটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর পরের বাক্যটি এরূপ : 'আপনারা এগুলো কী লেখেন? কাদের জন্য লেখেন? একি বাংলা হয়? তারা কি এগুলো বুঝে?' তাঁর এ বাক্যের সামনে ডবল জিজ্ঞাসার চিহ্ন। এই প্রসঙ্গেই তিনি মহর্ষী হরপ্রসাদ সেন শাস্ত্রীর রচনার অনবদ্য রীতি এবং ভঙ্গী এবং তাঁর অতুলনীয় সাধনার উল্লেখ করেছেন।

ভাষার প্রশ্নে অধ্যাপক রাজ্জাকের এই সমালোচনা যথার্থ। স্যার এই প্রসঙ্গে আমাকে আরো বলেছিলেন : 'অনুবাদ তো একবার করার জিনিস নয়। একবার খসড়া করেন। আবার তারে দেখেন। আবার তারে পুনর্গঠন করেন। আবার লেখেন। দেখেন, আপনার লেখা কতখানি বাংলা করতে পারলেন।'

খুবই সঠিক কথা। অবশ্য আমরা যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে বাস করছি, বর্বরতার যে সর্বগ্রাসী যান্ত্রিক এবং অমিত পরাক্রমশালী চর্চা, বলা চলে আক্রমণ হচ্ছে তাতে আমরা যত অক্ষমভাবেই হোক না কেন, বাংলা ভাষার বা বাংলা লেখার যে চর্চা করছি তাতে তারা বোধহয় একেবারেই অপঠিত থেকে যাচ্ছে। আমরা লিখি বটে, কিন্তু কেউ তা পাঠ করে না। অন্তত আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ করে না। তারা পাঠ করে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নোট। বই তারা পড়ে না। তবু কেউ কি পড়ে না? তাও সত্য নয়। কেউ কেউ যে পড়ে, হয়ত হঠাৎ পড়ে

না। কিংবা ভবিষ্যতে পড়বে : তারও উৎসাহজনক সাক্ষাৎ পথে ঘাটে এবং অন্যত্র আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিতভাবে না পেলে এমন কাজে আদৌ হাত দিতে পারতাম না।

কিন্তু এ কথা সত্য যে আমাদের দেশে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা ব্যবধান রয়ে যাচ্ছে। লেখক নিজের রচনাতে নিজে তৃপ্ত। সে জানে না কে তাকে পাঠ করছে। তার পাঠকের কী সমালোচনা। কী বক্তব্য। আরো সঠিকভাবে বললে আমাদের মধ্যে, তথা শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে চলছে বাস্তব জীবন এবং জনসাধারণের জীবন এবং ভাষা থেকে ক্রম বিচ্ছিন্নতার এক প্রক্রিয়া। এবং এ জন্যই জীবনের সর্বদিকে ব্যবধান, বিচ্ছেদ, অবোধ্যতা এবং অবাধ্যতা তথা বিরোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু অধ্যাপক রাজ্জাক যে দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ লেখক হিসাবে আমার যদি কেউ উদ্দিষ্ট থাকে, যদি কেউ থাকে যার কাছে আমার প্রকাশকে আমি পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে যে কোন প্রকাশেই আমাদের সন্তুষ্ট হলে চলবে না। আমার উদ্দিষ্টের অন্তরকে আমি কেমন করে স্পর্শ করতে পারব, কেমন করে অধিকতরভাবে তাকে আলোড়িত করতে পারব, তার নিরন্তর সাধনাকে আমার প্রকাশের অংশ হতে হবে। তাঁর এমন ইঙ্গিতের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি।

একদিক থেকে দেখলে আমাদের অবস্থা যথার্থই মর্মান্তিক। আমরাই যে কেবল অসহায়, তাই নয়। আমাদের শব্দকুলও অসহায়। দয়া, মায়া, ন্যায়, কর্তব্য, দায়িত্ব, দেশপ্রেম, আইন, সংবিধান : এরা তো অস্ত্র সজ্জিত কোন বাহিনী নয় যে যে যার অর্থের যথার্থতা সশস্ত্র ক্ষমতায় রক্ষা করবে। তাই শুধু যে পাঠকরা লেখকদের ভাষা বুঝে না, তাই নয়। আমরা নিজেরাও পরস্পরের ভাষা বুঝি না। আমরা যা বলি তা বুঝাই না। যা বুঝাই তা বলি না। আমাদের দয়ার অর্থ নির্মমতা, মায়ার অর্থ মৃত্যু, কর্তব্যের অর্থ নসিহত, গণতন্ত্রের অর্থ স্বৈরতন্ত্র, আইনের শাসনের অর্থ হুকুমের শাসন ...। মোটকথা যেমন রাষ্ট্র-জীবন, তেমনি ভাষা জীবন। উভয় জগতে এক নৈরাজ্যিক অবস্থা। হতাশার অবস্থা।

১২.০৬.৮৩

জহুর ভাই-এর ভাষায় 'জহুর হোসেন চৌধুরী'

"১৯২২ সালের ২৭ জুন সুবেহ সাদেকের অনেক আগে অন্ধকার থাকতেই হোসেন মামুর দরাজ গলার আজানের আওয়াজে আশে-পাশের বাড়ির অনেকের ঘুম ভেঙে গেল। অসময়ে এই আওয়াজের অর্থ সকলেই বুঝলেন—খানবাহাদুর সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ মোহসেনা খাতুনের একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। নবজাত বাচ্চাটি দেখতে আহামরি নয় বললে বেশ একটু কম বলা হয়। শকল্-সুরতের কথা ছেড়ে দিলেও, প্রথম যাঁরাই বাচ্চাটিকে দেখলেন, তাঁদের মনেই প্রার্থনাবাণী স্বগতোচ্চারিত হল, 'আহা, খোদা যেন একে হায়াৎ দেন।' দোয়াটি মামুলি ছিল না। বাচ্চাটির শরীর এমন প্যাঁকাটির মতো ছিল যে এই দীর্ঘজীবন কামনার খাস প্রয়োজন ছিল। শ্রীমানের শরীর যত দুর্বল হোক না কেন অবিশ্রান্ত চীৎকারে সে প্রমাণ করছিল যে গলার আওয়াজ ও জিহ্বার ধারে সে শারীরিক দৌর্বল্যটা সুদে-আসলে পুষিয়ে নিয়েছে। সে যুগের মানুষ খোদাকে ভয় করতেন, গোনাহকে সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। এ কারণেই বোধহয় রহমানুর রাহিম আল্লাহতায়ালা বাচ্চাটির শুভাকাঙ্ক্ষীদের আরজ শুনেছিলেন। অন্তত অর্ধডজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার বেশ কয়েকবার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে আজরাইলের সমন সমাগত।

"ডাক্তারি শাস্ত্রটি যে এখনও নেহাতই অপরিপক্ব এ তথ্যটি প্রমাণ করে মুরুব্বীদের দোয়ার বরকতে এবং আল্লাহর রহমতে আমার বয়স আজ তিপ্পান্ন বছর তিন মাস। আব্বা-আম্মা, নানা নানী এঁদের মধ্যে কে আমার নাম জহুর হোসেন রেখেছিলেন জানি না। আমাকে নিয়ে রসিকতা করার কোনো ইচ্ছা তাদের ছিল একথা আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু বাংলা অর্থ করলে 'জহুর হোসেন' শব্দ দুটির অর্থ দাঁড়ায়, সৌন্দর্যকে যে জাহির করে। সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক আছে এমন বদনাম আমার জন্ম-দুশমনও দিতে পারে না। কিন্তু আমার নামে যে বেরসিকতা ফুটে উঠেছে আমার চরিত্রে তার ছাপ

গভীরভাবে পড়েছে, এ কথা আমাকে জানবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। কেউ যদি মনে করেন আমার আত্মজীবনী তাঁদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি, ভুল করবেন। ...

"... মালেক উকিল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাইসাব বালা আছেন ত? আইচ্ছা বাইসাব কতা নাই বার্তা নাই আঁন্নে কেন্নে আৎকা হোম মিনিস্টারিত্তুন স্পীকার অই গেলেনগই?" এর কিছুদিন পূর্বে জনাব আবদুল মালেক উকিল বিনা নোটিশে হোম মিনিস্টারের পদ ছেড়ে স্পীকার হয়ে যান। মালেক উকিল সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, "খোদা যা করেন বালার লাইই করেন। স্পীকার অই বড় আরামে আছি বাই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কামের ঝঞ্ঝাটে হায়াত কমি যাইতে আছিল। মাইনষেও বদদোয়া দেয় না, বরং অল্পবিস্তর ইজ্জতই করে।"

"মালেক উকিল সাহেব জানতেন না তাঁর সেদিনকার কথার কথাগুলো কীরূপ নিদারুণভাবে সত্য বলে প্রমানিত হবে। উকিল সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আমনের বয়স কত?" বললাম, "ফরায় তিপ্পান্ন বছর।"—"ও আল্লাহ। এই বয়সেই চেহারা সুরত এইক্কা হইছে কা?" জবাব দিলাম, "বাইসাব বয়সের ত কোনো দোষ নাই। বিলাতে ত ইয়া জোয়ান বয়সে দ্যান না চার্লি চ্যাপলিন আশি বছর বয়সে আরেক গা বিয়া কইচ্ছে যে ক বছর অইগেল। মাশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে অনত চরিবরি খায়। আর গ্রীসের অমুকের বাই ওনাসিস ত ফরায় বায়াত্তুর বছর বয়সে আঙ্গো আমেরিকার মরহুম কেনেডি সাবের বিধবা জ্যাকিরে এইত ক বছর আগে বিয়া কইরলেন। (ওয়াসিস হালে মারা গেছেন)। আর জ্যাকিরে চোখ্যে না দেইখলে কি হইব ফটোতে দেইখছেন তো। ..." (ছাপার অক্ষরে চলে না)।

একটু বিব্রত বোধ করে উকিল সাহেব বললেন, "তোবা তোবা! আন্নের মুখের কোনো আড় নাই। অবশ্য আন্নের জিহ্বার কতা কে না জানে। আই জিজ্ঞাইলাম এতে অলফ বয়সে চেহারা এই রকম খারাব অই গেছে কিল্লাই, আর আন্নে শুরু করলেন কোন আনের চার্লি চ্যাপলিন, ওনাসিস আর জ্যাকি কেনেডির বয়ান।"

আমি বললাম, "বাইসাব, ফাঁচকান কতা গুছাই কইতাম ও লেইখতাম ফাইরলাম নাহারা জীবনে। আঁর জিহ্বার কথা কইতেছেন। বিয়ার আগে আঁর বেগমসাব এক গণৎকারের কাছে গেছিলেন। বেডা 'অমকের' হুত গণকা হেতাইনের হাত দেখি এককরে বিদ্যাসাগরী বাংলায় কইছিল, "স্বামী বর্বরতা দোষে দুষ্ট হইবেন।' রবীন্দ্রনাথের পরশপাথর কবিতার ক্ষ্যাপার মতো আঁই গত বিশ বছর ধরি গণৎকারে খুঁজি বেড়াইয়ের। অনত্র হইত্যেক দিন তার কথা মনে অয়। 'অমুকে'র হুতের দেয়া ফাইলে বেডারে জিজ্ঞাইতাম, 'ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ। এ দেশের ভবিষ্যৎটা কী?' তবে চার্লি চ্যাপলিনের বয়ান আন্নেরে কইলাম, হেইটার লগে আর অকাল বার্ধক্যের সম্পর্ক আছে।"

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যামনে"। আমি বলে চললাম, "চব্বিশ বছর পাকিস্তানে আর তিন বছর বাংলাদেশে থাকি চেহারাটা না এই রকম অইছে, খোদার মেহেরবাণীতে অনঅ ত কবরে যাই ন। আন্নেরও বয়স আর কতো অইব। কিন্তু আয়নার দিকে মাসে দুমাসেও একবার দেখেন তো? আঙ্গো মতো এতদিন পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে থাইকলে জ্যাকি বিবি সাহেবের চেহারায়ও এই জেল্লাই থাইকত ন" ... দরবার-ই-জহুর।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

* * *

আসলে এই লেখাটির নাম দেওয়া উচিত 'একতা'র লেখা। 'একতা'য় আমার এক ভক্ত ছিল, মোজাম্মেল হোসেন। তিনি আমায় পরিত্যাগ করেছেন, বুঝতে পারি। বহুদিন, 'আরে মোজাম্মেল কেমন আছেন?' এই সম্বোধন করতে পারি নি এবং তার জবাবে, 'স্যার, আপনার কথা মনে করছিলাম, এই জবাবও প্রায় এক বছর যাবৎ না পেয়ে। এটাই স্বাভাবিক। বর্জ্য পদার্থ যত শীঘ্র পরিত্যক্ত হয়, তত অগ্রগামী সাথীদের মাথার বোঝা আর মনের সংকোচ হাল্কা হয়। আর এক বন্ধু অজয়। অজয় রায়। বামপন্থী রাজনৈতিক মহলের পরিচিত নেতা এবং ব্যক্তিত্ব। আমার জেলখানার বন্ধু। সেই কবে চল্লিশের দশকে সাক্ষাৎ ঘটেছিল মুন্সীগঞ্জে। অজয়েরও গলা শুনি নি আমার বাসার মরচে ধরা ফোনে, এক বছরেরও অধিক। সে হয়ত অজয়ের দোষ নয়। আমার ফোনের বার্ধক্য। কিন্তু হঠাৎ সেই ফোনে সেদিন অজয়ের গলা বেজে উঠল। আমার আর জিজ্ঞেস করতে হল না, কে বলছেন। কারণ, অজয়ের গলা আমি চিনি। অজয় বেশি লম্বা করে কথা বলেন না। কাটা কাটা কথা। সোজাসুজি বলেন। অজয় বলল ('বললেন' শব্দটা বাদ দিলাম। তা না হলে অজয় রাগ করবে।) সরদার ভাই, জহুর ভাই এর উপর 'একতা'র জন্য একটা লেখা দিতে হবে। আগামী দুদিনের মধ্যে।

অজয়ের হুকুমের একটা অধিকার আছে। সে অধিকার যতো বলিরেখায়ই রেখাঙ্কিত হোক না কেন, তবু এখনো সে বেঁচে আছে এবং তার বয়স, মানে অধিকারের বয়স, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তার ফোনের জবাবে আমিও আর অধিক কিছু বলতে পারলাম না।

হুকুম মানার চেষ্টা করে আমাকে দেখাতে হবে যে, হুকুম মানার ক্ষেত্রে আমি কত ব্যর্থ। কারণ আমি 'লেখক' এই এই কথাটা কোনোদিন বিশ্বাসের মধ্যে আনতে পারি নি। আনতে পারলে লেখায় একটু আত্মবিশ্বাসের ভাব আসত। তবু অজয়দের হুকুমে কথা বলতে হয়েছে। আর সেই আত্মকথাকে তারা প্রয়োজনবোধে 'লেখা' নাম দিয়ে তাদের কাগজের ফাঁকা কলামকে ভরাট করে দায় সেরেছে।

কিন্তু লেখার কথাই যদি বলি তাহলে জহুর ভাইএর উপর লেখার মতো কঠিন এবং অসম্ভব দায়িত্ব আমি আজ পর্যন্ত পাই নি এবং পালন করি নি। এখন কী করি? দ্বিতীয় দিনে অজয় ফোন করতে বললাম, জহুর ভাইএর 'দরবার-ই-জহুর' বইখানা পাঠিয়ে দিতে। আমার কপি কোথায় আছে, খুঁজে পাচ্ছি নে। দেখি 'দরবার-ই-জহুর' পাঠ করে কিছু দাঁড় করাতে পারি কিনা।

সেই চিন্তা নিয়ে নিজের কাঁধের ব্যাগের মধ্যে 'দরবার-ই-জহুরকে' নিয়ে কেবল রাস্তায় ঘুরছি আর ভাবছি কী করি? কী করি?

আমরা আজকাল খুব যুগের হিসাব করি। দশকের যুগ। অর্ধ শতকের যুগ। শতকের যুগ। ১৯৪০ থেকে '৫০ পেরুলেই বলি এক যুগ পার হল। তখন থেকে বলি চল্লিশের দশকের যুগের এই ছিল বৈশিষ্ট্য। ঐ ছিল ধারা। উপধারা।

আসলে সময় তো যুগকে নির্দিষ্ট করে না। সময় তো একটা কাল্পনিক অঙ্ক। সংখ্যা। তার হাত, পা, মন নাই। বাস্তবিক হচ্ছে মানুষ। বাস্তবিক হচ্ছে ব্যক্তি।

বাস্তবিক ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী। বাস্তবিক ছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। বাস্তবিক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। মুরব্বী আকরাম খানের কথা তোলার দরকার নাই। তাঁর দরবারে আমি কখনো বসার সাহস ও সুযোগ পাই নি। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবেরও নয়। তাঁদের সম্পর্কে নানা লেখকের স্মৃতিচারণ আর মূল্যায়নের অভাব নেই। সেগুলো সুযোগ ও প্রয়োজনমত আমরা পাঠ করতে পারব। এবং আমরা পাঠ করি।

মানিক মিয়ার কথা স্মরণে এলে যেমন তাঁর 'রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ'-এর কথা স্মরণ হয়। তেমনি তার নতুন ভবনের কথা নয়। স্মরণ হয় হাটখোলার সেই সেকালের পুরোন একটি বাড়ির কথা। সেখানে তিনি বসতেন। কেমন করে যে অত অল্প জায়গায় অমন জোরালো 'রঙ্গমঞ্চ' আর তার মুখপত্র 'ইত্তেফাক' বেরুত সে আজো আমার কল্পনার বাইরে। মানিক মিয়ার কথাও থাক।

আমি ভাবছি জহুর ভাই এর কথা। এই ভাবতেই চমকে উঠলাম, আমাদের হৃদয়ের আত্মীয় যারা, মা-বাবা, ভাই-বোন, একান্ত সুহৃদয় যাদের আলো-হাওয়া সর্বক্ষণ গায়ে জড়িয়ে আমরা বেঁচে থাকি, তাদের কথা কম স্মৃতিই না আমাদের মনে থাকে। তাঁরা যখন থাকেন না তখন আলো আর বাতাস না থাকার মতো অবস্থায় প্রাণটা আইতাই করে ওঠে। কিন্তু ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে পারি নে : বাবা আমাকে অমুক দিন বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। মা আমাকে শুকনো মরিচ পুড়িয়ে পান্তা ভাত মেখে খাইয়ে দিয়ে বলেছিলেন, খা, খেয়ে দেখ, ভালো লাগবে। জহুর ভাই বলেছিলেন, আরে আপনি এসেছেন। ওর কে আছিস, মিষ্টি আর সিঙ্গাড়া নিয়ে আয়। যদি এ বাক্য বলে থাকেন তবে সে তার ছেদহীন পূর্ব শব্দ স্রোতের মধ্যে সেকেন্ডের মাত্র বিরাম এবং সে বিরামের পরে পুনরায় সেই অবারিত শব্দের উচ্চারণের, দৃষ্টান্তের, কণ্ঠের শব্দধারার অনিবার প্রবাহ। বলার শব্দে গলার

হাঁপানির টান আছে। হাতে পায়ে একজিমার চিহ্ন আছে। কিন্তু শব্দের স্রোতের বিরাম নেই।

হ্যাঁ, এই স্মৃতি কিছু আমার মাথায় আছে। কোন ঘটনার নয়। স্মৃতির পলি। একনাগাড়ে '৪৯ থেকে '৫৫ সাল পর্যন্ত রাজবন্দী হিসাবে আটক থেকে জেল থেকে বেরিয়ে এসে বংশালের 'সংবাদ'-এর পুরোন সেই দালানের নিচের তলার দক্ষিণ দিকের ঘরে প্রায় চব্বিশঘণ্টা বহমান সেই শব্দের স্রোতে যে সামিল হয়েছিলাম, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শব্দ আর সস্নেহ আকর্ষণে জেলখানা থেকে বেরিয়ে অপর কোন আত্মীয়ের আবাস খোঁজ করতে হয় নি। সোজা বংশালের 'সংবাদ'-এ এসে 'দরবার-ই জহুর'-এ শরীক হয়েছিলাম। জহুর ভাইকে মনে করতে গেলে 'সংবাদ'-এর ঐ পুরোন বাড়ি ছাড়া অপর কোথাও আমি তাঁকে বসাতে পারি নে।

জহুর ভাইএর আযৌবন বন্ধু ছিলেন অধ্যাপক সালাহ্ উদ্দীন আহমদ। কিছুদিন আগে তিনি 'জহুর হোসেন চৌধুরী এবং সেই সময়'—এরূপ শিরোনামে সুন্দর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া জহুর ভাই সম্পর্কে আর কেউ কিছু লিখেছেন কিনা, আমি জানি নে।

যাঁরা লেখেন নি তাদের আমি দোষ দিই নে। সন তারিখ এবং কর্ম বিবরণী দিয়ে জহুর ভাই এর জীবনী লেখা যায়। কিন্তু জহুর ভাইকে লেখা যায় না। জহুর ভাইকে জহুর ভাইও লিখতে পারতেন না। তাই তিনি কেবল বলতেন। 'দরবার-ই-জহুর' : এরূপ নাম দেওয়ার হক বাংলাদেশে কেবল জহুর ভাইএরই ছিল। তাঁর দরবারে জহুর ভাই তাঁর সময়কে, বলতেন ঘটনাকে বলতেন, অপর চরিত্রকে উদঘাটন করতেন, নিজেকে নিয়ে পরিহাস করতেন। আর তাঁর সে বলাকে কেবল অতুলনীয় বললে কিছু বলা হয় না। অনন্য বললেও নয়। জহুর ভাইএর বলা কথা শুনতে হয়। আর কী আফসোস, সে কথা 'ইররিপ্রোডিউসিব্‌ল। কথাটা ইংরেজি অক্ষরে লিখলে ভালো হত। এর কী বাংলা করা যায়? 'অপুনরুদ্ধারণীয়? যাকে পুনরুদ্ধার করা যায় না? এ শব্দ বাংলা অভিধানে নিশ্চয়ই নেই। ইংরেজিতেও 'ইররিপ্রোডিউসিবল্' আছে কিনা দেখার জন্য ৪ তারিখ শুক্রবার যখন কাঁধের ব্যাগে জহুর ভাইকে নিয়ে বাসা থেকে রাস্তায় বেরুলাম তখন ফুটপাতে নজর পড়ল, 'লংম্যানস ডিকশনারী অব কনটেমপোরারী ইংলিশ।' দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই কত নিবেন? আমি আশঙ্কা করেছিলাম, নিশ্চয়ই ৫/৬ শ' চাইবে। দেখতে সত্যি সুন্দর প্রকাশনা। নতুন। বিরাটাকারের। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩০০-র অধিক। ইন্ডিয়া থেকে লংম্যানের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে মুদ্রিত। দোকানীকে বললাম, ভাই কত? দোকানী বলল, স্যার নিবেন? আমি বললাম, দেখি না, টাকায় কুলালে নেবার ইচ্ছা তো আছে। দোকানী বলল : ১৫০/- টাকা লাগবে। আমি দরাদরি করে আরো পাঁচ টাকা কমিয়ে ১৪৫/- টাকায় লংম্যানের ডিকশনারী

কিনলাম। দেখি 'ইররিপ্রোডিউসিবল্' আছে কিনা। আসলে বেরিয়েছিলাম, রাস্তা থেকে সেকেন্ডহ্যান্ড একটা সোয়েটার কিনতে। শীত বেশ পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু কী ভাগ্যবান। সেকেন্ডহ্যান্ড সোয়েটারের বদলে নতুন 'লংম্যানস ডিকশনারী অব কনটেমপোরারী ইংলিশ!'

মনটা বেশ ভালো লাগল। ইউনিভার্সিটির ঘরে এসে খোঁজ করলাম। না, সে শব্দ নেই। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। জহুর ভাইএর কণ্ঠ যে 'ইররিপ্রোডিউসিব্‌ল্', অপুনরুদ্ধারণীয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যাঁরা সেই কণ্ঠের শ্লীল, অশ্লীল, নোয়াখালী-চিটাগাং-এর শব্দাবলী এবং তার উচ্চারণ শোনেন নাই, তাঁরা তাকে আর কোনোদিন শুনতে পাবেন না। জহুর ভাই-এর সে কণ্ঠকে আর শোনানো যাবে না। সেটাই আমাদের জাতীয় আফসোস। এবং আমার সে সামান্য একটু ভাগ্য ঘটেছিল সেই কণ্ঠ শ্রবণের, তাতেই আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে গণ্য করছি। ...

০৫.১২.৯২

অজিতদা'র 'বুলু'

আমি ভাবছি, অজিতদা'র 'বুলু' গল্পটি আমি আর পড়বো না। মাত্র তিন পৃষ্ঠার গল্প। কিন্তু যতবারই পড়ি, ততবারই আমার চোখের পাতা ভিজে ওঠে। নিঃশব্দে পড়লেও গলা ধরে আসে। শরীর কেঁপে ওঠে। এর একটা কারণ হয়ত এই যে আমার এখন বয়স হয়েছে। পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেছে।

অজিতদা আমার চাইতে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। জন্মেছিলেন ১৯১৪-তে মারা যান আকস্মিকভাবে ১৯৬৯-এর নভেম্বর মাসে। তাঁর 'বুলু' গল্পটি আমি আগেও পড়েছি। এবার পড়লাম অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় সম্প্রতি প্রকাশিত 'অজিত গুহ স্মারক গ্রন্থখানিতে। এই গ্রন্থে অজিতদার অন্যান্য কয়েকটি নাতিদীর্ঘ রচনার সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে 'বুলু'ও। এখানেও গল্পের শেষে রচনার তারিখটি উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু গল্পের ঘটনার বিবরণে বুঝতে পারা যায়, এ গল্পটি '৬৯-এর গণআন্দোলনের মধ্যেই রচিত। এবং হয়ত অজিতদার এটিই শেষ রচনা। ৬৯-এর গণআন্দোলনের জন্য উৎসর্গিত। কি অতুলনীয় এবং অনুপ্রেরণাদায়ক এ উৎসর্গ।

অজিতদা আজ '৯১-তে বেঁচে থাকলে হয়ত ৭৬ কিংবা ৭৭ বছর তাঁর বয়স হত। এখনো তাঁর স্মৃতি থাকত। তাঁর চেতনা থাকত। তাই যদি হত, তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি তাঁর কাছে তাঁর বুলুর কথা আরো বিস্তারিত জানতে চাইতাম। বুলুল কথা। তার বাবা দিনাজপুর জেলের ডাক্তার শাহেদ সাহেবের কথা।

'বুলু' কি একটি গল্পের নাম? গল্প আমরা কাকে বলি? ঘটনার চাইতে কল্পনার মিশেল থাকে যেখানে বেশি, তাই গল্প। কিন্তু বাঙালির জীবনের ইতিহাসের এই এক বিস্ময়কর সত্য যে এ জীবনে কল্পনার চাইতে অধিক বিস্ময়কর সব ঘটনা ঘটেছে। কবি বা গল্পকারের কল্পনার অধিক।

বুলুও অজিতদার কোনো কল্পনার সৃষ্টি নয়। আর বাঙালির জীবনের সুখ-দুঃখের আমরণ সাথী অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ কোন গল্পকার ছিলেন না। তিনি ছিলেন দেশের আপামর জনতার সংগ্রামী জীবনের অবিস্মরণীয় এক পরিব্রাজক। পথিক। কিন্তু নিস্পৃহ দর্শক নয়। মানুষের নিত্যদিনের সকল ক্রান্তি মুহূর্তের সচেতন সংগ্রামী, দূর দৃষ্টিক্ষেপণকারী এক মহৎ ব্যক্তিত্ব। এমন মানুষ সহজে হয় না। সহজে আসে না। এবং সেজন্যই যাদের জন্য এমন মানুষ আসে, তাঁর ঋণের কৃতজ্ঞতায় তারা নিজেদের ধন্য মনে না করে পারে না।

বুলুর কথা অজিতদা না বললে আমরা জানতে পেতাম না। এবং সে কারণেই মনে হচ্ছে আমরা কত বুলুকে জানি নে। কত বুলুর বাবা কত শাহেদ সাহেবকে।

অজিতদার তিন পৃষ্ঠার কাহিনী 'বুলুকে আমাদের যে কোনো আলোচনার মাঝে পুরো উদ্ধার করে দেওয়া চলে। দেওয়া উচিত। একুশের উপর যত মহৎ রচনা রচিত হয়েছে, যত মহৎ গল্প কিংবা নাটক তৈরি হয়েছে, 'বুলু' হচ্ছে তার অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের চিরায়ত সৃষ্টি 'ছুটি' কিংবা 'ডাকঘর', 'পোস্টমাস্টার'-এর সঙ্গে আমরা যেমন আকৈশোর পরিচিত হয়ে আসছি আমাদের কৈশোর কিংবা তারুণ্যের স্কুল বা উচ্চতর শিক্ষায়তনের সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে, তেমনি 'বুলু'র সঙ্গে পরিচয় ঘটা উচিত একুশোত্তর সকল কিশোর পাঠক-পাঠিকার তাদের সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের মাধ্যমিক, কি উচ্চ মাধ্যমিক কোনো সাহিত্য সংকলনে 'বুলু' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে আমি আজো শুনি নি। বন্ধুজনদের কাছে জিজ্ঞেস করেও তার জবাব পাই নি। আমার দেখতে হবে মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিকের সাহিত্য সংকলনগুলোর পাতা উল্টিয়ে। 'বুলু' কি ওখানে আছে? আমার ভরসা হয় না, 'বুলুকে ওখানে পাওয়া যাবে।

আসলে একুশ পালনের যত আড়ম্বরেরই আমরা আয়োজন করি নে কেন, একুশের 'বুলুকে আমরা বিস্মৃত হয়েই থাকি।

বুলুর কথা বলতে গিয়ে অজিতদা বলছেন :

"সেদিনের কথা আমার এখনো খুব মনে পড়ে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনদিন থাকার পরই আমাদের কয়েকজনকে বদলী করা হল দিনাজপুরের কারাগারে।" ...

এ কোনো কল্পনার কথা নয়। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরে ভাষা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসাবে যে-সব বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের সেদিনকার পূর্ব পাকিস্তানের ফ্যাসীবাদী সরকার গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন : অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী।

দিনাজপুর জেলে গিয়ে অজিতদা দেখা পান তাঁর 'বুলু'র। ... "বিকেল বেলা জেলের ডাক্তার সাহেব এলেন। ভদ্রলোককে দেখেই আমার ভালো লাগল। লম্বা, গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, সমস্ত চেহারায় একটা প্রশান্ত নম্রতা। আলাপ করে খুব

খুশী হলাম। আমাকে বললেন, আমাকে স্যার, ছাত্রই মনে করবেন। যখন যা দরকার নিঃসঙ্কোচে বলবেন। আমি আপনাদের পরিচর্যার জন্যই আছি। পরদিন সকালে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার বিদায় হলেন। ...

বুলু এই ডাক্তার সাহেবেরই পাঁচ বছরের ছেলে। অজিতদার আদর পেয়ে বুলু বায়না ধরে বাবার সঙ্গে রোজ জেলের ভেতরে আসার, রাজবন্দীদের থাকার বাংলোটিতে। রোজ বুলু আসে। চিরকুমার অজিতদা বুলুকে পেয়ে নিঃসঙ্গতার সকল দুঃখ ভুলে যান। বুলু তাঁর কোলে ওঠে। বিস্কুট খায়। নিজের ছড়ার বই অজিতদাকে পড়ে শুনায়। আর জিজ্ঞেস করে অজিতদাকে : 'তুমি পড়তে পারো?' ...

তারপর অজিতদা বলেন দিনাজপুর জেল থেকে বদলী হয়ে ঢাকার জেলে ফিরে আসার দিনটির কথা।

"বদলীর জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আবার আমি ঢাকা জেলে ফিরে যেতে পারব। ...

আসবার দিন সকাল বেলায়ই ডাক্তারের সাথে বুলুও এলো। আদর করে ওকে কোলে নিলেম। তারপর ধীরে ধীরে ওকে বললেম : বুলু, আজ আমি ঢাকা যাব। তুমি আমার কাছে কী চাও?"

"ও প্রথমে বললো, 'আমি ঢাকা যাব'। তারপর কী ভেবে হঠাৎ আমার কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে বললো : 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ... কেল্লা চাই।"

"আমি তো অবাক। একি কথা এতটুকু শিশুর মুখে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেম, ডাক্তার সাহেব এবার আপনার সরকারি চাকুরি রাখা কঠিন হবে। ছেলের মুখে এসব কী শুনছি।

"ডাক্তার অসহায়ের মতো বললেন, কী করবো স্যার, জেলখানার সামনেই বাসা। রাতদিন মিছিলের মুখে ঐ কথাই শুনে মুখস্থ করে রেখেছে। এ আমি ঠেকাবো কী করে? ...

তারপর অজিতদা জানলেন সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা। বুলুর বয়স তখন নিশ্চয়ই ২২। '৬৯-এ আসাদেরও বয়স হয়েছিল ২২। উনসত্তরের উত্তাল গণজোয়ার। অজিতদা নিজেও তার সচেতন শরীক। সচেতন সংগ্রামী। তাঁর বিশিষ্ট কথনে, আচরণে, প্রকাশে, সাহিত্য-সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাগ্রহ শরীকানায়। সেই সময়েই তিনি বললেন :

... "এতদিনের পরিবর্তনে এসব কাহিনী ভুলেই গিয়েছিলাম। আর এ কাহিনী বলবার কথাও মনে হত না, যদি না সেদিন আর এক কাণ্ড ঘটতো। সেদিনের পরে সতের বছর চলে গেছে। সে এক সাহিত্য সভা থেকে বাসায় ফিরছি। বাসার সামনে রিকশা থেকে নামার পরেই হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন : 'আমায় চিনতে পারেন, স্যার?

আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পেরেছি। আমার নাম শাহেদ। আমি ডাক্তার। আপনি যখন দিনাজপুর জেলে, তখন আমি ছিলাম সেখানে ডাক্তার।"

"তাকিয়ে দেখলেম। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে সেই সতের বছর আগেকার ডাক্তার সাহেবের চেহারার কোনো মিলই যেন পাই নে। হঠাৎ ভদ্রলোক আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। আপনার বুলুকে মনে আছে, স্যার, বলু? ও এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল। চাকুরিও পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সেদিন মশাল হাতে বেরিয়ে গেল। আর ফিরে এল না।" ...

আমার এই রচনাটুকু যদি কোনো আবেগপ্রবণ গবেষকের চোখে পড়ে তবে তাঁকে আমি অনুরাধ করব, যেন তিনি একটু খোঁজ করেন, বুলুর বাবা ডাক্তার শাহেদ আজো বেঁচে আছেন কিনা। ১৯৫২ সালে তিনি দিনাজপুর জেলের ডাক্তার ছিলেন। তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে বুলু অজিতদার কানে কানে বলেছিল : 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। নুরুল আমিনের কেল্লা চাই।' সেই বুলু, ২২ বছরের যুবক বুলু ১৯৬৯-এ এসে বিপ্লব ও জীবনের মশাল হাতে ঘর থেকে সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ফিরে এল না।

এমনি করে ৫২ এসে ৬৯-এ যোগ দিল। এমন সাক্ষাৎযোগের দৃষ্টান্ত আমাদের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়।

কিন্তু শহীদ বুলুর জীবনকে তো উনসত্তরের উত্তরসূরীরা জানে না। আমাদের তরুণ গবেষকরা কি পারেন না ডাক্তার শাহেদকে অন্বেষণ করে আবার আবিষ্কার করে তাঁর নিজের ও তাঁর ছেলে বুলুর জীবনকথাকে আরো বিস্তারিত করে আমাদের হাতে তুলে দিতে? শহীদ বুলু কি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে?

১৫-২-৯১

রুমীর আম্মা

আমার ইচ্ছে হচ্ছে, রুমীর আম্মা, জাহানারা ইমামের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের কথাটি লিখে রাখি। রুমীর পরিচয় পেয়েছি জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি'র প্রকাশিত দিনলিপিতে। গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত সে-দিনলিপির চতুর্থ সংস্করণটি ইতোমধ্যেই হয়ত নিঃশেষ হতে চলেছে। ১৯৮৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'একাত্তরের দিনগুলি'। সচিত্র সন্ধানীর পাতায় এর আগে বেরিয়েছিল। তার পরে বই আকারে।

একাত্তরের দিনগুলি আমার নিজেরও অজানা নয়। সেদিনের বন্দী, অবরুদ্ধ ঢাকার মানুষ আমি। নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও সেদিন নানা বিপদ এবং বিপর্যয় ঘটেছিল। সেই বিপর্যয়ের ভেতর দিয়েই একাত্তরের সঙ্গে পরিচয়। কিন্তু একাত্তরের মোকাবিলা সেদিন কয়েকটি ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ব বাংলার মানুষের সমগ্র ইতিহাসে তার আপামর অধিবাসীর জীবনে এমন রাজনৈতিক-সামাজিক আলোড়ন আর কখনো ঘটেছে বলে কল্পনা করা চলে না। ৩০ লক্ষ শহীদ : ৩০ লক্ষ মানুষের ধন-মান-প্রাণের নিধন। কথাটা বাক্য হিসেবে শুনলে আবেগের বাহুল্য বলে বোধহয়। কিন্তু জাহানারা ইমামের জীবনে একাত্তরে যা ঘটেছে এবং জাহানারা ইমাম, তাঁর স্বামী ইনজিনিয়ার শরীফ ইমাম, তাঁদের হীরের টুকরোর মতন জ্যোতির্ময় পুত্র রুমী : একাত্তরের সংগ্রামের সঙ্গে তাদের দৃশ্য-অদৃশ্য, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানাভাবে সম্পৃক্ততার কথা শুনলে বাক্যের আবেগকে বাহুল্য নয়, বাস্তবকে প্রকাশের ক্ষেত্রে বাক্যকে একেবারেই অক্ষম বলে বোধহয়।

জাহানারা ইমাম, তাঁর স্বামী এবং পুত্র, এঁরা একাত্তরে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন না। তবু সেই ঊনসত্তর কিংবা তার আগ থেকেই বাঙলার জনমানসের ক্রমবিকাশমান আর্তি এবং আলোড়নের তাঁরা ছিলেন সচেতন

দর্শক এবং জীবনের তালে তাল মিলিয়ে চলার পথযাত্রী। তরুণ রুমী ভর্তি হয়েছিল ইনজিনিয়ারিং ইউনিভারসিটিতে। পরিকল্পনা ছিল উচ্চতর শিক্ষার জন্য সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবে। কিন্তু সে তার মাকে বলেছিল : 'আম্মা, আমি মুক্তিযুদ্ধে যাবো।' বাবাকেও সে-কথা সে জানিয়েছিল। তাদের পারিবারিক পরিবেশটি ছিল পরস্পরের মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনা আর বন্ধুত্বের পরিবেশ। এমনটি খুব কম দেখা যায়। রুমী তার মাকে না জানিয়ে কোনো কাজ করে না। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পরেই বাংলাদেশের তরুণরা গেরিলা কৌশলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। তারা সম্ভবমতো মারণাস্ত্র সংগ্রহ করছিল। শত্রুর যাতায়াতকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছিল। এমন কাজে ব্যাপৃত কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য, মাল-মশলা, কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করছিল। গোপনে, সঙ্গোপনে। রুমী, রুমীর আম্মা, রুমীর আব্বা, তারা সকলেই ছিল এমন গোপন কাজের অংশীদার। অবস্থা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। শত্রুর আক্রমণ তীব্র হচ্ছিল। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের পর ঢাকাতে পাকিস্তানি বাহিনীর সুনির্দিষ্ট আঘাত আসছিল অবরুদ্ধ ঢাকায় গুপ্তভাবে কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সমর্থকদের ওপর। রাত-বিরেতে বাড়িতে বাড়িতে হানাদাররা হানা দিচ্ছিল। ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ক্যান্টনমেন্ট আর নির্যাতন কেন্দ্র এম পি হোস্টেলে। রুমী এসেছিল তার বন্ধুদের সাথে একটা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে। মায়ের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ রোধ করতে না পেরে বাড়িতে এসে একরাত থাকতে না থাকতে পাকিস্তানি বাহিনী গভীর রাতে এসে হামলা করলো জাহানারা ইমামের নিউ মার্কেটের কাছের এলিফ্যান্ট রোডের 'কণিকা' বাড়িটিতে। ঘরের ভেতর থেকে ধরে নিয়ে গেল রুমী এবং তার আব্বাকে। নির্মম নির্যাতন চালানো হল তাদের ওপর এম পি হোস্টেলে। গ্রেফতারের পর পিতার কাছ থেকে পুত্র রুমীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল। কয়েকদিন পর অকথ্য নির্যাতনের চিহ্ন বুকে-পিঠে ধারণ করে রুমীর আব্বা শরীফ সাহেব যদি-বা মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন, রুমী আর এলো না। নির্যাতনের এই আঘাতে এবং পুত্রের নিহত হওয়ার ঘটনায় শরীফ সাহেবের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো। ডিসেম্বর মাসে, স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন বিজয়ের সন্নিকটে, তখন আকস্মিকভাবে শরীফ সাহেব সংজ্ঞা হারালেন। হাসপাতালে নেয়া হল তাঁকে। কিন্তু সেখান থেকে ১৪ ডিসেম্বর সকালে ফিরে এলো তাঁর মৃতদেহ।

জাহানারা ইমাম ১৪ ডিসেম্বরের দিনলিপিতে লিখলেন : "শরীফকে বাসায় আনা হয়েছে সকাল দশটার দিকে। মনজুর, মিকি—এরা দুজনে ওদের পরিচিত ও আত্মীয় পুলিশ অফিসার ধরে গাড়িতে আর্মড পুলিশ নিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা পিকআপ জোগাড় করে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছেন।" ...

যেন জাহানারা ইমামের স্বামী শরীফ সাহেব অসুস্থ হলেও দুর্বল অবস্থায় ফিরে এসেছেন। তিনি মারা গেছেন : এমন মর্মান্তিক ঘটনার আভাস বর্ণনার এ-বাক্য কয়টিতে পাঠক অন্বেষণ করেও পাবেন না। কেবল এখানেই নয়। তার

পরের সকল ঘটনার বিবরণ এমন একটি অকল্পনীয় স্থৈর্যের মধ্যে লিখিত হয়েছে যে, নিজের জীবনের সবচাইতে মর্মান্তিক ঘটনার এমন আপাত নিরাবেগ বর্ণনা তাঁকে তুলনাহীন করে তুলেছে। এই বিবরণ পাঠ করে এবং দৃশ্যটি নিজের মনের চোখে উদ্ভাসিত করতে গিয়ে আমার নিজের চোখও বারংবার জলে ভরে ওঠে। দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়।

বস্তুত জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' একদিকে যেমন একাত্তরের ঢাকার, তথা সংগ্রামী বাংলাদেশের এক দলিলবিশেষ, তেমনি একটি পরিবারের মর্মস্পর্শী কাহিনী হিসেবে অপার বেদনা, সাহস এবং সংগ্রামের এক বিস্ময়কর আলেখ্যবিশেষ।

আমার ইচ্ছে ছিল, জাহানারা ইমামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, কেমন করে তিনি এই দিনলিপিগুলো তৈরি করেছিলেন, কেমন করে তাকে তিনি রক্ষা করেছিলেন।

কিন্তু জাহানারা ইমাম, আমি শুনেছিলাম, ভয়ানকভাবে অসুস্থ। ১৯৭১-এর পরবর্তীকালে তাঁর মুখে ক্যানসার রোগ ধরা পড়ে। তার ফলে তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকভাবে আহার করা, খাদ্য গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যাঁর সুন্দর, মার্জিত উচ্চারণের আলাপ-আলোচনা একদিন ঢাকার সাংস্কৃতিক মহলকে আকৃষ্ট এবং আনন্দিত করতো, তাঁর কণ্ঠ আজ প্রায় স্তব্ধ। এও জাহানারা ইমামের জীবনের আর একটি ট্রাজেডি। আমার তাই সঙ্কোচ ছিল, এমন অবস্থায় তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর বিগত দিনের মর্মান্তিক জীবনের কথা জিজ্ঞেস করা উচিত হবে কি না। তাঁকে দিয়ে কথা বলানোতে তাঁর কষ্ট বৃদ্ধি পাবে কি না।

আমার মনের ইচ্ছের কথা বলেছিলাম মিসেস বাসন্তী গুহঠাকুরতাকে। বাসন্তী গুহঠাকুরতা জাহানারা ইমামের যেমন সুহৃদ, তেমনি তাঁরই মতো ১৯৭১-এর ট্রাজেডির আর এক নায়িকা। বাসন্তী গুহঠাকুরতা কোনো বই লেখেন নি। নিজের কথা নিজে কোথাও বলেন নি। কিন্তু বাসন্তী গুহঠাকুরতার স্বামী অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্ল্যাটে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। হানাদার বাহিনী তাঁর ফ্লাট আক্রমণ করে, বুটের লাথিতে দরজা ভেঙে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার নাম জিজ্ঞেস করে তাঁকে ধরে সিঁড়ির গোড়াতে নিয়ে সামনাসামনি গুলি করে চলে গিয়েছিল। ২৬ নয়, বোধহয় ২৭ মার্চ তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয় নি। সচেতনভাবে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে কয়েকদিন পর তিনি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। সেও আর এক মর্মন্তুদ কাহিনী।

জাহানারা ইমাম আমার বান্ধবীস্থানীয়। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় আমরা একসাথে রাস্তায় মিছিল করেছি। আমি বাংলা একাডেমিতে চাকরি করাকালীন তাঁকে বাংলা একাডেমির সকল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে

সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং শ্রোতা-দর্শক হিসেবে নিয়মিত উপস্থিত হতে দেখেছি। তবু আজ একা তাঁর সামনে গিয়ে, তিনি কেমন আছেন, জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছিল না। বাসন্তী গুহঠাকুরতা আমার চাইতে বয়সে বড়। পাঁচজন বয়োকনিষ্ঠের মতো আমিও তাঁকে 'দিদি' বলে সম্বোধন করি। তিনি তাতে খুশি হন। তাঁকে জাহানারা ইমামের কাছে যাওয়ার কথা বলাতে তিনিই ফোনে যোগাযোগ করে তারিখ ঠিক করলেন। এবং সে অনুযায়ী আমরা দুজন ১০ এপ্রিল (১৯৮৮) তারিখে জাহানারা ইমামের 'কণিকা' ভবনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।

গিয়ে দেখলাম, তাঁর শরীর কিছুটা সুস্থ হয়েছে। আমাদের দেখে খুবই খুশি হলেন। পুরনো দিনের এমন পরিচিত মানুষের সংখ্যাই আজ কম। আনন্দের রঙে তাঁর গৌর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তবু দুঃখ লাগলো আমার এই দেখে যে সে মুখ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে তাঁর এখনো কিছুটা কষ্ট হয়। অপারেশন হয়েছে। জিহ্বার সম্মুখ ভাগটি কিছুটা প্রলম্বিত হয়ে গেছে। বললেন, কথা বলতে পারেন। তবে কোনো শক্ত খাবারই জিহ্বায় দিতে পারেন না। জিহ্বা তা গ্রহণ করে গলায় দিতে পারে না। বাইরে বেরিয়ে আসে।

তবু আমার সঙ্গে আলাপে কোনো কষ্টকে কষ্ট বলে স্বীকার করলেন না। কোনো নিষেধ শুনলেন না। নিজের হাতে আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। মিসেস বাসন্তী গুহঠাকুরতারও আপ্যায়নের বৈশিষ্ট্যটি পরিচিত মহলে প্রবাদের খ্যাতি অর্জন করেছে। আমরা যে দুদিন জাহানারা ইমামের কাছে গিয়েছি, সে দুদিনই বাসন্তী দেবী তাঁর বাসা থেকে নিজের হাতে তৈরি পুডিং আর ক্ষীর জাহানারা ইমামের জন্য বাটিতে করে নিয়ে এসেছেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে সখীভাব। পরস্পরের মধ্যে 'তুমি'র সম্বোধন।

জাহানারা ইমাম আমার কাছে এসে বসলেন। আমাদের আলাপটি রেকর্ড করে রাখার জন্য আমি একটি শব্দ-গ্রাহকও নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটি সামনে রেখে আমি জাহানারা ইমামকে আমার নিজের মনের আন্তরিক অনুভূতিকে প্রকাশ করে বললাম : "আপনার দেশব্যাপী আজ পরিচয়, আপনি রুমীর আম্মা। আপনার 'একাত্তরের দিনগুলির'র মধ্য দিয়ে আমরা আপনার রুমীকে চিনেছি। রুমীর আব্বা শরীফ সাহেবকে পেয়েছি। এবং এক ভিন্নতর জাহানারা ইমামকেও পেয়েছি, যিনি কেবল একজন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মী নন। যিনি ত্যাগে সাহসী, বিপদে স্থির এবং আত্মপ্রকাশে যিনি অবিশ্বাস্যরূপে সংযমী। আপনি আমাকে বলুন : কেমন করে এমন দিনলিপি আপনি সেই মহাবিপদের নয় মাস ধরে তৈরি এবং তাকে রক্ষা করেছিলেন।"

আমার এমন আবেগে জাহানারা ইমামের চোখও আজ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। তিনি আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছলেন। বললেন, "এটা আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। নিজের খাতায় টুকিটাকি লিখে রাখা। দিনাদিনের ঘটনা। কিন্তু একাত্তরের ঢাকায় বসে এসব লেখার বিপদ আমি

জানতাম। তবু অভ্যাস ছাড়তে পারি নি। কেবল নিজের বুদ্ধিতে আজেবাজে খাতার পাতায় এ-কোন ও-কোন করে, আঁকাবাঁকা লাইনে, কখনো কালো কালিতে, কখনো রঙিন কালি দিয়ে প্রায় ছবির মতো করে দিনের ঘটনাকে ইঙ্গিতে লিখে রাখার চেষ্টা করেছি। রুমীর নাম উল্লেখ করতে হলে উল্টো লিখেছি 'মীরু'। মুক্তিযোদ্ধাদের যদি পাঁচশ' টাকা পাঠিয়েছি তো লিখেছি, পাঁচখানা কাপড় লন্ড্রিতে দেয়া হয়েছে। বুদ্ধিতে যেমন কুলিয়েছে, তেমন করে লিখে রেখেছি। ভেবেছি-যদি হামলা হয়, যদি এ-কাগজ হানাদারদের হাতে পড়ে, তবে ওরা একে পাগলের আঁকিবুকি ছাড়া আর কিছুই ভাববে না।"

জাহানারা ইমামের বাসায় হামলা হয়েছিল। সেই আক্রমণেই গ্রেফতার হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা রুমী। গ্রেফতার হলেন শরীফ সাহেব। তবে জাহানারা ইমামের দিনলিপির খাতা সেদিন রক্ষা পেয়েছিল।

'বিচিত্রা'র সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী, 'সচিত্র সন্ধানী'র সম্পাদক গাজী শাহাবুদ্দীন : এঁদের কাছে অন্যসব পাঠকের মতো, আমি অসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। যখন জাহানারা ইমামকে জিজ্ঞেস করি, 'কেমন করে আপনি 'একাত্তরের দিনগুলি' তৈরি করলেন', তখন গভীর মমতা নিয়ে তিনি বললেন : "এর জন্য দায়ী তো 'বিচিত্রা'র সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী, 'সচিত্র সন্ধানী'র গাজী শাহাবুদ্দীন, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী : এঁরা। ১৯৭১-এর পর আমার শরীর ও মনের তো চরম বিপর্যস্ত অবস্থা চলছিল। আমি কেবল রুমীর পথ চেয়ে থাকি। রুমী ফিরে আসবে। কিন্তু রুমী আর আসে না। আমি ছিলাম সেই একচক্ষু হরিণীর মতো। একচক্ষু হরিণী সমুদ্রের দিকে ওর কানা চোখটা রেখে ডাঙার দিকে রেখেছিল ভালো চোখটা। ও ভেবেছিল, বিপদ আসবে ডাঙার কী থেকে, সমুদ্রের দিক থেকে নয়। ওর কি হয়েছিল, তা আমি জানিনে। কিন্তু আমার বিপদ তো দুদিক থেকেই এলো। রুমী দুরন্ত। রুমী ভবিষ্যতের দিকে দ্রুতবেগে ছুটে যেতে চায়। ওকে আমি হারাতে পারি—সে আশঙ্কা আমার ছিল। তাই উদ্বিগ্ন চোখ রেখেছিলাম কেবল ওর দিকে। রুমীর আব্বা শরীফের দিকে ছিল আমার কানা চোখ আর বিশ্বাস। এদিক থেকে বিপদ আসবে, কল্পনা করি নি। অথচ রুমী আর ওর আব্বাকে হানাদাররা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর নির্মম অত্যাচার করে রুমী আব্বাকে ফেরত দিলেও শরীফের শরীর ভেঙে পড়লো। বিশ্বাস হতে না চাইলেও শরীফ আর আমি তো জানতাম, রুমীর কি হয়েছে। কিন্তু আমার চাইতেও শরীফের বেদনা অনেক বেশি দুঃসহ। এম পি হোস্টেলে ওর বুক থেকেই তো ছিনিয়ে নিয়েছে রুমীকে জল্লাদের দল। তারপর রুমীকে কীভাবে হত্যা করেছে, তা কল্পনা করা ছাড়া আমাদের আর তা জানার তো কোনো উপায় ছিল না। সেই দুঃসহ কল্পনাতেই শরীফের ওপর আঘাত এল। একদিন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর ১৪ ডিসেম্বর হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন এক নিস্প্রাণ দেহ হয়ে। কানা চোখ হরিণী আমি। আমার বিপদ এলো দুদিক থেকেই।"

"এমন অবস্থায় '৭২ থেকে '৮২ কিংবা '৮৪ পর্যন্ত '৭১-এর দিন-লিপিগুলোর ওপর যখনি চোখ বুলিয়েছি, তখনি কেবল কান্নায় ভেঙে পড়েছি। বোধহয় '৮৪ কি '৮৫-তে শাহাদাত এসে বললো : আম্মা, আপনাকে '৭১-এর কাহিনী লিখতে হবে। আপনার ডায়রীর ভিত্তিতে।"

রুমী-হারানো জননী অনেক সন্তানকে ফিরে পেয়েছেন। বললেন : "শাহাদাত ওরা তো আমার রুমীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে ছিল। তার সঙ্গে এ্যাকশন করেছে। রুমী ফেরে নি। কিন্তু ওরা ফিরে এসে আমায় অক্লেশে 'আম্মা' বলে ডাক দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। ওদের দাবিতেই আমাকে একাত্তরের দিন-লিপি দিয়ে তৈরি করতে হয়েছে 'একাত্তরের দিনগুলি'।" ...

আমি বললাম : 'একাত্তরের দিনগুলি' দেশ-কালের বেড়া ডিঙিয়ে কতোদূর যে বিস্তারিত হয়েছে, তা কি আপনি জানেন না জাহানারা ইমাম? পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় কবি এবং ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'পূর্ব-পশ্চিম'-এ আপনার নাম, রুমীর নাম উল্লেখ করে 'একাত্তরের দিনগুলি'র ওপর নির্ভর করে তৈরি করেছেন তার পরিচ্ছেদ।

জাহানারা ইমামের মুখ কথাটিতে আনন্দিত হয়ে উঠলো। বললেন : "ঐ সুনীলও এসে বললেন একবার, মুক্তিযুদ্ধের ছেলেরা সকলে আপনাকে আম্মা বলে। আমিও আপনাকে 'আম্মা' বলবো। আমি কতোবার পড়েছি আপনার 'একাত্তরের দিনগুলি।' যতবার পড়েছি, ততবার আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, আবেগ আর বেদনার অশ্রুতে। আমিও আপনাকে 'আম্মা' বলে ডাকবো।"

মানুষের বাস্তব জীবন কল্পনারও কতো অধিক! ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতেও আমরা ১৯৭১-এর মার্চকে কল্পনা করতে পারি নি। এবং ১৯৭১-এর ১ কিংবা ৭ মার্চ যে-জাহানারা ইমাম, তাঁর স্বামী শরীফ সাহেব, টগবগে ফুটফুটে ছেলে রুমী গাড়িতে ঘুরে ঘুরে, রিকশায় চড়ে চেড়ে শেখ সাহেবের মিটিং দেখেছেন, বাড়িতে ঘটনার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আর বিতর্কে পরস্পর খুনসুটি করেছেন, তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি তাদের জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলিকে। আর সব মিলিয়ে জাহানারা ইমামের নিজের যে-রূপান্তর, তাও তাঁর কল্পনাকে অতিক্রম করে গেছে।

আমি আলাপ শেষে ওঠার আগে কথাটা তুলেছিলাম। 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক টেস্টামেন্ট বিশেষ। দলিল। কেবল তাই নয়। এ সততায়, সত্যে, আবেদনে, পরিমিতিতে, সংযমের অত্যাশ্চর্য প্রকাশে একখানি ধর্মগ্রন্থের রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশের হাজার হাজার পাঠকের ঘরে এ গ্রন্থ আজ রক্ষিত। রক্ষিত হওয়ার মতো গ্রন্থ। বাংলাদেশে কতো তো পুরস্কার আর সম্মান প্রদানের প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলা একাডেমি আছে। খোদ সরকার আর রাষ্ট্রীয় পদকের কথা বাদই দিলাম। কিন্তু বাংলা একাডেমির তরফ থেকে 'একাত্তরের দিনগুলি' এবং তার লেখিকাকে কি উপযুক্ত কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে? প্রশ্নটা আমার মনে অনেক দিন থেকেই জাগছিল। আমি দ্বন্দ্বে ছিলাম।

হয়ত দিয়েছে আমি জানিনে। কিংবা হয়ত দেয় নি। জাহানারা ইমামকে এ-কথা জিজ্ঞেস করতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল। তবু প্রশ্ন করতে বললেন : "আমার বড় পুরস্কার তো অগণিত তরুণ-প্রাণ পাঠকের কৃতজ্ঞতা। তারা পড়েছে এ-বইখানা। তারা এখনো নানাভাবে, নানা উপঢৌকনে, নানা প্রশংসায় তাদের মনের আবেগের প্রকাশ দিয়ে আমাকে আপ্লুত করে দিচ্ছে। তাদের ভালোবাসার শেষ নেই। বাংলা একাডেমির কথা আপনি জিজ্ঞেস করাতে আমি বিব্রত বোধ করছি। তার মহাপরিচালক বয়সে আর প্রীতিতে আমার স্নেহাস্পদ। এ-বই তিনি পাঠ করেছেন। তাঁর ভালো লেগেছে। তাতেই আমি খুশি হয়েছি। এ-তাঁর ব্যক্তিগত প্রকাশ।"

আমি বুঝলাম, আমার কথাটা জিজ্ঞেস করা সঙ্গত হয় নি। আর তাছাড়া 'একাত্তরের দিনগুলি'কে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলা একাডেমি কিংবা বাংলাদেশের বর্তমান সরকার স্বীকৃতি জানাবে, তাকে অধিকতর সংখ্যক পাঠকসাধারণের কাছে লভ্য করে তুলবে, এমন যদি বাস্তব পরিস্থিতি হত, তাহলে একাত্তরের পরবর্তীকালে যে-রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক সঙ্কট এমনিভাবে ঘনীভূত হচ্ছে, সে পরিস্থিতি হয়ত সৃষ্টি হত না। এখনো যদি জাহানারা ইমামকে সরকার তাদের প্রচুর খাদমিশ্রিত স্বর্ণের, তথা সম্মানের একটি পদক প্রদান করে, তবে তাও করা হবে 'একাত্তরের দিনগুলি'কে ম্লান করারই জন্য। তাকে উজ্জ্বল করার জন্য নয়। তাই জাহানারা ইমাম যে আজো বাংলা একাডেমি কিংবা বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো স্বীকৃতি বা সম্মান লাভ করেন নি, তাতে এখন আর আমি দুঃখবোধ করিনে। এবং এ-প্রশ্নে জাহানারা ইমামের জবাবটিতে আমি অনুপ্রাণিত বোধ করেছি। জাহানারা ইমাম, আমার উঠে আসার আগে, বললেন : আমি মাটির প্রদীপ। আমার কর্তব্যটুকু সলতের শেষ তেলবিন্দুটি পর্যন্ত করে যাবার চেষ্টা করব। তাতেই আমার সার্থকতা।

ওঠার আগে আমি আবার রুমীর সামরিক পোশাক পরা তৈল-চিত্রটির দিকে তাকালাম। ২০-২২ বছরের তরুণ। কোমরের বেল্টে হাত গুঁজে, মাথায় সামরিক টুপি পরে দূরের দিকে আত্মবিশ্বাসের চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে।

গেরিলা যোদ্ধা রুমী স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত আলোয় এমন পোশাক পরতে পারে নি। এমন পোশাকে রুমী। তার আম্মার নিশ্চয়ই কল্পনা। কিন্তু আপনি ঘরে ঢুকলে এই রুমীর দিকে না তাকিয়ে পারবেন না। রুমীর পোরট্রেটটির নিচে উৎকীর্ণ রয়েছে কবি জীবনানন্দ দাশের এই উক্তিটি : আবার আসিব ফিরে এই বাংলায় ...

রুমীর আম্মা যথার্থই বিশ্বাস করেন তাঁর রুমী আবার, 'আসিবে ফিরে এই বাংলায়।'

১৮.০৪.৮৮

আমার বাবা

সেই ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে আমার দর্শন বিভাগের প্রধান এবং আমার শিক্ষক ড. বিনয় রায়ের কাছ থেকে আমার চাকরিতে 'রেজিগনেশন লেটার' ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমার বড় ভাইয়ের যাওয়ার ঘটনাতেই আমার মনে পড়ে গেল বাবার কথা।

বাবাকে আমি কীভাবে প্রকাশ করবো, বুঝতে পারছিনে। একজন সরল নির্বাক, বলা চলে মূক অর্থাৎ বোবা কৃষকের মনের কথা কী তাঁর বি এ, এম এ পড়া, রাজনীতি করা ছেলে কিংবা ছেলেরা জানতে পারে? বুঝতে পারে? আমার বড় ভাই রাজনীতি করতেন না। তাঁর সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠতা ছিল অনেক বেশি। তিনি বাবার বড় ছেলে। সেই বড় ছেলেকে তিনি ক্ষেতের কাজে তাঁর সঙ্গে না নিয়ে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। ধারকর্জ করে তাঁর পড়ার খরচ যুগিয়েছেন। ছেলে তাঁর ভদ্র, সুন্দর, পড়ুয়া, ধর্মপরায়ণ। সবাই তার প্রশংসা করে। এমনকি পার্শ্ববর্তী গ্রামের 'ভদ্রলোকেরা'—মানে হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 'মান্য' লোকেরা—ভাটাজোরের দত্ত পরিবারের বাবুরা পর্যন্ত তাঁর ছেলেকে প্রশংসা করেন। তার পরীক্ষার ফি যোগাতে অসুবিধার কথা জানতে পেরে নিজেরা এগিয়ে আসেন সে ফি দিয়ে দিতে। এসব দেখে বাবার মনে আনন্দ হয়। কিন্তু সরল মানুষ। এমন আনন্দেরও কোনো ভাষাগত প্রকাশ ঘটে না। ছেলে তাঁকে খবরদারি করে। বলে : 'এখন আর আপনার অত খাটুনির দরকার নেই, আমি আছি, আমি দেখবো।' বড় ছেলে তাঁর ঢাকা ইউনিভারসিটির এম এ শেষ না করেই একটা চাকরি নিল। এই সংসার দেখার জন্য। ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য। সেই ১৯২৯-৩০ সালে।

বাবা খালি পায়ে হাঁটেন : ঘাস আর দূর্বায় ছাওয়া তাঁর বাড়িঘর, ক্ষেত-খামারের ওপর দিয়ে। তার আইল দিয়ে। বড় ছেলে তাঁকে জোর করে জুতো

পরায়। বলে : 'এই জুতো কিনে দিলাম। কোথাও বেড়াতে গেলে পায়ে দেবেন।' বাবা জুতো পরতে অস্বস্তি বোধ করেন। যদি যান আমার নানা ও মামার বাড়িতে—অর্থাৎ তাঁর শ্বশুরবাড়িতে, তবে জুতো পায়ে বেরোন না। পথে খাল-খন্দ যে না আছে, তা নয়। গ্রামের পথ সব সময়ে শুকনো থাকে না। কিন্তু শুকনো থাকলেও বাবা জুতো পরে যান না। জুতো হাতে নিয়ে যান। গাঁয়ের পথে হাঁটতে গেলে জুতো পরার দরকার কোথায়—এই মূল প্রশ্নের জবাব এই বাক্যহীন সরল কৃষক জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত জানতে পারেন নি। হ্যাঁ, কালেভদ্রে, কোনো সমাজে, মজলিসে যদি জুতো পরার দরকারই হয়, তবে তা সেখানে পরলেই তো চলে। তার জন্য সর্বক্ষণ আর সারাটা পথ জুতো পরা আর দামি জুতোকে ক্ষয় করার এই বিলাসিতা কেন? তাঁর বড় ছেলে, তাঁর এমন 'গেঁয়ো' ব্যবহারের নিশ্চয়ই অনেক রাগ করেছে। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত দুএক জোড়ার অধিক জুতো তিনি ব্যবহার করেছেন, এমন স্মৃতি আমার নেই। তাই বলছিলাম, বাবার কথা কেমন করে প্রকাশ করব? আমি কি তাঁকে চিনি? আমারতো এক জোড়ার জায়গাতে তিন জোড়া জুতো। শুধু আজ নয়। সেই স্কুল আর কলেজের সময়েইতো আমরা জুতো-মোজা পরা বাবুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম। 'ভদ্রলোক বাবুরা' তো তেমনি পরতেন।

সেকালে লুঙ্গি আর ধুতি আমাদের পোশাক ছিল। বাবাও কোথাও বেড়াতে গেলে লুঙ্গি ছেড়ে ধুতি পরতেন। আমি যখন ঢাকায় আসি পড়তে ১৯৪০ সালে, তখনো ধুতি আমার পোশাকী কাপড়। ধুতির ওপর শার্ট। ধুতি কাকে বলে, সে-কথা কষ্ট করে আমার ছেলেমেয়েদের এখন বোঝাতে হয়। শাড়ির মতো লম্বা বটে, কিন্তু পরার কায়দাটি আলাদা। এক অংশকে কুঁচি করে ঝুলিয়ে দিতাম সামনে। আর এক অংশ চিকন করে ভাঁজ করে দুপায়ের মধ্য দিয়ে পেছনে নিয়ে কোমরে গুঁজতে হত। ঢাকায় সম্প্রদায়গত দাঙ্গার ঝাপটায় ক্রমান্বয়ে ধুতি বিছানার চাদরে পরিণত হয়েছে। ধুতি হিন্দুর পোশাক আর দোনলা পায়জামা, মুলমানদের। এই হয়ে দাঁড়ালো 'হিন্দুস্তান' 'পাকিস্তানের' সীমানা। আজ দেখা যাচ্ছে, হিন্দু মধ্যবিত্তও ধুতি ছেড়ে পাজামা ধরেছেন। সর্বত্র। এখানে এবং ওখানে। পাজামা থেকে প্যান্ট। কেবল মেয়েরাই মানুষ আছে : না হিন্দু, না মুসলমান। এখানে এবং ওখানে তারা সবাই শাড়ি পরে। পোশাক-পরিচ্ছদের বিবর্তনের আদি-অন্ত আমার জানা নেই। কিন্তু নিজের পোশাক যে বদলে গেছে ধুতি থেকে পায়জামা এবং প্যান্টে, এই চল্লিশ বছরের মধ্যে, সেটি উল্লেখ করতে হয়।

বাবা কি কোনোদিন ঢাকা এসেছিলেন, সেই ১৯৪৮ সালের আগে এবং সেই দিনটির আগে, যেদিন তিনি আচম্বিতে আমাকে হতবাক করে হাজির হয়েছিলেন। আমার আত্মগোপনের স্থানটিতে? এ-কথা ঠিক যে, তিনি আগে কখনো এতদূরে ঢাকায় আসেন নি। বড় ছেলের সঙ্গে দুএকবার নিজের গ্রামের বাড়ি ছেড়ে ছেলের

কর্মস্থলে গিয়েছেন বটে। কিন্তু সে বরিশাল জেলাতেই। এতোদূর ঢাকাতে নয়। নিশ্চয়ই আমার বড় ভাই তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন : 'আপনি চলেন আমার সঙ্গে, দেখি এই পাগলকে ফেরানো যায় কি না।'

সেই কথাতেই বাবা এসেছিলেন। হয়ত তখন বিকেল হয়ে আসছে। এমন সময়ে বাবা এলেন। বড় ভাই বিনয় বাবুর কাছ থেকে ফিরে এসেছেন। বিনয় বাবু বলছেন, 'ওকে তো ফেরাতে পারবেন না।' তবু বাবা এলেন আমার কাছে। বাবা কিছু বললেন না। বাবা কোনোদিনই আমাকে কিছু বলেন নি। বাবার স্নেহের যে-প্রকাশকে আমি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি, এই প্রৌঢ় বয়সে, সে হচ্ছে, আমার চার কিংবা পাঁচ বছর বয়সে রোজ সকালে জোর করে আমাকে চিরতার পানি খাওয়ানোর ঘটনা। আমার নাকি ক্রিমি হয়েছিল। আর চিরতা তার মহৌষধ। বাবা সেদিন এমনিভাবে জোর করে ভেজা চিরতার রস না খাওয়ালে আমি জীবনে জানতামই না, চিরতা আর তার রস কাকে বলে! এমনি তিতার বাড়া তিতা পৃথিবীতে আর কিছু কি আছে?

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। লেখাপড়ায় আমি অল্প বয়স থেকেই মধ্যম কিসিমের ছিলাম। অঙ্ক পারতাম না। এখনো পারি না। কিন্তু বর্ণ পরিচয়ের পরে গড়গড় করে বাংলা পড়তে পারতাম। উঠোনের চারপাশে ঘরময় বাড়ির সবাইকে আমি কোরানের কবিতার অনুবাদ সুর করে পাঠ করে শোনাতাম। তাতে তারা সবাই মোহিত হয়ে যেত। আমাকে আমার চাচা, চাচাত ভাই ও বোনের সবাই আর করতেন। ফাইভ-সিক্সের বেশি হয়ত তখন নয়। সকলকে 'বিষাদ-সিন্ধু' পড়ে শোনাতাম। 'পাষণ্ড সীমার খঞ্জর হাতে ইমাম হোসেনের বুকের ওপর চেপে বসেছে। খঞ্জর চালাচ্ছে। কিন্তু হযরতের চুম্বনসিক্ত কণ্ঠকে সে খঞ্জর ভেদ করতে পারছে না।' আহা সে কি কাহিনী! আমার মুখে পাঠ শুনে মা, চাচি, ভাইয়েরা তাঁদের চোখের পানি রোধ করতে পারতেন না।

বাড়িতে মসজিদ ছিল। এ-মসজিদও তৈরি করেছিলেন আমার বড় ভাই। এ মসজিদে মাগরিবের আর ফজরের নামাযের আজান দিতাম আমি। তাতেও সকলের কী প্রশংসা! অথচ বাবা কোনোদিন মুখ ফুটে আদর করে বলেছেন : 'বাহ্! আমাদের করিম কী সুন্দর পড়তে পারে'—এমন আমার মনে পড়ে না। বাবার স্নেহের কোনো মৌখিক প্রকাশ ছিল না। প্রকাশ হত রাগের। সরল বোবা মানুষের বোধহয় তাই হয়। বাবার রাগ পড়তো বেচারি মায়ের ওপর। কিন্তু বড় ছেলে বড় হওয়ার পরে সেখানেও তম্বি পড়ছিল। বড় ছেলে তাঁর বলে দিত : "খবরদার আমার মা'র ওপর রাগ করতে পারবেন না। মা তো সব করেন।' বড় ছেলের এই খবরদারিতেই কাজ হত। বোবা মানুষটি শান্ত হতেন। বড় ছেলের এমন বুঝমান খবরদারিতে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠতো।

১৯৪৮ সালের সেই দিনটিতে, বাবা যখন জানতে পারলেন, তাঁর সেজ ছেলে ইউনিভারসিটির চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, 'পাগল' হয়েছে, সেদিন তাকে এই

পাগলামির পথ থেকে ফিরিয়ে নিতে এসেও সেই ছেলেটিকে 'চল্, আমার সঙ্গে বাড়ি চল,—এই কথাটি বাদে আর কোনো কথা বলতে পারেন নি। আর এই কথাটি বলেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আমাকে বুকের মধ্যে, তাঁর বৃদ্ধ কৃশ দেহের সঙ্গে এক করে ফেলেছিলেন। তখন তাঁর চোখ দিয়ে পানি ঝরে পড়ছিল। দুঃখের পানি। আফসোসের পানি। তাঁর এই ছেলেটি এমন কেন! হয়ত আমাকে বার কয়েক জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'বল্ তুই কী করবি? বল্ তুই কী করবি?' কিন্তু আমার মুখ থেকে একটি কথাও সেদিন বেরোয় নি। কী কথা আমি বাবাকে বলবো? আমি কি বাবাকে রাজনীতির কথা বোঝাবো? বোঝাবো, এই পাকিস্তানের স্বাধীনতা আসল স্বাধীনতা নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না হলে শ্রমিক-কৃষকের দুঃখ যাবে না। না, এমন বলার দুঃসাহস আমার ছিল না। বাবা জানতেন, তাঁর ছেলেটি সব সময়েই শান্ত এবং শিষ্ট। আজ কেবল শান্ত এবং শিষ্টই নয়। আমি পাথরের মতো নির্বাক রইলাম। নিঃশব্দ রইলাম। বাবা আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। যেন তিনি জীবনেও এই স্নেহের বন্ধন থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন না। অথচ পুলিশ আমাকে খোঁজ করছিল। ১৯৪৮ সালের সেই দিনটিতে বাবা যখন তাঁর স্নেহের জালে পলাতক আমাকে ধরে ফেলেছিলেন, সেদিন যে কেমন করে সেই জাল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তা আমি আজো বুঝতে পারিনে। চোখের সামনে দৃশ্যটা আজো ভাসছে, এই ১৯৮৫ সালে, প্রায় ৩৫ বছর পরে। প্রৌঢ়ত্বের এই ধূপছায়া বয়সেও। যেভাবে সেদিন বাবার কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম, তাকে সাহস বলব কিংবা পাষণ্ডতা, তা আমি জানিনে। কেবল বুঝতে পারছিলাম, আমি আমার জীবনের সবচাইতে বড় সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। এক চুল এদিক-ওদিক হলেই আমার অস্তিত্বের এদিক-ওদিক ঘটে যাবে। ভাষা দিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে এই দুর্জয় স্নেহের বন্ধনকে আমি ছিন্ন করতে পারবো না। কেবল অপেক্ষা করলাম, কখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এবং বাবা কখন খানিকক্ষণের জন্য আমাকে ছেড়ে দেন। তাই যখন দিলেন, তখুনি নিঃশব্দে জঙ্গলঘেরা সেই আশ্রয়ের চারপাশে ঘনীভূত অন্ধকারের সঙ্গে আমি মিশে গেলাম।

সেদিন থেকে আমাদের পরিবারের নিকটজনের কাছে আমার একটা পরিচয় স্থির হয়েছিল : 'ওটা মানুষ নয়।' আত্মীয়-স্বজনরা বলতে পারতেন : 'ওটা মানুষ নয়। ওটা পশু।' কিন্তু সে-কথাও তাঁরা বলেন নি। কারণ পশুরওতো মায়া-মহব্বতে চোখে পানি আসে। আমার তো সেদিন চোখে পানি জমতে দেয়ারও উপায় ছিল না। আমি জানতাম, যদি আমি বিন্দুমাত্র আত্মসমর্পণ করি, বাবা আর বড় ভাই যদি আমাকে সঙ্গে করে বাড়ি নেয়ার জন্য বাদামতলী ঘাটে গিয়ে স্টিমারে ওঠেন, তাহলে সেখানেই সরকারি গুপ্তচর তাঁদের স্নেহের বন্ধন থেকে আমাকে ছিন্ন করে অবিলম্বে তাদের বদ্ধ গরাদে পুরে দেবে। সে আঘাত কি তাঁদের আরো অস্থির করে দেবে না? কিন্তু এ-কথাও তাঁদের বুঝিয়ে বলার উপায় ছিল

না। কোনো কথা না বলে, কোনো বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা না করে আমি সেদিন অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিলাম। বাবাকে কোনোদিন সেই ঘটনার কথা, পরে, মানে অনেক পরে, পাঁচ বছরের এক পর্যায়ের জেলবাসের পরে মুক্তি পেয়েও জিজ্ঞেস করি নি। বড় ভাইকেও নয়। জিজ্ঞেস করি নি, আমার সেদিনের আচরণে তাঁদের কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। কিন্তু এর পরেই স্বজনেরা বলতে শুরু করেছিলেন : 'ওটা মানুষ নয়। ওটা পাষণ্ড।'

১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকেই আমি আত্মগোপন করেছিলাম। পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করেছিল এক বছর পরে—১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা শহরেরই একটি এলাকাতে! কিনতু সে কাহিনী আজ নয়।

০৯.০৬.৮৫

'আমাদের মণি বেটা ...'

মণিদা। বাংলাদেশের শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আন্দোলনের অর্ধশতাব্দীরও অধিককালের নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রামী কর্মী ও নেতা মণি সিংহ। ২৮ জুলাই তারিখে তাঁর ৮৫ বছর বয়স হয়েছে। এটি বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২৮ জুলাই কর্মীরা এবং তাঁর সুহৃদবর্গ তাঁর কাছে জাগিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছেন। আমি গিয়েছিলাম তার দুদিন আগে, ২৬ জুলাই তারিখে। কয়েকদিন যাবৎই মণিদার কথা মনে হচ্ছিল। বন্ধুবর্গের কাছ থেকে শুনেছিলাম, তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে আবার গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শরীরের দক্ষিণ পাশটা অচল হয়ে পড়েছে।

কিন্তু প্রায় এক বছর আগে আমি আর একবার যখন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর গুলবাগের বাসায় বসেছিলাম, তখনো তিনি অসুস্থ থাকলেও, এ বছরের চাইতে বেশ ভালো ছিলেন। কিন্তু শারীরিক এই অসুস্থতা নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই। বয়সের প্রকৃতিগত আইনকে আমাদের মানতে হয়। বিপ্লবী কর্মী শরীর নিয়ে সে আফসোস করেনও না। মণিদাও করেন না। পারিবারিক শোক কিংবা নিজের দেহের আজকের চলৎ-শক্তিহীনতায়ও তাঁর চিরদিনকার মুখের হাসিটি আজো ম্লান হয় নি।

এবার যখন কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, কৌতুক করে বললাম : 'মণিদা, চিনতে পারেন?' তখন চোখ দুটি তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মুখের হাসিটি আরো বিস্তারিত হল। আগেরবার বেশ কিছুটা আলাপ করেছিলেন। আস্তে আস্তে। সে আলোপের কিছুটা আমি 'টেপে' ধরেও রেখেছিলাম।

কিন্তু এবার তেমন আলাপ সম্ভব না হলেও, এখনো মণিদা আস্তে আস্তে কথা তৈরি করে বলেন। আমি কিছুক্ষণ আমার নামটি বললাম না। স্বাভাবিকভাবে তিনি

একটু বিব্রত বোধ করলেন। পরিচিত মুখ আর গলার স্নেহভাজন কেউ এসেছে। কিন্তু তার নামটি মনে আসছে না। এটি যে-কোনো বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে বিব্রতকর। কিন্তু মণিদা আমাকে ঠিক চিনতে পারলেন। কেবল নামটির বদলে বললেন : আপনি 'স্কলার' এটি হয়ত তাঁর আজ অবচেতন মনের সস্নেহ প্রশংসার কথা। অন্য সময় হলে নামটি বলে আলোচনা করতেন। আমি তাঁর অস্বস্তি না বাড়িয়ে নিজের নাম বলে তাঁর গায়ে হাত রাখলাম। তিনি হাতটি আমার, স্নেহ-প্রীতিতে চেপে ধরলেন। দুএকটি করে কথা বলতে বলতে ঘরের কর্মীকে ডেকে বললেন : 'আমাকে উঠিয়ে দাও। বসিয়ে দাও।' আমার সঙ্গে শুয়ে শুয়ে কথা বলবেন, এটি তাঁর ভালো লাগছিল না বোধহয়। যখন জিজ্ঞেস করলাম, মণিদা, এখন কেমন আছেন, তিনি বললেন, ভালো না। এটা কোনো উদ্বেগের কথা নয়। এ-হচ্ছে যে-মানুষ চিরজীবন অনিবার চলেছেন, কাজ করেছেন, তাঁর নিশ্চল হয়ে শুয়ে কিংবা বসে থাকার আক্ষেপ। আমি বললাম : 'না, আপনি তো এখন বেশ ভালো আছেন।' অপর কর্মীরাও এই কথা বলে তাঁর মুখে হাসি ফোটাতে চান। আসলে একজন মানুষ কি সবসময়ে একইভাবে কাজ করে? কেবল চলাই কি তাঁর কাজ? মণি সিংহ আজ চলৎশক্তিহীন হয়েও তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীদের মনে উৎসাহের উৎস হয়ে বিরাজ করছেন। এটাও তাঁর একটি মহৎ কাজ।

মণি সিংহ আমাদের জীবনের এক কিংবদন্তির পুরুষ। আমাদের দেশের নানা সামাজিক-রাষ্ট্রিক আবর্তন-বিবর্তনের কারণে এবং বিভিন্ন সরকারের নির্যাতন ও প্রতিষ্ঠিত উচ্চতর শ্রেণীর প্রকাশ মাধ্যমগুলোর বিরূপতা ও উপেক্ষার জন্য মণি সিংহ হয়ত আমাদের দেশের বর্তমানের তরুণ ও যুব সমাজের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নন। তাঁরা কেবল তাঁর নাম শুনেছেন। তাঁর জীবনকাহিনী বিস্তারিতভাবে তাঁদের জ্ঞাত নয়। কিন্তু মণি সিংহের জীবন কেবল যে একটি একনিষ্ঠ সংগ্রামী জীবন, তাই নয়। মণি সিংহের জীবন পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের বিকাশের একটি আলেখ্য বিশেষ।

মণিদার কাছে কর্মীদের দাবি ছিল তাঁর জীবনকথা বলার। এ দাবিটি তিনি পূরণ করেছেন। তাঁর 'জীবন-সংগ্রাম' নামে আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডও শুনেছি শিগগিরই প্রকাশিত হবে।

আমার আফসোস, ঢাকাতে কতো বইয়ের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সে অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত বইটির কথা দশজন পাঠক জানতে পারেন। কিন্তু মণি সিংহের 'জীবন-সংগ্রাম' বইয়ের কোনো প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নি। এর কারণ কি প্রতিকূল পরিবেশ? আমার ঠিক জানা নেই। মনে হয়, কর্মীরা এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চাইলেও হয়ত মণি সিংহ নিজে সঙ্কোচ থেকে তাতে বাধা দিয়েছেন। অবশ্য মণি সিংহের 'জীবন-সংগ্রাম'-এর কোনো প্রচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন পড়ে না। জীবন-সংগ্রামের ঐকান্তিক কর্মীদের কাছে 'জীবন-সংগ্রাম'-এর সংবাদ কান থেকে কানে, মুখ থেকে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই 'জীবন-

সংগ্রাম'-এর প্রথম খণ্ড এরই মধ্যে নিঃশেষিত। আমরা তাঁর দ্বিতীয় খণ্ডের সাক্ষাৎ লাভে আগ্রহী হয়ে রয়েছি।

'জীবন-সংগ্রাম' হচ্ছে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষের জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস বিশেষ। নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামের যৌবনের সূচনা থেকে উৎসর্গীকৃত কর্মী, মণি সিংহ যখন নিজের জীবনকথা কর্মীদের তাগিদে বিবৃত করেন, তখন তিনি এ-কথা জানেন যে নির্যাতিতের জীবনের সংগ্রাম আর সে সংগ্রামের কর্মীর জীবনে কোনো ভেদরেখা টানা যায় না। এবং এ-জন্যই তিনি তাঁর জীবন কাহিনীকে 'আমার জীবন' বা আত্মজীবনী'—কোনো শিরোনাম না দিয়ে সুচিন্তিতবাবে তার নাম দিয়েছেন 'জীবন-সংগ্রাম।' নামটি প্রথমে শুনে একটু অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু চিন্তা করে দেখলে শিরোনামটি যেমন আকস্মিক নয়, তেমনি তা তাৎপর্যহীনও নয়।

মণি সিংহের 'জীবন-সংগ্রাম'-এর কোনো বিস্তারিত আলোচনাও হয়ত প্রকাশিত হয় নি। কবি নির্মলেন্দু গুণ অবশ্য একটি সুন্দর সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছিলেন। আমার নিজের আগ্রহ সত্ত্বেও অক্ষমতাবোধই এর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের এই আলেখ্যখানির আলোচনা হওয়া উচিত কর্মীদের মধ্যে সরাসরি এবং যৌথভাবে।

মণি সিংহের 'জীবন-সংগ্রাম'-এর ভাষা, তাঁর সাক্ষাৎ আলোচনার কথা কিংবা জন-সম্মেলনে বক্তৃতার মতোই ঋজু, দ্ব্যর্থহীন এবং মনোহারী। তিনি পেশাগতভাবে তথাকথিত সাহিত্যিক নন। কিন্তু সংগ্রামী মানুষের জীবনটাই যেমন একটা গ্রন্থ হয়ে ওঠে, তেমনি সে গ্রন্থের রচনাকারীর প্রকাশের ভাষারও কখনো অভাব ঘটে না। মণি সিংহের 'জীব-সংগ্রাম'-এর বর্ণনার সারল্য এবং সততা সচেতন ঐকান্তিক সাহিত্যিকমাত্রের নিকটই অনুকরণীয় বলে বোধ হবে। ক্ষুদ্র আকারের একটি ভূমিকায় মণি সিংহ বলেছেন :

"আমাদের দেশে কমিউিনিস্ট এবং কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এই শতকের বিশের দশক থেকেই কমিউনিস্ট মতবাদে উদ্বুদ্ধ কর্মীরা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজ করে আসছেন। বিশের দশকের শেষ ভাগে তা আরো জোরদার হয়ে ওঠে।

"আমি বিশের দশকের শেষভাগ থেকে এই আন্দোলনে সাধ্যমত অংশগ্রহণ করেছি। প্রথমে শ্রমিক, পরে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ১৯৪৮-এর মার্চে আমাদের পার্টি, বর্তমান বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পর থেকে চেষ্টা করেছি পার্টির কাজ ও সংগঠন গুছিয়ে তুলতে। আজ আমি জীবন সায়াহ্নে

নেয়ার দায়িত্ব নিয়ে। আর এখানেই আমার মতো সূচনায় যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের জীবনের সার্থকতা।"

'জীবন-সংগ্রাম'-এ মণি সিংহ যেখানে তাঁর নিজের একটি স্বচ্ছল পরিবার থেকে বিপজ্জনক রাজনীতির পথে বেরিয়ে আসার কাহিনী বলেছেন, সেই বিশের দশকের শেষে তিনি প্রথমে কীভাবে দীক্ষা নিয়েছেন শ্রমিক আন্দোলনের, কলকাতায় মোটিয়াবুরুজে এবং পরে নিজের এলাকায় ফিরে এসে ময়মনসিংহের উপজাতি কৃষক, হাজং-গারোদের জীবনে আলো জ্বালবার, তাদের মূক-মুখে বাণী ফোটানোর ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করার কথা, সেখানে সে কাহিনী যেমন মহৎ, তেমনি রোমাঞ্চকর বলে আমাদের উজ্জীবিত করে তোলে। কিন্তু কেবল নিজের জীবনের সংগ্রামের আত্যন্তিক কাহিনী নয়। সেই সঙ্গে সারাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশ ও বিবর্তনের নানা তথ্য তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। এবং সে কারণে এ-গ্রন্থ কেবল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনীতে সীমাবদ্ধ না থেকে অবিভক্ত ভারতের এবং আমাদের পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের নানা দুর্লভ তথ্যে পূর্ণ একখানি দলিলের চরিত্র গ্রহণ করেছে।

মণিদার কথা মনে হলেই আমার নেত্রকোণা সারা ভারত কিষাণ সম্মেলনের একটি দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে আজ থেকে ৪০ বছর আগের কথা। আমি তখন ঢাকা ইউনিভারসিটির বিএ ক্লাসের ছাত্র। ১৯৪৫ সাল। আমার এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রবি গুহ। ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী। কমিউনিস্ট। তিনিই আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন নেত্রকোণার কৃষক সম্মেলন দেখতে যেতে।

নেত্রকোণাতে সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে বসেছিল। কৃষক এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সারা ভারত থেকে রাজনৈতিক নেতারা এসেছেন। কমরেড মুজাফফর আহমদ এসেছেন। লক্ষাধিক লোক জমায়েত হয়েছে বিরাট এক মাঠের মধ্যে। বাঁশ আর তালপাতা দিয়ে একটি শহরেরই যেন পত্তন করা হয়েছে। এই সম্মেলনের বিস্তারিত এবং সচিত্র বিবরণ আছে মণিদার 'জীবন-সংগ্রাম'-এর মধ্যে। আসলে সেই সম্মেলনের মূল সংগঠক ব্যক্তি ছিলেন মণি সিংহ। নেত্রকোণার কাছেই গারো পাহাড়। সেখানে হাজং কৃষকদের মধ্যে মণি সিংহের জীবনব্যাপী কাজ। বাংলাদেশের পার্বত্য উপজাতি হাজং গারো। আচার-আচরণে, বেশভূষা, ঐতিহ্য-সংস্কৃতিতে একেবারে যেন ভিন্ন একটি মানব গোষ্ঠী। সভ্যতার জটিলতার জালে এখনো জড়িয়ে পড়ে নি। সরল জীবনযাপন। মানুষের ওপর অগাধ বিশ্বাস। অবিশ্বাস কি বস্তু, তা তারা জানে না। সরলতার মূর্ত প্রতীক। এবং তাদের সেই সারল্যের সুযোগ নিয়ে সভ্য মানুষ, রাজা-জমিদাররা তাদের শোষণ করে এসেছে এতকাল। তাদের কাছ থেকে সেই আদ্যিকাল থেকে খাজনা আদায় করে এসেছে তাদের জীবনের

শস্যে। ধানে। জমিদারের তাতেই লাভ। কৃষক সমিতি আর মণি সিংহ আন্দোলন করেছেন সেই জুলুমের বিরুদ্ধে। পাহাড়ি কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা নেবে তো টাকায় নিতে হবে। ধানে নয়। তা থেকেই টংক আন্দোলন। সে আন্দোলনে কতো হাজং রমণী আর পুরুষ শহীদ হয়েছেন, জেল-জুলুম ভোগ কেরছেন। মণি সিংহ ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের রাজপরিবারের সন্তান। পাহাড়ি কৃষকদের জন্য সেই মণি সিংহ পরিত্যাগ করেছেন নিজের পরিবার-পরিজনকে, সেই 'রাজকীয়' সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর পরাক্রমকে। তাদের পক্ষ নিয়েছেন বলেই মণি সিংহের ওপর জমিদারের এবং সরকারের নির্যাতন নেমে এসেছে। হুলিয়া বেরিয়েছে তার গ্রেফতারের। এমনি ত্যাগ এবং সাধনার মধ্য দিয়ে মণি সিংহ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন পাহাড়ি সেই সরল কৃষকদের। কিন্তু হাজং কৃষকদের কাছে মণি সিংহের জনপ্রিয়তা যে কতো গভীর, তার যে প্রমাণটি আমি নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলনে পেয়েছিলাম, তার কোনো তুলনা নেই। সেই বিরাট কৃষক সম্মেলনের মধ্যে একটি ঘটনা সেদিন আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। ঘটনাটি আমার মনে সেদিন থেকে আটকে আছে। এখনো তা উজ্জ্বল।

বিরাট মাঠ। মাঠ ভর্তি কৃষক। দেশের দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে কৃষক প্রতিনিধির দল এসেছে। পাহাড়ি এলাকা থেকে এসেছে হাজং কৃষকের দল। একদিন বিকেলে মঞ্চ থেকে বড় নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছেন। আমি জায়গা নিয়েছিলাম মাঠের একটি কোণে। আমার সামনে ছিল একদল হাজং কৃষক। মঞ্চ থেকে নেতারা বক্তৃতা করছিলেন। কৃষকদের নানা সমস্যা নিয়ে। সমিতির শক্তির কথা বলছিলেন। তাঁদের অনেকের ভাষা হয়ত আমার সামনের হাজং কৃষকদের কাছে ছিল ঠিকমতো বোঝার ক্ষমতার উর্ধ্বে। তাই সকল বক্তৃতাতে তারা মন লাগাতে পারছিল না। এমন সময়ে মঞ্চে উঠলেন এক বক্তা। নাম ঘোষিত হল : মণি সিংহ বক্তৃতা করবেন। মণি সিংহ যে বড় রকমের ওজস্বিনী ভাষায় মন হরণকারী বক্তা, তা হয়ত নয়। কিন্তু আমার সামনে বসা হাজংদের মধ্যে আমি যেন হঠাৎ একটা আলোড়নের আভাস পেলাম। এতোক্ষণকার বক্তৃতায় তারা যদি বা শিথিলভাবে বসেছিল, একে অপরের সঙ্গে বক্তৃতার মাঝে আলাপও করছিল, কিন্তু মণি সিংহের নাম ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, হাজং কৃষকরা সকলে সোজা হয়ে বসলো। কেউ যদি মন লাগাতে দেরি করছেতো তার সাথি তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠছে। 'শোন্ শোন্ আমাদের মণি বেটা বলছে।'

'আমাদের মণি বেটা বলছে'—এই কথাটি আমার মনকে শিহরিত করে দিলো। 'আমাদের ছেলে মণি কথা বলছে, শোন তোরা শোন।' পাহাড়ি সরল হাজং কৃষকদের এই একটি মাত্র বাক্য মণি সিংহকে আমার কাছে রূপান্তরিত করে দিলো। বক্তাদের ওজস্বিনী বক্তৃতাকে আমরা নানাভাবে প্রশংসা করি। বাহবা দিই। হাততালি মারি। কিন্তু এমন প্রশংসার বাক্য কৃষক-জনতার কাছ থেকে আর কোন কৃষক নেতা লাভ করেছেন, আমার তা জানা নেই।

হাজং কৃষকদের মুখে উচ্চারিত এই কথাটি আমিই সেদিনই শুনেছিলাম। মণিদা শোনেন নি। তিনি তখন মঞ্চে বক্তৃতা করছেন। কিন্তু এমন সম্বোধন আনুষ্ঠানিকভাবে শোনার তাঁর প্রয়োজন ছিল না। হাজংদের মধ্যে জীবন-ত্যাগী সংগ্রাম করতে করতে তিনি হাজংদের সন্তানে পরিণত হয়েছিলেন। নিজের জীবন সায়াহ্নে সে-সংগ্রামের কাহিনী বলতে গিয়ে তাঁর 'জীবন-সংগ্রাম' তাই তিনি উৎসর্গ করেছেন টংক আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশে।

বছরখানেক আগে যখন মণিদা এর চাইতে সুস্থ ছিলেন, সেদিন তাঁকে দেখতে গিয়ে আমার এই ঘটনাটির কথাই সবচাইতে আগে মনে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপের মাঝখানে আমার স্মৃতিতে অম্লানভাবে আবদ্ধ এই ঘটনাটির কথা আমি সেদিন তাঁকে শুনিয়েছিলাম।

এই সঙ্গে তাঁকে হাজংদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। মণি সিংহ বলেছিলেন : সেই হাজংরা তো আজ আর নেই। রাজনৈতিক নানা কারণে অনেকেই তাদের এলাকা ত্যাগ করে চলে গেছে। মণিদার এমন কথাতে আফসোস ছিল। কিন্তু ব্যাপকতর রাজনৈতিক ভাঙা-গড়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কোনো এক ব্যক্তি বা একটি সংগঠনেরও অনেক সময় থাকে না। তবু মণি সিংহ একদিন এই সরল পার্বত্য মানুষদের মধ্যে যে জীবন চেতনার বীজ বপন করেছিলেন, তা ব্যর্থ হতে পারে না। হাজংদের চলে যাওয়ার কথায় আফসোস ছিল মণিদার। কারণ হাজংরাই ছিল সবচাইতে সচেতন পাহাড়ি কৃষক। কিন্তু সময়ের গতিতে যারা একদিন আন্দোলনের বাইরে ছিল, সেই গারো কৃষক, যারা আজো বাংলাদেশে আছে, তাদের মধ্যে চেতনার ঢেউ জেগেছে। আশার সুরে সেই গারোদের কথা বলতে গিয়ে মণিদা সেদিন বললেন, 'এই গারোরা এখন এগিয়ে আসছে। একটি গারো মেয়ে এলাকার সাংগঠনিক নেত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে।' ...

এবারেও মণিদার ৮৫ বছর পূর্তির দুদিন আগে তাঁর কাছে বসে পঁচাশি বছরের এই সংগ্রামী মানুষটির দিকে চাইতে চাইতে আমার কেবল মনে পড়েছিল, হাজং কৃষকদের সেই অন্তর-উৎসারিত স্নেহের সম্বোধনটির কথা : 'আমাদের মণি বেটা বলছে।' জনতার কাছ থেকে এমন স্নেহের সম্বোধন ক'জন কর্মীর ভাগ্যে জোটে? পক্ষাঘাতে চলৎশক্তিহীন এবং এককালের অবিরাম চলার মানুষ মণি সিংহের মুখের অম্লান হাসির অন্তরালের সম্পদের সন্ধান যেন এই বাক্যটিতে পাওয়া যায় : 'আমাদের মণি বেটা বলছে।' ...

৩০-৭-৮৫

'মানুষের মুক্তি আসিবেই'

ঢাকাতে বরিশালের যে ছেলেরা আছে তারা বলছিল : আপনি না গেলে মুকুলদা কারুর কাছে তাঁর জীবনের কথা বলবেন না। ছেলেদের কথাটি সত্য। 'মুকুলদা', মুকুল সেন—বরিশালের বিপ্লবী আন্দোলনের পঞ্চাশ বছরের অধিক কালের ইতিহাসের এক সচেতন কর্মী এবং সাক্ষী। বিশের দশকে যখন কিশোর, স্কুলের ছাত্র, তখনি তিনি যোগ দিয়েছিলেন সেখানের বিপ্লবী গুপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী দলে। তারই কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের বিচারে জেলের দণ্ড হয়েছে, আন্দামানের কালাপানির দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছেন। পরবর্তীকালে সাম্যবাদী গণআন্দোলনে বিশ্বাসী হয়েছেন। বরিশালের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু একেবারে ছোটখাটো, মৌনমুখ, মৃদু উচ্চারণে স্মিতভাষী মানুষটিকে দেখলে তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরসম স্নেহ। সেই দাবিতে আগের বার বরিশাল গেলে বলে এসেছিলাম : আমার কাছে আপনার জীবনের কথা বলতেই হবে। সে দাবিতে কোনো জবাব না দিয়ে চোখের সস্নেহ হাসিতে আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরেছিলেন।

এবার তাই ৯ নভেম্বর (১৯৮৫) তারিখে নিজের সব শারীরিক, পারিবারিক অসুবিধা উপেক্ষা করে বরিশাল গিয়েছিলাম মুকুলদার স্মৃতিচারণ সংগ্রহ করতে। মুকুলদার সে স্মৃতিচারণের কথা আর একদিন বলবো। কিন্তু বরিশাল গিয়ে পুণ্যবতী বিপ্লবী মনোরমা মাসিমার 'মাতৃমন্দির' দর্শন না করে ফিরে আসা যায় না। বরিশাল পৌঁছে পরের দিন গেলাম মাতৃমন্দিরে।

এই মাতৃমন্দিরের আবেগ ও অনুপ্রেরণাময় ইতিহাস বরিশালের বামপন্থী কর্মী মাত্রেরই জানা। মাতৃমন্দিরের কথা বললে যে-কোনো রিকশাওয়ালাই আপনাকে পৌঁছে দেবে মনোরমা বসুর প্রতিষ্ঠিত নিজের ভিটেতে মাতৃমন্দির বিদ্যালয়ে।

বিদ্যালয়ের পেছনে উঠানটিতে দুটি টিনের ঘর। তার একটিতে গিয়ে উঠে বসলাম তাঁর কাছে, মনোরমা মাসিমার কাছে। আজ আর তাঁর সঙ্গে দুবছর আগের মতো সোৎসাহ বাক্য বিনিময় চলে না। দুবছর আগে যখন গিয়েছি, তখন নিজের নাম বলতে হাত দিয়ে কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। বলেছেন : আরে চিনবো না? তোমরাই তো গড়বে। তোমাদের হাতেই তো দেশের ভাগ্য। তোমাদের ছাড়া এই স্কুল, এই বাড়ি আমি কাদের হাতে দিয়ে যাব? আজ আর তেমন করে প্রত্যুত্তরের ক্ষমতায় তিনি নেই। গত ১৭ নভেম্বর তাঁর বয়স হয়েছে ৯২ বছর। একেবারে ক্ষুদ্রকায় একটি মানুষ। মানুষ নয়, যেন জীবনপূর্ণ একটি পুতুল। কোনো দিনই হয়ত শরীরটি ভারি ছিল না। বাংলাদেশের গাছপালা, বন-বনানীর মতো সবুজ কিংবা কালো। আজ তা শুকনো বটে, কিন্তু প্রাণহীন নয়। জীবনের সলতে জ্বালিয়ে এখনো পাহারা দিচ্ছেন নিজের মাতৃমন্দিরকে, মানুষের, দেশের সুকুমার সন্তানদের সেবায় উৎসর্গিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে।

নিজের মনের কথা বলে চলেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস যারা জানে না, তাদের কাছে সে কথা অর্থহীন। কিন্তু যারা প্রায় শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামী, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার দীপবাহিকার জীবনের কথা কিছু মাত্র জানে, তাদের কাছে তাঁর অসংলগ্ন কোনো কথাই অর্থহীন নয়।

গেলবার যখন গিয়েছিলাম, উঠোনে রোদে বসানো 'পুতুলটি'র পায়ের কাছে বসেছিলাম, তখন মুখ থেকে একটি বাক্যই কেবল বের হচ্ছিল : 'হবে, একদিন হবে। আমি বলছি, হবে।' জীবনের জয়ের এমন বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করার আবশ্যক হয় না।

এবারের অনুক্ষণ উচ্চারিত কথার অর্থ ধরা হয়ত সহজ নয় কিন্তু যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয়িত হয়েছে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে গিয়ে কেবল বলতে : তোমরা জাগো, আমাদের দেশের মেয়েরা যদি না জাগে, যদি দেশের ভালো-মন্দের কথা না বলে তবে দেশের অর্ধেকই তো অন্ধকার। এবং এই বলার অপরাধে ব্রিটিশ শাসন থেকে শুরু করে পাকিস্তান, সব শাসনে যাঁকে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছে কারাগারে, যখন বাইরে থেকেছেন সভা-সম্মেলনে যোগাদানে, এমন কি গোপন আস্তানায় বিপ্লবী কর্মীদের আশ্রয়দানে যাঁর কোনোদিন বিন্দু পরিমাণ দ্বিধা আসে নি মনে, তাঁর অন্তর থেকে সচেতন-অচেতনভাবে নির্গত কোনো শব্দই কি অর্থহনি হতে পারে? এবং তাই কিছুক্ষণ কান পেতে থাকলেই শোনা যাবে, কথা থেকে কথান্তরে গেলেও তার মূলভূমি সমাজ, জীবন, জীবনের অগ্রগতি। কখনো বলছেন : ও ঘরে কে? শুয়ে আছে কেন? কোনো কাজ নাই না কি? আমি একদম সহ্য করতে পারিনে অসামাজিক কাজ। প্রশ্নের সূত্রে ও ঘরের দিকে চাইলে হয়ত কোনো লোকের দেখা পাওয়া যাবে না। আসলে মাসিমা এখন কথা বলেন, বাইরের দিকে চেয়ে নয়। কথা বলেন অন্তর্জগতের দিকে চোখ বুলিয়ে : অচেতন

চোখে স্মৃতির পাতা হাতড়ে। কখনো বলছেন : 'এত লোক এসেছে, খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হয়েছে তো?' যে কর্মী মেয়েটি সবসময়ে হাতের কাছে থাকে, তার নাম ইলা। গ্লাসে দুধ তৈরি করে হাতে ধরিয়ে দিল। দেখলাম, এবার কথাটি সঙ্গতিপূর্ণ হল। বললেন : কি করেছো, গরম জল? না গরম জলটি ও বেশ করে। নিজের হাতে গ্লাসটি মুখে ধরে দুধটুকু খেলেন। ঘরে, কাছে বসেছিল চৈতন্য স্কুলের তরুণ শিক্ষক ও কর্মী আশীষ দাশগুপ্ত। আর দরজার কাছে ক্ষণিকের মধ্যে এসে পা বিছিয়ে বসলো একটি কুকুর। ইলা তার মুখের কাছে একটি ছোট বিস্কুট ছুঁড়ে দিলো। কুকুরটি বিস্কুটটি হাতে ধরে নেয়ার মতো মুখে পুরে মাসিমার দিকে সকৃতজ্ঞ স্নেহভরা চোখে চাইতে লাগলো। ইলা বললো : এটা কোথাও যাবে না। ঘর ছাড়বে না। চিৎকার করবে না। কেবল মাসিমার দিকে নির্নিমেষ চোখের দৃষ্টি ফেলে পা বিছিয়ে বসে থাকবে।

পশুও প্রাণী। ওদের ভাষা আমরা পড়তে পারিনে। কিন্তু আর যাই হোক, মানুষের মধ্যে যেমন অকৃতজ্ঞ এবং কৃতঘ্নের সাক্ষাৎ মেলে, পশুর জগতে তেমন মেলে না। আজ মাসিমা অচেতন। কিন্তু যখন সচেতন ছিলেন, তখন এই পশুটির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেছেন। পশুটি সে কথা বিস্মৃত হয় নি। আজ মাসিমার শেষ মুহূর্তটিকে সে যেন তাঁর দেয়া স্নেহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই অহর্নিশ তাঁকে আগলে রাখতে চাচ্ছে জীবনের সব বৈরী আক্রমণের আঘাত থেকে। ব্যাপারটা ভাবতে মনে যথার্থই আবেগের সঞ্চার হয়।

মাসিমা ঘরের চৌকিটিতে বসে আছেন। সে চৌকিতে আরাম শয্যার কোনো ব্যবস্থা নেই। কোনোদিনই আরাম শয্যা তাঁর ছিল, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না।

সচেতন অবস্থাতেই বলেছেন, বরিশাল ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। এবং কলকাতায় নিজের মেয়ে, নাতি, নাতনির কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলেও তাদের জ্বালাতন করেছেন : 'আমায় তোরা পাঠিয়ে দে বরিশালে। বরিশালই আমার বাড়ি।' দুএক সময়ে কর্মীরা ঢাকাতে নিয়ে এসেছেন। আমার বাসায় এসেছেন। কিন্তু তখনো ঢাকার স্বামীবাগ বা কায়েৎটুলি কিংবা নবাবপুর মাসিমার কাছে বরিশালের কাউনিয়া, সদর রোড, আলেকান্দা, শঙ্কর মঠ বা ফকিরবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। কেবল বরিশালের রাস্তাঘাটের নাম মুখে। এখন এই ৯২ বছরে সে সংবিৎও লুপ্ত। শুনলাম, কয়েকদিন আগে কলকাতা থেকে নিজের ছোট মেয়েটি এসেছিল; কিন্তু তাকে চিনে স্নেহভরে যে কাছে ডেকে বসাবেন, সে অবস্থায় আর নেই।

মাসিমার গায়ে হাত বুলিয়ে ১১ তারিখে যখন মাতৃমন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন আশীষ বললো, চলুন আপনাকে বরিশালের শ্মশান-দীপালী দেখিয়ে আনি।

'শ্মশান-দীপালী' বা শ্মশান দেওয়ালি কথাটি আমার কানে নতুন ঠেকলো।

আশীষ বললো, এটি বেশ কিছুকাল ধরে বরিশালের একটি সাংস্কৃতিক ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালীপূজার সন্ধ্যায় শহরের প্রধান যে শ্মশান ঘাটটি, তাতে হাজার হাজার হিন্দু ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গিয়ে হাজির হয়। স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে। আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে জায়গাটি। রাত দশটা-এগারোটায় ঢুকতে পারবেন না, এত ভিড়। এখন সন্ধ্যার দিকে একটু দেখে আসুন।

আশীষকে সঙ্গে করে এসে শ্মশান ঘাটটিতে পৌঁছলাম। বরিশাল আমার কৈশোরের স্মৃতিময় শহর। দেখলাম, শ্মশানের দক্ষিণ পাশ দিয়ে খালের ওপারে এখন পরিত্যক্ত যে রাস্তাটি চলে গেছে কাশীপুরের দিকে, সেই রাস্তাটি আমার সেই পঁয়তাল্লিশ বছরের আগের সুরকি দেয়া রাস্তাটি, যে রাস্তা দিয়ে আমি ভোররাতে শহর থেকে রওনা দিয়ে হেঁটে সকাল আটটা না বাজতে ২০ মাইল দূরে আমার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে মাকে চমকে দিয়ে ডাক দিতাম। 'মা, আমি এসেছি।' মা'র অবাক বিস্ময়ে একটিই জবাব ছিল : 'হায় আল্লাহ, এত সকালে তুই এলি কী করে? শহরের মুরুব্বিরা ভয় দেখাতেন এই শ্মশানের। কিন্তু শ্মশানের ভয় কোনোদিন ঢোকে নি আমার মনে।

এবার ১১ নভেম্বর, এই প্রথম এসে ঢুকলাম বরিশালের সেই শ্মশান ঘাটটিতে এবং সত্যই মোহিত হলাম। সেকালে এই রেওয়াজটি হয়ত ছিল না। দেখলাম, এরই মধ্যে শত শত মানুষ এসে হাজির হয়েছে। সকলেই তাদের প্রয়াত মা, বাবা, বোন বা ঠাকুরমার স্মৃতির স্তম্ভটিকে লেপে-পুছে সুন্দর করেছে। তার চারপাশে মাটিতে একটির পর একটি করে মোমদীপের দণ্ড বা মাটির প্রদীপ বসিয়ে দিচ্ছে, সন্ধ্যার পরে তার প্রত্যেকটিতে আলো জ্বালিয়ে দেবে। সমাধি স্তূপের পাশে মিষ্টি, মণ্ডা, বাতাসা এনে রাখছে সমবেতদের হাতে তুলে দেবে বলে। প্রয়াত আত্মজনদের আত্মার সদগতি কামনা করবে বলে।

একটি ছোট্ট স্মৃতিস্তম্ভের কাছে নিয়ে এসে আশীষ বললো, এটি হচ্ছে মনোরমা মাসিমার স্বামীর স্মৃতিস্তম্ভ। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। দেখলাম, নামটি লেখা আছে একটি মার্বেল ফলকে। আশীষ বললো, এবার তো কোলে করেও মাসিমাকে নিয়ে এসে লাভ নেই। কিন্তু অন্যসব বছর এই দিনটিতে তিনি আসতেন।

দেখলাম, একটি যুবক সযত্নে স্তম্ভটিকে মোমবাতি দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। যুবকটি আশীষেরও অপরিচিত। আশীষ তাকে পরিশ্রমের জন্য মাসিমার নাম করে কয়েকটি টাকা দিতে চাইলে ছেলেটি সলজ্জভাবে বললো, 'না, না, টাকা কেন? আমি নিজেই এর খরচ দেব।' যুবকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করতে সে বললো : 'আমি মুসলমান।'

এই আমার কাছে আর এক চমক। মুসলমান যুবক হিন্দুসমাজের শ্মশান-দীপালীতে এসে অচেনা মানুষের স্মৃতিস্তম্ভকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিচ্ছে! সত্যি, জীবনে বেঁচে থাকার এবং আশা করার প্রতীকের কোনো অভাব নেই। কেবল এই যুবকটিই নয়। এর মতো আরো নিশ্চয়ই সঙ্গী-সাথি আছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও শ্মশান-দীপালীর অনুষ্ঠানে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাহিনী নিযুক্ত করা হয়েছে। মাইক থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। একটু ঘুরে ফেরার পথে দেখলাম, ৯৫ বছরের বৃদ্ধ, বরিশালের প্রখ্যাত প্রাণময় রাজনীতিক নেতা ও কর্মী দেবেন ঘোষ কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে শ্মশান-দীপালীর আয়োজনটির তদারকের জন্য এগিয়ে আসছেন।

'শ্মশান-দীপালী' নামটিও বেশ মনোরম। অনুষ্ঠানের তাৎপর্যের দিক থেকে মুসলমান সমাজের শবেবরাতের রাতে আত্মীয়-স্বজনদের কবরগাহে যাওয়া, প্রয়াত আত্মজনদের স্মৃতির স্মারকে আলো জ্বালানো এবং দরিদ্রের মধ্যে মিষ্টান্ন বা পয়সা বিতরণের অনুষ্ঠানের মিল রয়েছে।

শ্মশান-দীপালী দেখে আশীষের বাসায় এলাম। আশীষ বললো : প্রায় বছর দুই আগে, ১৯৮৩ সালে মাসিমা যখন সচেতন, তখন তাঁর জীবনের বাণী হিসেবে তাঁর কণ্ঠের কিছু কথা আমি রেকর্ড করে রেখেছিলাম। আপনি শুনবেন?

আমি আশীষের কথাটিতে যারপরনাই উৎসাহিত হলাম। বললাম, কেবল যে শুনবো, তাই নয়। আমার শব্দের যন্ত্রটি তো নিয়ে এসেছি। এটিতে মাসিমার কণ্ঠটি আমিও তুলে নিয়ে যাব।

সেই কণ্ঠটি আমি এখনো যখন বাজাই, তখন তার অন্তর্বাণীতে নিজের এই প্রৌঢ় বয়সেও অনুপ্রাণিত বোধ করি। আমি শুনতে পাই একটি বাঁশির মতো চিকন জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী আশার কণ্ঠে মনোরমা মাসিমা বলছেন :

"বাংলাদেশের আমার প্রিয় মা, বোন ও ভাইয়েরা! আজ আমি বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছিয়াছি। কেহ চিরদিন বাঁচিয়া থাকে না। আমিও থাকিব না। কিন্তু আজ প্রায় ৯০ বছর যে বাঁচিয়া আছি, তাহা কেবল আপনাদের সকলের আশীর্বাদে।"

"আমার সামান্য বুদ্ধি ও শক্তি লইয়া সাধ্যমতো আমি দেশের কাজ করিয়াছি। মানুষের মুক্তির, বিশেষ করিয়া নারীজাতির কল্যাণের ব্রত লইয়া লড়াই করিয়াছি। বহু বৎসর জেল খাটিয়াছি। এখন পর্যন্ত সেই কাজ সমাপ্ত হয় নাই। আজ আমাদের দেশ কিছুটা আগাইয়াছে। নারীরা অন্তত কিছুটা জাগিয়া উঠিয়াছে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে। মেয়েদের জন্য আরো অনেক কিছু করিতে হইবে। মেয়েদের সবচেয়ে বড় কথা স্বাবলম্বিতা। স্বাবলম্বী হওয়া। তাহাতে আমাদের মেয়েরা এখনো অনেক পিছাইয়া আছে। দেশে গোঁড়ামি, কুসংস্কার, ভেদাভেদ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি আছে। মেয়ে-পুরুষ উভয়কে আজ ইহার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।"

"বৃদ্ধ বয়সে আমার একবার রাশিয়া যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। আমরা যে ব্রত লইয়া দেশের কাজে নামিয়াছিলাম, রাশিয়ায় সেই সুন্দর ব্যবস্থা কায়েম হইয়াছে। রাশিয়ার প্রতিটি নারী-পুরুষ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তাহারা কেহ আণবিক যুদ্ধ চায় না। কেননা তাহারা মনে করে, যুদ্ধ মানেই ধ্বংস। ওরা সেই সম্পদ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাইতে চায়।

"আমার জীবনের শেষ বয়সে আপনাদের কাছে অনুরোধ করি, আসুন, আমাদের দেশেও ঐ রকম সুন্দর ব্যবস্থা কায়েম করি।

"মা-বোনেরা ও ভাইয়েরা! আমার জীবনে আমি অনেক উত্থান-পতন দেখিয়াছি। ভবিষ্যতেও হয়ত তাহা হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইবেন না। মানুষের মুক্তি আসিবেই। আজ আমার জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াছি। জনগনের মঙ্গল চিন্তা করিয়া মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। আমি না থাকিলেও উহা থাকিবে। আপনাদের সাধ্যমত উহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন। আমার সঙ্গী-সাথী অনেকেই আজ নাই। আমিও থাকিব না। আমি আজ আশীর্বাদ করিতেছি দেশের কাজে আপনারা সফল হউন, দেশের কাজে আপনারা নামুন। আমাদের জয় হউক।"

হাবীব ভাই ভোলেন নি

হাবীব ভাইয়ের আকস্মিক প্রয়াণে বেদনার্ত মনে দশ বছর আগে লেখা এই দিনলিপিটি তুলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। ১১.১০.৭৫ : ঈদের পরদিন দুপুরে খোঁজ করে করে হাবীব ভাইয়ের বাসায় গেলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ঈদের সালাম জানাতে। কবি আহসান হাবীব। আমার মুরুব্বির মতো। এখন থাকেন মগবাজারের একটি বাড়িতে। সারা জীবনই তিনি সাহিত্য এবং দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন। সাংবাদিক হিসেবে নয়। সাহিত্যিক হিসেবে। আন্তরিক বিশ্বাস, স্বভাব এবং আচরণগতভাবে কবি। নির্বিরোধী মানুষ। শান্ত স্বভাব। আলাপ করেন শান্তভাবে। কোনোদিনই হয়ত তাঁর কণ্ঠ কারুর সঙ্গে কোনো বিরোধ বা বিতর্কের উচ্চগ্রামে ওঠে নি। সুবিন্যস্ত থাকতে ভালোবাসেন। সুন্দর। ছিমছাম। কিন্তু আদৌ বিলাসী নন। অর্থাৎ পরিমিত। সবদিকেই যেন পরিমিতি। আদর-আপ্যায়নেও মনের আবেগপরিমিতির বাইরে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন। তাঁর বেশ কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। ছোট কিংবা বড়দের জন্য তাঁর গদ্যও বৈশিষ্ট্যময়। কাব্য-মাধুর্যমণ্ডিত। সে ভাষা এবং তাঁর আঁকা ছবিতে গ্রাম-বাংলার একটি বিলীয়মান কিংবা বলা চলে বিলুপ্ত রূপ যেন জীবন পায়। আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। এবং একটা আর্তির সৃষ্টি করে। আহা! এমনটি যদি হত! হাবীব ভাইকে আমি আত্মীয়সমান মনে করি। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আজকের নয়। সে প্রায় চল্লিশ বছর আগের পরিচয়। তাঁর সঙ্গে আমার ঘটনার স্মৃতি যে সংখ্যায় খুব বেশি, তা নয়। তবু স্বল্পসংখ্যক সেই ঘটনার স্মৃতি মনে স্থায়ী দাগ কেটেছে। এটা সাধারণত হয় না।

হাবীব ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কের কথা মনে করতে চাইলে, আমার সেই বরিশাল শহরের আলেকান্দার বটতলা মসিজদের পশ্চিম পাশের বাসাটির কথা মনে পড়ে। ওখানে থাকতেন আমার দুই আত্মীয়। একজন জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি,

ওফাজ উদ্দিন আহমদ সাহেব। তিনি শহরের অন্যতম উচ্চ বিদ্যালয় আসমত-আলী খান ইনস্টিটিউশন বা এ.কে. স্কুলের শিক্ষক। অপরজন আমার মেজ ভগ্নিপতি, জনাব আশরাফ আলী খান। তিনি ছিলেন একটি সরকারি অফিসের সহকারী। আমার মেজ ভগ্নিপতি আশরাফ ভাই সাহেব তখনকার সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন মুসলমান তরুণদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কারণ, তিনি নিজে যেমন সাহিত্যিক মনোভাবের ছিলেন, তেমনি এমন মুসলমান তরুণদের তাদের শিক্ষালাভের চেষ্টাকে এবং সাহিত্যিক প্রয়াসকে আন্তরিকভাবে সমর্থন ও সাহায্য করতেন। আহসান হাবীব সাহেব তখন বোধহয় ম্যাট্রিকুলেশন শেষ করেছেন। কলেজে পড়তেন। ১৯৩৪-৩৫ সালের কথা। আশরাফ ভাই সাহেব হাবিব ভাইকে বিশেষ স্নেহ করতেন। এখনো করেন। হাবীব ভাই আশরাফ ভাইয়ের বাসায় থাকতেন। আমি তখন হয়ত চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শ্রেণীতে বরিশালের মাইল আটেক দূরে রহমতপুর হাই স্কুলে পড়ি। আমার বড় ভাই মোঞ্জে আলী সাহেব সেখানকার সাবরেজিস্ট্রার। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ভুগতে ভুগতে আমি তখন খুব কাহিল। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য আমাকে রাখা হয়েছিল শহরে। এবং সেখানে হাবীব ভাইকে দেখেছিলাম। ঠিক এখন যেমন, তখনো বোধহয় তেমনি। আমার সঙ্গে তাঁর কোনো বাক্যালাপ হয়েছিল বলে মনে করতে পারিনে। নিশ্চয়ই তিনি মুরুব্বি হিসেবে আমাকে লেখাপড়ার দিকে মন দিতে বলেছিলেন। এমন ঘটনা মনে থাকার কথা নয়। আসলে তেমন কোনো ঘটনাই নয়। তবু এই স্মৃতিটি যে লোপ পায় নি, সেটিই আমার মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

তারপর তিনি কোথায় গেছেন, আমি তা জানতাম না। আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ১৯৪০ সালে। এবং ম্যাট্রিক পাসের পর কলকাতা না গিয়ে ঢাকায় এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছি। তখন থেকে ঢাকায়। ঢাকায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে ছাত্রজীবনে দুএক সময়ে দুএকটি প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা করতাম। তাকে পত্রস্থ করার মোহ যোগাতো মাসিক মোহাম্মদী, মাসিক সওগাত এবং শিশু সওগাত। এই সময়ে আমার কয়েকটি রচনা প্রকাশিতও হল মাসিক সওগাত এবংমাসিক শিশু সওগাতে। মাসিক সওগাতের সম্পাদক জনাব নাসিরউদ্দীন। তাঁর নামই পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছাপা হত। কিন্তু একটি পত্রিকা যে কেবল সম্পাদকই চালান না, এ-কথা তখন বুঝতাম না। বি এ পড়াকালে কিংবা বি এ পাস করে কলকাতা গেলাম বেড়াতে। মানে কলকাতার হাওড়া ব্রিজ আর ট্রামগাড়ি দেখতে। আমার মেজ ভগ্নিপতি আশরাফ আলী খান সাহেব তখন কলকাতায় চাকরি করেন। থাকেন ওয়েলেসলি স্কোয়ারের পূর্ব দিকে, একটি মেসে। সেই মেসের পাশেই ওয়েলেসলি স্ট্রিটের ওপরে, এসলামিয়া কলেজের দক্ষিণ দিকে সওগাতের অফিস। একজন সাহিত্যনবীশের শঙ্কা ও সঙ্কোচ নিয়ে সেই সওগাত অফিসে গিয়ে আবার পরিচয় হল কবি আহসান হাবীবের সঙ্গে। তিনি আমাকে দেখে বললেন : আরে তুমি না আমাদের সেই

ফজলুল করিম। তারপরে বললেন : সরদার ফজলুল করিম নামে তুমি ভারি ভারি প্রবন্ধ লেখ। সে প্রবন্ধ আমি ছাপাই আর ভাবি, এ নিশ্চয়ই কোনো দাড়িওয়ালা ভারি, গম্ভীর, দীর্ঘ, লম্বা পুরুষ। আমি তখন বুঝলাম, মাসিক সওগাত কেবল সম্পাদকই চালান না। চালান কবি আহ্‌সান হাবীবও, যাঁর নাম সওগাতের কোথাও মুদ্রিত হয় না।

আহ্‌সান হাবীব সাহেব এখন দৈনিক বাংলার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক। আজ আমাদের উভয়ের বয়সের ব্যবধান প্রায় মুছে গেছে। তিনিও সংসারী। আমিও সংসারী। তাঁর কন্যাটিকে তিনি সুপাত্রে পাত্রস্থ করেছেন। বড় ছেলেটি কলেজে পড়ে। আমার বড় মেয়েটিও কলেজে পড়া শুরু করেছে। আজ আমাদের পারস্পরিক সাক্ষাতে সংসারের সমস্যার কথা ওঠে। ওঠে ছেলেমেয়েদের অসুখ-বিসুখ, পড়া, না-পড়ার কথা। সময় আর পাইনে পরস্পরের কাছে গিয়ে বসতে এবং সংসারের বাইরের দুএকটি কথা বলতে। এ-জন্য মনে আফসোস জাগে। আর সেজন্যই ঈদের পরের দিন খুঁজে খুঁজে বের করলাম হাবীব ভাইয়ের বাসা।

ঈদের পরদিন। তাঁকে বাসায় পাব, তা ভাবি নি। কিন্তু পেয়ে গেলাম। আমাকে দেখে খুশি হলেন। বললেন : আরে তুমি! বাসা খুঁজে পেলে কেমন করে। এসো, বসো। আজ একটু রিলাকস্ করছি। স্ত্রী গেছেন ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে। শুধু বাসায় আছে পলিন।

পলিন তাঁর বড় ছেলে। স্বল্পভাষী, লাজুক। আমাকে এসে সালাম জানালো। একটু আলাপ করতে আমার একটি পাঠ্য বইয়েরও প্রশংসা করলো। তারপর আমার চায়ের আপ্যায়নে লেগে গেল। ...

বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমি এবং হাবিব ভাই কথা বললাম। মনের আদান-প্রদান করলাম। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধের জন্য আফসোস করলাম। বর্তমানের বহু অমীমাংসিত প্রশ্ন পরস্পরকে জিজ্ঞেস করলাম এবং বিগত পর্যায়ের কথা বললাম। সেই চেপে আসা শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের কথা। মাঝখানে তাঁর বন্ধু শিক্ষাবিদ সালেক সাহেবও এলেন। সালেক সাহেব শিক্ষক হিসেবে বিশেষ খ্যাত অনেকদিন সরকারি ল্যাবরেটরি বিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান সম্পর্কে সকলের বেশ ভালো ধারণা। আর তার পেছনে সালেক সাহেবের অবদান ছিল। এখন তিনি অবসর জীবন-যাপন করছেন। দুপুরে আমরা তিনজন একসঙ্গে খেলামও।

আলাপের মধ্যে হাবীব ভাই বললেন : করিম, তোমার মনে আছে, কলকাতায় আমার বাসায় তোমার সেই শেষবারের যাওয়াটির কথা?

আমি বললাম, শুধু যাওয়া নয়, আপনাকে বিপদে ফেলার কথা।

হাবিব ভাই বললেন : না, বিপদ তো আমার চাইতে তোমারই বেশি ঘটেছিল। আর তুমি আমার কাছে আসতে চাইলে আমি 'না' করতে পারি?

সে এক ছোটখাটো রোমাঞ্চকর ঘটনা বটে!

১৯৪৮-এর শেষ কিংবা ১৯৪৯-এর প্রথম। আমি তখন পুরোদস্তুর এবং বিপজ্জনক 'রাজনীতিক'। পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 'বিপ্লবী রাজনীতির' টানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারিটিও ছেড়ে দিয়েছি। পুলিশ আমাকে খুঁজছে। থাকছি পলাতক। 'আন্ডারগ্রাউন্ডে!' দিনের বেলা বেরুই না। রাতের অন্ধকারে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। রাজনীতির অবস্থা নিয়ে আলোচনা করি। সংগঠনের সিদ্ধান্ত ও ডাককে পোস্টারের ভাষায় দেয়ালে দেয়ালে উৎকীর্ণ করি। পূর্ব বাংলার সরকার বুঝতে পেরেছে। আন্দোলনগত রাজনীতির মূলে রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। সে পার্টি বেআইনি না হলেও, তার প্রকাশ্য চলাফেরা অসম্ভব করে দিল সরকারি পুলিশ। কোনো জায়গায় কোনো স্ট্রাইক হলে, মোর্চা বেরুলে সেখান থেকেই কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতাদের গ্রেফতার করতে শুরু করেছে। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে জিন্নাহ্ সাহেবের ঢাকা আগমন এবং তাঁর উক্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও স্ট্রাইকের পর সরকারি এই আক্রমণ অধিকতর তীব্র হল। উপযুক্ত আশ্রয় এবং খাদ্যের অভাবে আমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়লো। কিন্তু ঢাকা বা পূর্ববঙ্গের কোথাও নিশ্চিন্তে বসে একটু বিশ্রামের আর উপায় ছিল না। বন্ধুরা বললেন : তুমি কলকাতায় যাও। কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করে এসো। ওখানে কোনো বিপদ হবে না। আমরা দুএকটা ঠিকানা দিচ্ছি।

পরামর্শটা ভালো। তখনো কলকাতা-ঢাকার মধ্যে পাসপোর্ট প্রথার চালু হয় নি। কিন্তু কলকাতাতেও কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছে। কারণ, ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে সরকার-বিরোধী জঙ্গি সংগ্রামাত্মক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আমার ভরসা ছিল, আমি পূর্ববঙ্গের কর্মী। পশ্চিমবঙ্গে আমাকে কে-ই-বা চেনে আর সেখানে আমাকে হয়রানি কেনই-বা করা হবে? এই ভরসা নিয়ে, সাবধানে উত্তরবঙ্গ ঘুরে সীমান্ত পেরিয়ে আমি কলকাতা গিয়ে পৌঁছলাম।

কলকাতায় যে বন্ধুর বাড়িতে গেলাম, সেখানে খাওয়ার যদি-বা বন্দোবস্ত হল, থাকার বড় অসুবিধা দাঁড়ালো। সে পরিবারও ঢাকার উদ্বাস্তু পরিবার। একটা বাড়িতে অসংখ্য মানুষ। খাটের ওপরে-নিচে শুয়েও তাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না। আমার একটু অস্বস্তি লাগলো। আমি নিজেই তখন ভিন্নতর আশ্রয়ের সন্ধান করতে শুরু করলাম।

তখনো 'ইত্তেহাদ' কলকাতার বিশেষ চালু দৈনিক পত্রিকা। আবুল মনসুর সাহেব তার সম্পাদক। আহসান হাবীব সাহেব সেই পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের পরিচালক। এ-কথা আমি জানতাম। তাই 'ইত্তেহাদ' অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করলাম। তিনি তো আমাকে দেখে অবাক। এবং আমার কীর্তিকাণ্ড শুনে বিস্মিত। আমি বললাম : আমাকে রাতে থাকতে দিতে হবে। তিনি বললেন : তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। তুমি সংগ্রামী আদর্শে অনুপ্রাণিত। তোমাকে ও-

পথ থেকে ফেরাবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার ঐ পথে নেমে আসারও আমার শক্তি কোথায়? কিন্তু তুমি আমার বাসায় কয়েকদিন থাকবে, এটুকু আমি করতে না পারলে, আমারও তাতে দুঃখ কম হবে না।

হাবিব ভাই থাকেন তখন দক্ষিণ কলকাতার, বোধহয়, পার্ক এনিভিউ নামের রাস্তার একটি দোতলা বাড়িতে। আমি হাবিব ভাইয়ের আশ্রয় পেয়ে বর্তে গেলাম। মনটা নিরাপদ নির্ভয়ে খুশিতে ভরে উঠলো। কলকাতায় আমার কোনো রাজনীতিক কাজ নেই। আমি কেবল ঘুরে বেড়াই। কখনো চৌরঙ্গীর চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রেলিং-এ ভর করে চলমান জনতাকে দেখি। কখনো কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাতে বইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে হাঁটি। আমার মনে কোনো শঙ্কা নেই। ভাবছি, এমনভাবে আর কয়েকদিন থাকি। তারপরেই আবার ঢাকা ফিরে যাব।

হাবীব ভাই আর ভাবি, দুজনে থাকেন ভেতরের ঘরে। বাইরের ঘরে আমি। সে রাত্রিতে তিনি হয়ত পত্রিকা অফিস থেকে একটু সকালে ফিরেছিলেন। আমরা দুজনে কিছুক্ষণ আলাপ করলাম। দেশের অবস্থা এবং সাহিত্যের অবস্থা নিয়ে। আমি একটি প্রবন্ধ তৈরি করেছিলাম তখনকার পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের ধারা-উপধারার ওপর। সাহিত্যের একটা অংশে যে জায়গায় যৌন আবেগের আমদানি করা হচ্ছে, তার কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখাটি তৈরি হয়েছিল। কোথাও প্রকাশিত হয় নি। পাণ্ডুলিপির আকারে লেখাটি দেখে হাবীব ভাই লেখাটির বেশ প্রশংসা করলেন। তারপরে আমরা শুয়ে পড়লাম।

রাত তখন হয়ত দুটো কিংবা তিনটে। হঠাৎ হাবীব ভাইয়ের দরজায় আঘাত। অস্বাভাবিক আঘাত। তাঁর বাড়িতে এমন আঘাত কখনো পড়ে নি। কিন্তু গভীর রাতে দরজায় এমন আঘাতের সঙ্গে আমি ইতোমধ্যে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছি। কাজেই এ শব্দের তাৎপর্য বুঝতে আমার বিলম্ব হল না। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে এবার আগন্তুকরা রূঢ় গলায় বলে উঠলো : আমরা পুলিশের লোক, দরজা খুলুন।

আমি বুঝলাম, এবার আর এড়ানো যাবে না।

হাবীব ভাই আমাকে ভেতরের ঘরে দিয়ে সামনের ঘরে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের বাহিনী ঘরে ঢুকে পড়লো। আমার হাতে কিছু রাজনীতিক কাগজপত্র ছিল। সেগুলো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেও, বিপদ যে এড়ানো যাবে, এমন ভরসা হল না। দ্বিতল বাসা, সিঁড়ি বৈ নিষ্ক্রমণের আর কোনো পথ নেই। আর থাকলেও তা নিশ্চয়ই পুলিশ বাহিনী ঘেরাও করে রেখেছে। আমার আফসোস হল, হাবিব ভাইয়ের জন্য। নির্বিরোধী মানুষ তিনি। তাঁর কোন বিপদ হয় কে জানে?

ভেতর-ঘর থেকেই শুনলাম, পুলিশের ইন্সপেক্টর বলছেন : আমরা খবর পেয়েছি, আপনার এখানে পলাতক রাজনীতিক নেতা আছে। পলিটিক্যাল এ্যাবসকনডার আছে।

হাবিব ভাই বললেন : না, আমার এখানে সেরকম লোক কেন থাকবে? তেমন কোনো লোক তো নেই এখানে।

পুলিশ বললো : আপনার বাসায় কে কে আছে?

হাবিব ভাই বললেন : আমার স্ত্রী আছেন, আর একজন গেস্ট আছেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর বললো : আমরা গেস্টকে দেখবো।

হাবিব ভাই পুলিশের এ-কথায় অসহায়ভাবে ভেতরে এসে বললেন : এখন কী করবে?

আমি বললাম : ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

আমি পুলিশের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পুলিশ যেন একটু অবাক হল। তারা আমায় জেরা করতে শুরু করলো :

: আপনার নাম কি?

: আমার নাম ফজলুল করিম।

: আপনার বাড়ি কোথায়?

: আমার বাড়ি বরিশাল।

: আপনি কি করেন?

: আমি কলেজে পড়ি।

: কোন কলেজে?

: চাখার কলেজে।

: কী পড়েন?

: আই এ পড়ি।

: এখানে কেন এসেছেন?

: বেড়াতে এসেছি।

এমনি ধরনের প্রশ্ন এবং উত্তর। পুলিশের ইন্সপেক্টর তার প্রশ্নের কোনো জবাবকেই অস্বাভাবিক ভাবতে পালেন না। আমাকে আপাদমস্তক আর একবার নিরীক্ষণ করে তিনি হতাশার সুরে বলে উঠলেন : 'না। এ নয়। হি মাস্ট বি সামবডি এলস্। সে নিশ্চয়ই আর একজন। কোনো এক সরদার। পূর্ববঙ্গের বড় কমিউনিস্ট নেতা। ঢাকার। ঢাকা থেকে এসেছেন। সে খবরই আমরা পেয়েছি। এ-লোক নয়।' এই বলে ঘরের ভেতরটা আর একটু দেখে ইন্সপেক্টর দলবল নিয়ে চলে গেলেন। ভাগ্যে আমার দেহটি ক্ষুদ্রাকার এবং 'সরদার'-এর সঙ্গে একেবারেই বেমানান ছিল।

এই সমস্ত রাজনীতি করলেও, আমি আসলে সরল মানুষ। তা না হলে আমার বোঝা উচিত ছিল,, হিন্দুস্তান-পাকিস্তান হলেও বিপ্লবী সমালোচনামূলক রাজনীতি এবং রাজনৈতিক কর্মী সম্পর্কে উভয় সরকারের একই দৃষ্টিভঙ্গি। এবং এ-ক্ষেত্রে এক সরকার অপর সরকারকে রাজনৈতিক কর্মীদের ধরিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে বিনা অনুরোধে তৎপর। এ-কারণে আমার ঢাকা থেকে আগমনের বার্তাটি

কলকাতা পুলিশের পেতে যেমন বিলম্ব হয় নি, তেমনি কলকাতায় তারা আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখতেও কসুর করে নি। কলকাতাতেও আমার ওপর সরকারি এমন তৎপরতা আমি আমার সারল্যের কারণে আশঙ্কা করি নি। তাই কখনো পেছন ফিরে দেখিও নি, ছায়ার মতো কোনো প্রাণী আমাকে অনুসরণ করছে কি না।

বিপদটা সে-রাতে কানের পাশ দিয়ে কোনো রকম কেটে গেল। রাত পোহাতেই আমি হাবীব ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম।

তাঁর বাসায় আমি গ্রেফতার হলে তাঁকেও নিশ্চয়ই কোনো বিপদ কিংবা ঝামেলায় পড়তে হত।

পরের রাতেই বোধহয় আবার কলকাতা ছেড়ে ঢাকার পথে যাত্রা করি। তারপরে ঢাকা ফিরে এসে কিছুকাল ছিলাম ঢাকার গ্রামাঞ্চলে, কৃষকদের মধ্যে : ঢাকার চালাক চর, পোড়াদিয়া, সাগরদি, হাতিরদিয়া অঞ্চলে। এবং ১৯৪৯-এর ডিসেম্বরে ঢাকা শহরে এলে তাঁতিবাজারের একটি আস্তানায় কয়েকজন বন্ধুসহ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে যাই। তখন থেকে আমার কারাবাস। দীর্ঘদিনের। ...

এই কাহিনীরই টুকিটাকির স্মৃতিচারণ করতে করতে কখন যে বিকেল চারটে বেজে গেল, টের পাই নি। চারটের দিকে হাবীব ভাইকে বললাম : আজ উঠি : বলে তাঁকে সালাম দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'

এই শিরোনামটি আমায় বেশ টানে। শিরোনামটি ব্যবহার করেছিলেন ১৯৪৭ সালের পরবর্তী পরিস্থিতিতে ঢাকা থেকে পশ্চিমবঙ্গে গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই এককালীন প্রখ্যাত ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপকবৃন্দ : অধ্যাপক সত্যেন বসু, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, কবি বুদ্ধদেব বসু, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গবেষক-অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, এঁরা। এঁরা কলকাতাতে একাধিকবার নিজেদের সম্মিলনীতে মিলিত হয়েছেন। তাঁদের এককালের হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ শিক্ষা ও সৌহার্দ্যের প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্মরণ করেছেন। তাঁদের সেই স্মৃতিচারণকে সঙ্কলিত করেছেন 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামের স্মৃতি সঙ্কলনে।

আকস্মিকভাবে সঙ্কলনটির সাক্ষাৎ ঘটেছিল আমার সঙ্গে। ঘটেছিল একালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অগ্রজপ্রতিম, একটি মহৎ ঐতিহ্যের বাহক, ১৯৭১-এর শহীদ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার কন্যা মেঘনার সূত্রে। তার কাছ থেকে সঙ্কলনটি পেয়ে তা পাঠ করতে করতে আমিও চলে গিয়েছিলাম 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর রোমান্টিক পরিমণ্ডলে।

ছায়া ঢাকা প্রায় নির্জন রমনার রাস্তা। সলিমুল্লাহ আর জগন্নাথ হল থেকে যে রাস্তাটি পূর্বমুখো চলতে চলতে হারিয়ে গিয়েছিল বিরলভবন এবং সবুজ গাছগাছালি আর মাঠ-ময়দানে ভরাট পুরনো পল্টনের এলাকায়, তারই পশ্চিম প্রান্তে ছিল ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের দীর্ঘদেহ দ্বিতল ভবনটি। সেটি পরিবর্তিতভাবে হলেও এখনো বর্তমান। পুরনো মানুষের মনে সে ভবন পুরনো স্মৃতির জাগরণ ঘটায়। এখন এটির পরিবর্তিত নাম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতাল। কিন্তু তখন এটিই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন। কলাভবন তো বটেই। এর পূর্ব

মাথায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি। এক পাশে রেজিস্ট্রারের অফিস। ওপরে-নিচে কলা, কমার্স আর আইনের ক্লাস। একেবারে গোড়াতে, সেই ১৯২১-২২-এ সলিমুল্লাহ হলেরও বাসভবন ছিল এই দালান। পরবর্তীকালে ফজলুল হক হলেরও। তারই কাছে, ছাত্রদের খেলার মাঠ আর জিমনাসিয়ামের ওপাশে কার্জন হল। এবং ঢাকা হলের ছাত্রদের বাসভবন ঢাকা হল। টাউনে কোনো কোনো অধ্যাপক যে থাকতেন না, তা নয়। কিন্তু বেশির ভাগই থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিভিন্ন ভবনগুলোতে, রমনাতে। রমনার নীলক্ষেতের নির্জন সড়কের এ-পাশ ও-পাশের একতল কি দ্বিতলের ভবনগুলোতে।

এ পরিবেশের আভাস আমার মতো ছাত্র, যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, ১৯৪০ কি ১৯৪২ সালে, তারাও কিছুটা পেয়েছিল। আমার নিজের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিজ্ঞান সাধক সত্যেন বসুর গবেষণাগার আর তাঁর বাসভবনটি। তাঁর গবেষণাগারটি ছিল কার্জন হলের মূল ভবনের পশ্চিম পাশটিতে নিচের তলাতে। সেখানে তিনি রাত-দিন নিজের চিন্তা আর গবেষণার জগতে বাস করতেন। দিনের বেলাতেও অন্ধকারপ্রায় সে ঘরটিতে আলো জ্বলতো। সে আলোর আভাস ভবনের পাশ দিয়ে যাতায়াত করা বিজ্ঞান-অবিজ্ঞানের সকল কিশোর ছাত্রছাত্রীকে রহস্যের হাতছানি দিয়ে ডাকতো। কেবল দূর থেকেই নয়, সত্যেন বসু যখন কাছে এসে দাঁড়াতেন, তাঁর সেই নাতিদীর্ঘ, একটু ভারি দেহটি নিয়ে, তাঁর পুরু লেন্সের চশমার পেছনের দুটি অপার কৌতূহলী চোখ আর মাথার বিরল রেশম-কেশের গুচ্ছ নিয়ে, তখন সেই কাছের দেহটিও আমাদের যেন নিয়ে যেত জ্ঞানের কোনো এক দুর্গম দুর্গে হাতছানি দিয়ে।

নানা গল্প ছড়িয়ে ছিল এই সেত্যন বসু স্মপর্কে। নাইতে-খেতে তিনি ভুলে যেতেন। থাকতেন তাঁর গবেষণাগারের অদূরে, বর্তমানের মোকাররম বিজ্ঞান লাইব্রেরির কোনাতে যে লাল টালির ভবনটি ছিল, সেই ভবনটিতে। ছেলেমেয়েরা খাওয়ার সময়ে ডেকে নিত তাঁকে ল্যাবরেটরি থেকে। একদিন নাকি তাঁর কিশোর ছেলে স্কুলে গিয়ে অকারণে আনন্দে টগবগ করছিল। সহপাঠীরা প্রশ্ন করলো : কিরে, তোর যে আজ এত খুশি খুশি ভাব? সত্যেন বসুর ছেলে অসঙ্কোচে আর গর্বের সঙ্গে জবাব দিল : খুশি হব না? বাবা আজ চেয়ে ভাত খেয়েছেন। গল্প ছিল আরো। মেয়ের আবদারে মেয়েকে সিনেমা দেখাবেন বলে ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে গেছেন মুকুল সিনেমা হলে, একেবারে দূরে সদরঘাটের কাছে, কোর্টের উল্টো দিকে। সিনেমার টিকেট কাটতে গিয়ে দেখেন, ভুলে টাকাই আনেন নি, ফেলে এসেছেন মানিব্যাগটি নিজের পড়ার টেবিলে। মেয়েকে বললেন, তুই একটু দাঁড়া, আমি ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে নিয়ে আসছি টাকা। এই ইচ্ছা নিয়ে ফিরে এলেন বাসায়। মানিব্যাগটি তুলতে যাবেন তো নজর গেল, অঙ্কের যে প্রবলেমটি মনকে অনুক্ষণ নাড়া দিচ্ছিল, সমাধান না পাওয়া সেই অঙ্কটির দিকে। মুহূর্তে চলে

গেলেন ভিন্নতর এক জগতে। বিস্মৃত হলেন সিনেরমার দরজায় অপেক্ষমান কন্যাকে। মগ্ন হলেন অঙ্কের সমাধানের অন্বেষণে। মিনিটের পরে মিনিট যায়। ঘণ্টা পার হয়। দরজায় অপেক্ষা করছে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান। তার কাছেও কি বোস সাহেব অপরিচিত? কিন্তু বোস সাহেবকে ডাকবে, এমন তার সাহস কোথায়? অবশেষে, বোস সাহেব যখন আর বেরুনই না, তখন বোস সাহেবের মেয়ের বিপদের আশঙ্কায় সাহস করে ডাক দিলো :

বাবু, যাবেন না মুকুলে? আপনি আপনার মেয়েকে রেখে এসেছেন। সংবিৎ ফিরে পান বিজ্ঞানী আর দার্শনিক বোস। সঙ্কোচে বিব্রত হন। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন : তাইতো, দেখ কী কাণ্ড! চলো, চলো।

সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন তখনকার তরুণ শিক্ষক কাজী মোতাহার হোসেন। ছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ছিলেন বাগ্মী দর্শন অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য। এঁদের আমি নিজে দেখেছি। তাঁদের সাহচর্যে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। এঁদের সকলের বিষয়ের আমি ছাত্র ছিলাম না। তবু নিজেকে সকলেরই ছাত্র গণ্য করে গর্ববোধ করেছি। ছিলেন ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার। তাঁকে হয়ত নিকট থেকে তেমন দেখি নি। তবু যখন তাঁর 'জীবনের স্মৃতিদীপে' পাঠ করি, তখন তিনি যেন তাঁর অকপটতা আর অনুসন্ধিৎসার সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমার মনের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠেন।

হ্যাঁ, অকপটই। তাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গোড়ার কাহিনী বলতে গিয়ে বলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্বনামখ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা তার কর্ণধার সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সন্ত্রস্তবোধ করেছিলেন। এটাই স্বাভাবিক। সারা বাংলায় যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের অধিকার বিস্তারিত, তার সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানের ওপর আঘাত আসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে এবং যে সম্প্রদায় কালক্রমে অনিবার্যভাবে শিক্ষা পাবে অধিক এই প্রতিষ্ঠানে, সে হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়। অবচেতন মনে সে চিন্তাও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন নি হয়ত আশুতোষ মুখার্জী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়। বিজ্ঞ বিচারপতি এটা জানতেন, শিক্ষার আলো একবার জ্বললে সে দীপ থেকে দীপে প্রজ্বলিত হবেই। সে ছড়িয়ে পড়বে। সমাজের এ-কোণ, ও-কোণ, সব কোণে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি অনিবার্য। কিন্তু অবচেতন মনের সেই অনীহা আর বিরোধিতা কি তিনি একেবারেই গোপন করে রাখতে পেরেছিলেন? না, পারেন নি যে সে কথাই বললেন তাঁর স্নেহধন্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাঁর সুপারিশে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার। নিজের জীবনদীপের নির্বাণোন্মুখ কালটিতে বললেন :

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা প্রায় সাত বছর পূর্ণ হবে, এমন সময় ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হল। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয় বটে কিন্তু পূর্ব বাংলার বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের মধ্যে একটি আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইংরাজ সরকার এই বলে তাদের আশ্বাস দিলেন যে পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। মুসলমানরা এতে খুবই খুশি হলেন বটে, কিন্তু হিন্দুদের মনে অষন্তোষ দেখা দেয়। তাঁরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। সাধারণত যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতেন, তাঁরাও এবার এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন রাসবিহারী ঘোষ এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের প্রধান যুক্তি হল এই যে প্রশাসনক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার বদলে এমন সাংস্কৃতিক বিভাগ হচ্ছে। ফলে, এতে আরো গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমেই এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে, বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হিন্দুদের এই বলে আশ্বাস দিলেন যে তাদের এমন আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। কারণ ঢাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে তার ক্ষমতার এবং অধিকার ঢাকা শহরের দশ মাইল পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই সঙ্কীর্ণ পরিধির বাইরে সমগ্র পূর্ববাংলা আগের মতোই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে এরপর এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই সময় থেকে ভারত সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ বা তারও কিছু বেশি টাকা আলাদা করে রেখে দিতেন।

"প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আরো কয়েকটি কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে অনেক দেরি হয়। এ সম্বন্ধে স্যার আশুতোষের কাছে একটি খবর শুনেছিলাম, যা এখনও সাধারণের অজানা। সে-কথাটি এখানে লিখে রাখছি। একদিন বিকালে সেনেট হাউস থেকে বাইরে আসছি, দেখি স্যার আশুতোষ তাঁর গাড়িতে উঠছেন। আমাকে ডেকে বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে।' আমি তখন ভবানীপুর থাকি। গাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। পথে স্যার আশুতোষ অনেক বিষয়ে অনেক কথা বললেন; এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে খবরটি আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। স্যার আশুতোষের কথা তাঁর নিজের ভাষাতেই সংক্ষেপে বলছি : 'একদিন হাইকোর্টে গেছি, এমন সময় বড় লাটের বাড়ি থেকে জরুরী মার্কা এক চিঠি পেলাম। খুলে দেখি বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী লিখেছেন যে, হাইকোর্ট থেকে ফেরার পথে আমি যেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে যাই। চিঠিতে যে সময় লেখা ছিল, ঠিক তখনই আমি গেলাম যাওয়া মাত্রই প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাকে একেবারে বড়লাটের কামরায় নিয়ে গিয়ে এবং সেখানে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। বড়লাট ঘরে ঢুকে দুএক কথার পরেই আমাকে বললেন, "দেখো, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তোমরা খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করছ। এ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা করবোই। কিন্তু আমি গোলমাল ভালোবাসি না। এই বিরোধী দলের মধ্যে যে তুমি একজন প্রধান, তা আমি জানি এবং তোমার প্রতিবাদকে আমি ভয় করি। তুমি তো জানো আমি কূটনীতি বিভাগে ছিলাম। কাজ উদ্ধারের রীতি আমার ভালোই জানা আছে। তোমাকে আমি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করছি—তোমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কী পেলে তুমি এই প্রতিবাদ বন্ধ করতে রাজী আছো? আমি এর জন্য যথাযথ মূল্য দেবো।" হঠাৎ এই প্রস্তাব শুনে আমি প্রথমে কিছুই স্থির করতে পারলাম না। কিন্তু বড়লাট চাইলেন যে আমি যেন তখনই এর একটা জবাব দিই; বাইরে গেলে অন্য লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে হয়ত আমার মতিগতি বদলে যেতে পারে। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলাম কী বলি! তখন তিনি আবার বললেন যে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হবেই। কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলে এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু করে নিতে পার। তখন আমি বললাম, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব না, যদি ভারত সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করেন। বড়লাট তখনই এতে রাজী হলেন। বললেন, তাই হবে। তোমার সঙ্গে আমার এই-যে কথাবার্তা হল এটি আমার দপ্তরে ঢাকা প্যাক্ট বলে লেখা থাকবে।' এই কাহিনী শেষ করে স্যার আশুতোষ বললেন যে, "এভাবে আমি চারটি অধ্যাপকের পদ পেলাম—Carmichael Professor of Ancient Indian History and Culture, Minto Professor of Economics, George V Professor of Philosophy এবং আর একটি বোধহয় Hardinge Professor of Mathematics" (রমেশচন্দ্র মজুমদার : জীবনের স্মৃতিদীপে পৃ. ৪২-৪৩ : ১৯৭৮)।

আমাদের 'সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর সত্যেন বসুর কথা বলেছি। আমার বহুদিনের ইচ্ছা, তাঁর জীবন সম্পর্কে আরো কিছু জানি। তাই এ-কালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাহেবের অনুমতি নিয়ে খোঁজ করে বের করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিরত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ব্যক্তিগত নথিটি। গায়ে ধুলো মাখা, ছিন্নবিচ্ছিন্ন সে নথির মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত সব কিছু যে পেয়েছি, তা নয়। তবু যা পেয়েছি, তা নিয়েও তাঁর একটি অনুপ্রেরণাদায়ক পরিচয় তুলে ধরা যায়। কিন্তু সে চেষ্টা আজ নয়। আজ কেবল উল্লেখ করব, সত্যেন বসুকে দেয়া বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেটের জার্মান কপিটি নথিতে পাওয়া গিয়েছিল। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নাকি বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব নামে পরিচিত। বিজ্ঞানের সেই তত্ত্ব বা এই কথার সত্যাসত্যের মধ্যে যাওয়ার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিকস্-এর রিডার সত্যেন বসু যে আধুনিক বিশ্বের অন্যতম বিজ্ঞান সাধক আলবার্ট আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁর অধীনে গবেষণাকর্মে নিবদ্ধ হয়েছিলেন—একথা এতকাল পরেও

আমার নিজের মনে একটি রোমাঞ্চ আর গর্ববোধের সৃষ্টি করে। জার্মান নয়, সত্যেন বসুকে আইনস্টাইনের দেয়া সেই সার্টিফিকেটের ইংরেজি অনুবাদটি আমার এক জার্মান ভাষাজ্ঞাত বন্ধুর কাছ থেকে তৈরি করে এখানে তুলে দিচ্ছি। সত্যেন বসু তখন ৩২ বছর বয়সের একজন তরুণ শিক্ষক ও গবেষক।

Berlin : 16.11.26
The prevaing works of Mr. S. N. Bose, especially his 'Theory of Radiation-equilibrium' signifies, I believe, an important and lasting avdvance of the theory of physics. Also from the personal intercourse with Mr. Bose I have got the impression that he is man of extordinary talent and profoundness, from whom the science has much to expect. He possesses also an extensive knowledge and undoubted ability in our science. As university teacher he will surely unfold a successful and prosperous career.

Sd/-A. Einstein

আমাদের এ-কালের ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকরা কি এইসব মহৎ ঐতিহ্যের বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৈরি করতে পারেন না এমন একটি সঙ্কলন, যার নাম হবে : 'আমাদের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'? ঢাকা ইউনিভারসিটি বা হিস্টরি অব ঢাকা ইউনিভারসিটি নামে দুই-একখানা গ্রন্থ যে তৈরি না হয়েছে, তা নয়। কিন্তু তাতে ঐতিহ্যের এই বোধটি পাওয়া যায় না, তাতেই আমার দুঃখ।

১৮.১.৮৫

ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতির উদ্দেশে

ইতিহাসকে পাঠ না করলে এবং বারংবার পাঠ না করলে, ইতিহাসকে দিয়ে কথা না কওয়ালে ইতিহাস কথা কয় না। তেমন হলে ইতিহাস শুয়ে থাকে। এবং তার নিশ্চেতন লাশের সমান দেহের উপরে বিকৃতি এবং বিস্মৃতির পলেস্তারা পড়তে পড়তে ইতিহাস অজানার গভীর থেকে গভীরে বিলুপ্ত হতে থাকে।

ইতিহাসকে দিয়ে কথা কওয়াতে চেয়েছিলেন অবিস্মরণীয় একটি মানুষ। তাঁর নাম হাসান হাফিজুর রহমান। যে হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর সেকালের সাথী যুবলীগের মুহম্মদ সুলতানের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন '২১-এর প্রথম স্মৃতিবার্ষিকীতেই 'একুশের সংকলন'। একুশের স্মৃতির একটি অতুলনীয়, সাহসী এবং মহৎ আকর গ্রন্থ। হাসানের আর এক অমর কীর্তি : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র নামে ১৫ খণ্ডের দলিল ভাণ্ডার বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করার কীর্তি। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'-এর সেই আকর-সংকলনের যে কোনো খণ্ডকে হাতে নিলে হাসানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে ওঠে। তখন নিজের মনেই উচ্চারণ করি : ভাগ্য আমাদের যে হাসান নিজের জীবনপণ করে সংগৃহীত তথ্য থেকে নির্বাচিত তথ্যের এই সংকলন গ্রন্থ তৈরি করেছিলেন। এবং যথার্থই এ ব্রত পালন করতে গিয়েই অসুস্থ শরীরের কর্মী হাসান হাফিজুর রহমান জীবন দান করেছেন। এবং এ দিক থেকে হাসান কেবল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম বিপ্লবী, সংগ্রামী ও সাহসী পথিকৃৎ কবি ও সংগঠক নন, হাসান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ শহীদের মধ্যে আর এক শহীদ।

স্বাধীনতার দলিলপত্র কোনো ইতিহাস নয়। কিন্তু যে সচেতন উদ্যোগ, বাংলাদেশের মূল সত্তার চেতনাসমৃদ্ধ গবেষণা ও নির্বাচনের ভিত্তিতে ১৫ খণ্ডের এই সংকলন হাসানের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল, সে যতই অপূর্ণ হোক, ১৯৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত বাঙালি জাতির চেতনা—সংগ্রামের বিকাশের একমাত্র

আকর—গ্রন্থ। প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা ও সরকারের কাছ থেকে এই কর্মের জন্য হাসান পেয়েছেন ও পাচ্ছেন বিস্মরণ এবং অকৃতজ্ঞতা। তাই হাসানের কথা মনে পড়লে সহোদর-সব হাসানের জন্য মমতায় আমার মন ভরে ওঠে। মাত্র ৪০০০ কপিতে মুদ্রিত 'বাংলাদেশের স্বধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'র সেই সংকলনগ্রন্থ আজ নিষিদ্ধ গ্রন্থের মতো একেবারে দুষ্প্রাপ্য। সংকলনের বাইরে যে তথ্যাদি অমুদ্রিত ছিল সে তথ্যসম্ভার নিরুদ্দিষ্ট এবং বিনষ্ট। মুদ্রিত সংকলনেরও আর কোন পুনর্মুদ্রণ ঘটেনি এবং অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে, আমাদের সস্তা সামাজিক—রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে আশা রাখার কোন উপায় রাখছে না।

কত বন্ধুকে বললাম, কত মহলকে, স্বাধীনতা যুদ্ধের এই সংকলন গ্রন্থের পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করার তাঁরা উদ্যোগ নিন। এই সংকলনগ্রন্থমালার পুনর্মুদ্রণের তাঁরা উদ্যোগ নিন এবং তাকে পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করে তুলুন।

কিন্তু সে কামনা আমার নিষিদ্ধ কামনার মতো অপূর্ণই রয়ে গেল। অথচ কতো আমাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কত অর্থের ব্যয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৬ই ডিসেম্বর কত না অনুষ্ঠানের আয়োজন।

কিন্তু আজ আমি হাসান সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব না। তাঁকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি আজ আবার হাসানের সংকলিত দলিলপত্রের প্রথম খণ্ডটি হাতে নিয়ে তার নির্বাচিত তাৎপর্যপূর্ণ দলিল ও তথ্যের জন্য হাসানের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। তার কথা উচ্চারণ করার জন্যই এই রচনাটির চেষ্টা।

দলিলপত্রের ১ম খণ্ডে ১৯৪৭ থেকে ৫৮ সাল পর্যন্ত বিস্তারিত পর্বের নানা ঐতিহাসিক দলিল, ভাষণ, বিবৃতি, বিতর্ক প্রভৃতির সংকলন করা হয়েছে। এরই মধ্যে আংশিকভাবে হলেও উদ্ধৃত হয়েছে ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে গণপরিষদের আলোচনা তথা পরিষদের কার্যবিবরণীর ভাষা নিয়ে অনুষ্ঠিত বিতর্ক।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিরও ৪ বছর আগের কথা। পাকিস্তান গণপরিষদে বক্তৃতা দান এবং কার্যবিবরণীর ক্ষেত্র লেখা ছিল : 'কেবলমাত্র উর্দু অথবা ইংরেজতেই পরিচালিত হবে।'

পূর্ববঙ্গ তথা সেকালের পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালি নামে নির্বাচিত কোনো 'মুসলমান সদস্য' এই ধারার পরিবর্তনের সামান্যমাত্র উদ্যোগ যেখানে সেদিন নেননি, সেখানে পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত প্রধান সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তার সাথীরা প্রেমহরি বর্মণ, ভুপেন্দ্র কুমার দত্ত এবং শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেদিন মুসলিম লীগের নেতাদের তীব্র আক্রমণের মুখে অমিত সাহস ও দূরদৃষ্টি নিয়ে বাংলা ভাষার দাবিকে তুলে ধরেছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উদ্যোগ নিয়ে গণপরিষদে কার্যবিবরণীর ভাষার ক্ষেত্রে সংশোধন এনে বলেছিলেন : 'কার্যবিবরণী উর্দু অথবা ইংরেজি অথবা বাংলাতে পরিচালিত হোক'।

অত্যন্ত নিরীহ এবং যুক্তিপুর্ণ একটি প্রস্তাব। উর্দুকে নাকচ করা নয়। উর্দুর সঙ্গে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে স্থান দেওয়ার দাবি মাত্র।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তার বক্তৃতায় গণপরিষদের সভাপতিকে সম্বোধন করে (ইংরেজিতে) বলেছিলেন :

"মিষ্টার প্রেসিডেন্ট, আমার এই প্রস্তাব আমি কোনো সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার মনোভাব থেকে পেশ করিনি। পূর্ববঙ্গ হিসেবে বাংলাকে যদি একটি প্রাদেশিক ভাষা বলা হয়, তবে একথা সত্য যে, আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা। ৬ কোটি ৯০ লক্ষ যদি সমগ্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসীর সংখ্যা হয়, তাহলে তার মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।

সভাপতি মহোদয়, আপনিই বলুন, একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার নীতি কী হওয়া সঙ্গত? একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে সেই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে ভাষা বলে সেই ভাষা। আর সে কারণেই আমি মনে করি আমাদের রাষ্ট্রের 'লিংগুয়া ফ্রাংকা' বা প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে বাংলা।

প্রিয় সভাপতি, আমি জানি এই কথা বলে আমি আমাদের রাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যক মানুষের আকুতিকেই প্রকাশ করছি। এই পরিষদকে আমি কোটি কোটি মানুষের সেই আকুতির কথা অবগত করবার জন্যই আজ এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছি। কী অবস্থায় পূর্ববঙ্গের মানুষ আজ বাস করছে? ধরুন একজন সাধারণ মানুষের কথা, একজন কৃষকের কথা। সে যদি ডাকঘরে যায় এবং শহরে পাঠরত তার পুত্রকে ডাকযোগে কিছু টাকা পাঠাতে চায়, তবে 'মানিঅর্ডার ফর্মের ভাষা' সে বুঝতে অক্ষম হবে। কারণ মানিঅর্ডার ফর্মের ভাষা হচ্ছে উর্দু এবং ইংরেজি। একজন গরীব কৃষক যদি একখণ্ড জমি বিক্রির জন্য ষ্ট্যাম্প কিনতে যায়, তবে বিক্রিত ষ্ট্যাম্পের ভাষা সে বুঝবে না। ষ্ট্যাম্পের গায়ে কেবল উর্দু এবং ইংরেজিতেই ষ্ট্যাম্পের মূল্যের কথা মুদ্রিত আছে। গরিব কৃষক বুঝবে না কতো টাকার ষ্ট্যাম্প সে কত টাকা দিয়ে ক্রয় করতে বাধ্য হল। আমাদের রাষ্ট্রের, পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের এই হচ্ছে তিক্ত অভিজ্ঞতা। অথচ যে কোনো রাষ্ট্রের ভাষা হতে হবে এমন যে সাধারণ মানুষ সে ভাষাকে বুঝতে পারে। অথচ রাষ্ট্রের ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ তার এই গণপরিষদ তথা পার্লামেন্টের কার্যবিবরণীর ভাষা সে জ্ঞাত নয়। আমি তো বুঝিনি উর্দুর সঙ্গে ইংরেজি যদি ভাষার প্রশ্নে লক্ষ মানুষের ভাষা বাংলা কেন ব্যবহৃত হতে পারবে না?

এমন নিরীহ অকাট্য প্রশ্ন এবং যুক্তির জবাবদানের ক্ষমতা সেদিনের পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ছিল না। তাই প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবের জবাবে আক্রমণের ভাষায় বলতে পেরেছিলেন : 'মাননীয় সদস্য, পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভুল ধারণা, 'মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং' সৃষ্টির অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।'

পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র বলে আখ্যাদানকারী মূর্খ লিয়াকত আলী অচিরে কেবল যে তারই 'স্বধর্মী' ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন তাই নয়, লিয়াকত আলীর এমন আক্রমণাত্মক জবাব আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। লিয়াকত আলী আজ বিস্মৃত। স্মরণীয়, বরণীয় আজ সেদিনের সেই প্রতিকূল পরিবেশে যথার্থই অসহায় তথাপি সাহসী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তাঁর সঙ্গীরা।

এই বিতর্কের শেষে যখন 'উর্দু এবং ইংরেজির সঙ্গে বাংলা'র প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়েছিল তখন তমিজউদ্দীন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের সেই সভায় পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ সদস্যদের বিরোধিতার কারণ নাকচ হয়ে গিয়েছিল ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উত্থাপিত সে প্রস্তাব।

কিন্তু পূর্ববঙ্গের সচেতন রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তার সাথীরা ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে অমর হয়ে থাকার দাবিদার। অথচ আমরা ইতিহাসের এই অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনাকে বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করে ইতিহাস সৃষ্টির মুর্খ চেষ্টায় নিবদ্ধ রয়েছি।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেদিন থেকেই পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ও সামন্তবাদী জান্তার নির্মম আক্রমণের লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং সে কারণেই ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর হামরার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন ধীরেনন্দ্রনাথ দত্ত।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনী বিস্তারিতভাবে আমাদের জানা আবশ্যক। নতুন প্রজন্মকে জানানো আবশ্যক। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সাম্প্রদায়িকতার হীনমন্য এবং মধ্যযুগীয় শৃঙ্খল ভাঙার জন্যই স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং মুক্তির সংগ্রাম ৪৭ সাল থেকে শুরু হয়ে ৭১ সালে চরম পরিণতি লাভ করেছিল।

একটি বিশ্বকোষ অন্বেষণ করে দেখলাম, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে লেখা রয়েছে : 'ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম রামাইল, ত্রিপুরা, ১৮৮৬। আইনজীবী, রাজনীতিবিদ। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বিএ পাস। অতঃপর আইন পাস কর কুমিল্লায় আইন ব্যবসার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। ১৯২১-এ কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান। ১৯৩০-এ কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে পুনরায় গ্রেফতার। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য। ১৯৪৮-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি গণ-পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে পরিষদ পরিচালনার নিয়ম-কানুনে বলা হয়েছিল যে গণপরিষদের আলোচনায় ইংরেজি বা উর্দু ছাড়া

অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম ব্যক্তি যিনি ভাষা প্রশ্নে সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন এবং বাংলা ভাষাকে সমান মর্যাদাদানের দাবি জানান। ১৯৫৪তে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত। আবু হোসেন সরকার ও পরে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভার সদস্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলীতে নিহত। মৃত্যু ২৭.০৩.১৯৭১" [চরিতাভিধান : বাংলা একাডেমি।]

সংক্ষিপ্ত এ কাহিনী যথার্থ। কিন্তু এটুকু যথেষ্ট নয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন কাহিনী বর্তমানের সংগ্রামী তরুণ প্রজন্মের জন্য অপার অনুপ্রেরণা ও তাৎপর্যময় এক জীবনের কাহিনী। তরুণরা এগিয়ে আসুন এমন জীবনের কাহিনী গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্ধার করে বাংলাদেশের বেদিমূলে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়ে।

আহা! কী মর্মান্তিক মৃত্যু বাংলাদেশের ভাষার এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ৮৫ বছর বয়সে। পাকিস্তানি হানদার বাহিনীর হাতে ৭১ সালের ২৭ মার্চ তারিখে তিনি বন্দী হন। 'দৈনিক ভোরের কাগজ'-এ ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে তরুণ সাংবাদিক মিঠুন মুনতাসির এই মৃত্যুর যে বিবরণী সংগ্রহ করেছেন সে বিবরণ আমার মনকে আলোড়িত করেছ।

"১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ। কুমিল্লা শহরে কারফিউ ভয়ংকর নিস্তব্ধতা চারদিকে। থেকে থেকে ফৌজি গাড়ির আওয়াজ আর কুকুরের ডাক। পঁচাশি বছর বয়সের এক বৃদ্ধকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল তখন। সন্ধ্যার সময় মাথা ধুলেন। নাতনীকে ডেকে বললেন একটি গ্রন্থ আনতে। লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে শোনালেন ঐ গ্রন্থ থেকে : 'দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলে সে মরে না, সে শহীদ হয়। সে অবিনশ্বর, তার আত্মা অবিনশ্বর।'

পুত্র-পুত্রবধূদের ডেকে বললেন : আজ রাতেই ওরা আমাকে নিয়ে যাবে। রাত বাড়তে থাকল দেড়টার দিকে পাকিস্তান বাহিনীর ট্রাক এসে থামলো বাড়িটায়। ধরে নিয়ে গেল ঐ বৃদ্ধ এবং তার পুত্রকে। তাকে রাখা হল ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে, নির্যাতন সেলে। ওই পঁচাশি বছরের মানুষটির হাঁটু দেয়া হল ভেঙে। চোখ দেয়া হল অন্ধ করে। তার দুহাতেও চালানো হল নির্যাতন। ওই ক্যান্টনমেন্টের একজন নাপিত দেখলো, একদিন বুড়ো মানুষটি হামাগুড়ি দিচ্ছেন একটু আড়ালে গিয়ে মলত্যাগ করবেন বলে। ১৪ই এপ্রিলের দিকে অকথ্য অমানুষিক নির্যাতনের ফলে তিনি মারা গেলেন।'

আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান

২৫শে মার্চ ৭১, রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আক্রমণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিহত হয় অগণিতছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং সাধারণ মানুষ। এই শহীদদের অন্যতম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এবং জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। এই রাতেই নিহত হয়েছিলেন দর্শনের অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব।

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন শহীদ মিনারের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের যে বাসভবনের নিচের তলাতে তিনি সপরিবারে থাকতেন, তার বাইরে সিঁড়ির কাছে। এইখানে গুলি করে সেনাবাহিনী হত্যা করেছিল পরিসংখ্যানের ড. মনিরুজ্জামান এবং তাঁর আত্মীয়জনদের মধ্যে আরো তিনজনকে।

সে এক মর্মান্তিক কাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শী আত্মীয়স্বজনদের কাছে সে কাহিনী শুনতে গেলে আজো যে কারুর হৃদয় অবর্ণনীয় বেদনায় মুষড়ে পড়ে।

আমার একদিকে সংকোচ, অপরদিকে বহুদিনের আগ্রহ ছিল অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার জীবনের শেষ মুহূর্তটির কথা তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী গুহঠাকুরতার কাছ থেকে শুনি। জ্যোতির্ময় বাবুর জীবনের সেই মর্মান্তিক এবং অনুপ্রেরণা কাহিনী শহীদ স্মরণীতে কিছু যে কোথাও কোথাও না এসেছে, তা নয়। তবু জ্যোতির্ময় বাবুর কথা যত শুনছি, তত মনে হচ্ছে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার জীবনকাহিনী বাংলাদেশের বিস্তারিতভাবে কোথাও তার কোনো সহযোগী বা আত্মজনের হাতে লিখিত এবং প্রকাশিত হয় নি। অথচ এ কাহিনী যত বিস্তারিতভাবে সম্ভব লিপিবদ্ধ করা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অপরিহার্য। বস্তুত শুধু জ্যোতির্ময় বাবুর জীবনের শেষ মুহূর্তের জীবনদানের কাহিনী নয়; এই নিবেদিত প্রাণ, সামাজিক রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং

আদর্শবাদী শিক্ষক ও ব্যক্তিত্বের উপর একখানি স্মারকগ্রন্থ রচনা করা অত্যাবশ্যক। আর এমন কাজে যত বিলম্ব ঘটবে, তত জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার জীবন ও চিন্তা-ভাবনা বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। সংকোচের দিক আমার এই যে এমন এক করুণ ও হৃদয়বিদারক কাহিনী যে এর কথা আত্মজনের কাছে জিজ্ঞেস করতে মনে বাধা। তবু সে সংকোচ অতিক্রম করে ২৪শে মার্চ ৮৫ তারিখে সন্ধ্যায় আমি গিয়েছিলাম মিসেস বাসন্তী গুহঠাকুরতার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাসভবনে।

এ বাড়িটি অবশ্য নতুন তৈরি হয়েছে। আগে জগন্নাথ হলের প্রভোস্টরা বা পরবর্তীকালে সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্টরা যে পুরোন দোতলা বাড়টিতে থাতেন, সেটি ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য এখন বহুতল ফ্লাটবাড়ি তৈরি করা হয়েছে। এই বাড়িতেই এক সময়ে, সেই দেশ বিভাগের আগে, থাকতেন প্রখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য। তিনিও তখন জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ছিলেন।

মিসেস বাসন্তী গুহঠাকুরতা নিজেও একজন ব্যক্তিত্বময়ী শিক্ষাবিদ। ঢাকার গেণ্ডারিয়া মনিজা রহমান বালিকা হাইস্কুলের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং তার প্রধান শিক্ষয়িত্রী। যে বাড়িটিতে নিজের একমাত্র সন্তান কন্যা মেঘনাকে নিয়ে থাকতেন, তার বিপরীতেই সেই নিদারুণ ঘটনার স্মৃতিবহ ভবন। এখনো এই ২৫শে মার্চের কথা বলতে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি বলেন : ঐ তো ঐ জায়গাটিতে, আমাদের বারান্দার এ পাশটাতে আমার স্বামী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে পাকিস্তানের মিলিটারি গুলি করেছিল। একটা গুলি লেগেছিল গলায়। আর একটা গুলি পিঠে। এই গুলি খেয়ে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনি মারা যান নি। তার পরেও তিনি আহত হয়ে, বেঁচে ছিলেন, ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯শে মার্চ পর্যন্ত। মারা গেলেন ৩০শে মার্চ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

এই কাহিনী শোনার জন্যই গিয়েছিলাম বাসন্তী দেবীর বাসায়। কালবৈশেখীর আকস্মিক ঝড় তখন মাত্র থেমেছে। এই ঝড় জলের মধ্যেও যে আমি তার বাসায় গিয়েছি, এজন্য তিনি বেশ খুশি হয়েছেন এবং বিনা দ্বিধায় প্রায় দুঘণ্টা ধরে জ্যোতির্ময় বাবুর জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। কন্যা মেঘনা ২৫শে মার্চের সময়তেও বেশ সচেতন ছিল। সে তখন কিশোরী। তবু জ্যোতির্ময় বাবু আর বাসন্তী দেবীর উদার জ্ঞানময় পরিবেশে লালিত স্নেহাস্পদ। সপ্রতিভ, বুদ্ধিমতী এবং সচেতন। তখন সে পড়ত স্কুলে, ক্লাস টেনে-এ হলিক্রস স্কুলে। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন লেকচারার হন।

মা এবং মেয়ে, দুজনেই বেশ আগ্রহের সঙ্গে জ্যোতির্ময় বাবু সম্পর্কে নানা স্মৃতির কথা উল্লেখ করলেন।

আমি ওদের বাসায় ঢুকেই যে কথাটি বলেছিলাম তার উপর জোর দিয়ে মেয়ে মেঘনাকে আবার বললাম : তোমাকে এই কাজটি করতে হবে। তোমাকে

বাবার উপর একটি স্মারক পত্র তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি তোমার বাবার রচনা যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি কর। 'আমার বাবার কথা' বলে তুমি নিজে একটি স্মৃতিকথা লিখ। তাতে তুমি বলো বাবার সঙ্গে তোমার আলাপ-আলোচনা-তর্ক-বিতর্কের যত কথা আর ঘটনা তোমার স্মরণে যা আসে তার সব।

নিজেদের ব্যাপার বলে একটু সঙ্কোচবোধ করল। তাকে কাটিয়ে দেবার জন্য আমি জোর দিয়ে বললাম। এ তো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। তোমার বাবা তো আজ আমাদের এই দেশে ও কালের অন্যতম অমর শহীদ। তার কথা বর্তমানকে সাধ্যমত জানানো তো আমাদের দায়িত্ব। আর এ কাজ তুমি ছাড়া অপর আর কে পারবে।

আমার প্রস্তাবটি বাসন্তী দেবীরও ভালো রাগল। তিনি যথার্থই উৎসাহিত হয়ে বলেন : খুব ভালো কথা। লেখনা তুই যা তোর মনে আসে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন : 'তর্কের কথা আর বলবেন না। বাপে-মেয়েতে আন্দোলনের সেই ফেব্রুয়ারি-মার্চ প্রত্যেক দিন কমপিটিশন হত। বাবা জিজ্ঞেস করত, বলত মেঘনা, আগামিকাল এই ঘটনার কী শিরোনাম হবে, কোন কাগজে? বাবা বলত এক শিরোনাম মেয়ে দিত আর এক শিরানাম। ওর বাবা ছিলেন সতর্ক-সংযত মানুষ। ২৫শে মার্চ যত এগিয়ে আসছিল রাজনীতিক মীমাংসার সম্ভাবনা যত অনিশ্চিত হয়ে আসছিল, তত তিনি উদ্বেগ বোধ করছিলেন। মেয়েকে জিজ্ঞেস করতেন : কিরে কী মনে করিস? শেখ মুজিব কি বিজয়ী হবেন? মেয়ে বলত : দেখ বাবা শেখ মুজিব জয়ী হবেনই। বাবা মাথা নেড়ে বলতেন : ব্যাপারটা অত সোজা নয় রে। স্বার্থবাদী পাকিস্তানী মহল কি এত সহজে ছেড়ে দিবে? আমার রাজনৈতিক বোধে তো তা বলে না। বড় কঠিন সময় বোধহয় আসছে ... ।'

২৫শে মার্চের কথা যখন এসে পড়ল তখন স্বাভাবিকভাবে আমি বাসন্তী দেবীকে প্রশ্ন করলাম। জ্যোতির্ময়দা জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। তার জন্য বিপদের আশঙ্কা তো আপনাদের কারো অজানা ছিল না। সেদিন একটু কি নিরাপদ স্থানে যাওয়া যেত না?

জানি এমন প্রশ্নের কোনো অর্থ হয় না। সে আর এক যুগ, আর এক পরিস্থিতি। আজ নিরাপত্তার কথা তুলে 'যদি একটু নিরাপদে যেতেন' 'কেন গেলেন না—এসব কথা বলা সহজ। কিন্তু তাতে সেদিনের সেই পরিবেশ আর পরিস্থিতি তো প্রকাশিত হয় না। বাঙালিমাত্র সেদিন বিপন্ন। কে কোথায় গিয়ে নিরাপদ হবে?

কিন্তু আসলে ৭ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যায়টি কোনো বিপদবোধের সময়ই ছিল না। সে ছিল প্রতিদিন আর প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামের জীবন। চারদিকে রক্ত ঝরছে। জ্যোতির্ময় বাবু সে রক্ত দেখেছেন। বাসন্তী দেবী বললেন : 'আসলে তখন

এমনভাবে চিন্তা করার তো কথা আসে নি। বিজয় তো আমাদের সামনে। যে ছেলেরা ২১শে ফেব্রুয়ারির পরে আমার স্বামীর সতর্ক উপদেশেই হল ছেড়ে দিয়েছিল, তারা তো ২৩ তারিখ সকাল থেকেই আবার হলে এসে জড়ো হতে লাগল। একথা ঠিক যে, কোন ফয়সালা হচ্ছে না। ২৫ তারিখের আগেও হলে নানা গণ্ডগোল হয়েছে। হলের ছেলেদের ওপর ইউওটিসি'র পক্ষ থেকে হলের মাঠে তাদের প্যারেড করা, না করা নিয়ে হামলা হয়েছে। আত্মীয়স্বজন ২৫ তারিখে খবরও পাঠিয়েছিলেন আমাদের গেণ্ডারিয়ার ওদিকে কোথাও যেতে।'

বাসন্তী দেবী সেই ২৫শে মার্চের রাতের দিকে চোখ রেখে বলতে লাগলেন : কিন্তু আমার স্বামী বললেন : আমি হলের দায়িত্ব ছেড়ে যাই কী করে? ভাইসচ্যান্সেলার বিচারপতি চৌধুরীও ঢাকাতে নেই। তিনি নিজে অনুরোধ করে আমাকে নমাস আগে প্রভোস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়েছেন। আজ ছেলেরা সব আবার হলে ফিরে আসছে। আমি তাদের হল ছেড়ে যেতে বলতে পারি না। তাদের ছেড়ে আমি যাব কী করে? না বাসন্তী তা হয় না। যা হবার তা হবে।'

বাসন্তী দেবী বললেন : তারপরই তিনি নিজের স্বভাবগত পরিহাসের ভঙ্গীতে তাঁর প্রিয় গানের সেই কলিটি গেয়ে উঠলেন : আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।

এই গানের কলিটি শুনে আমি চমকে উঠলাম। জ্যোতির্ময় বাবুর প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি নাকি একটি পদ। তিনি নাকি প্রায়ই এই গানটি গাইতেন। ফেব্রুয়ারি মাসে যখন হলের ছেলেরা বেশ সমারোহের সঙ্গে সরস্বতী পূজা করেছিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল তখন জ্যোতির্ময় বাবু গায়কদের একজনকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর প্রিয় এই গানটি অনুষ্ঠানে গাইতে।

এই গানের উল্লেখে আমি যেন আমার মনের বহুদিনের একটি প্রশ্নের জবাব পেলাম। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছাত্রদের প্রিয় এবং দক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিলেত থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে এসেছিলেন। কোলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের তাঁর নিজের আত্মীয় স্বজন ছিলেন, যারা দেশ বিভাগের পরে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ক্রমঅবনতির কারণে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মানুষ নিজের জীবনের নিরাপত্তাকে সবচাইতে মূল্যবান মনে করে। তাই স্বাভাবিক। আর ভারত উপমহাদেশের আধুনিক ইতিহাসের এই এক পরিহাস, মানুষ মানুষকে ভাইয়ের বদলে শত্রুর অধিক বলে গণ্য করতে পারে। এই পর্যায়ে বিভিন্ন মুহূর্তে দেখা গেছে ব্যক্তি তার জীবনের নিরাপত্তা প্রতিবেশির চাইতে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক বোধ করে : হিন্দু হিন্দুর নিকট, মুসলমান মুসলমানের নিকট। অথচ এ বোধ যে কত অযৌক্তিক আর ভিত্তিহীন তা এই আধুনিক কালে বারে বারেই তো প্রমাণিত হয়েছে। এই 'পূর্ব-পাকিস্তানে' যে 'পূর্ব-

পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ধর্মগত সাম্প্রদায়িক বোধ থেকে সেই পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলমানই তো মুসলমানকে হত্যা করেছে নৃশংসতমভাবে।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম এর আগের কথা। সম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাগের সময় এবং পরে এপারে ওপারে দাঙ্গা হয়েছে। কার কারণে কোনটা সে প্রশ্ন অনর্থক। কিন্তু দাঙ্গা বাধলেই এপারের হিন্দু সম্প্রদায় নিজের জীবনকে বিপন্ন বোধ করেছে। ওপারের মুসলমান নিজের জীবনকে বিপন্ন বোধ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ছাড়া শিক্ষিত অবস্থাপন্ন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষও নিজের জন্মভূমি, বাসস্থান, জীবিকা, অবস্থান পরত্যাগ করে এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়েছে।

তাই অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষিত, দক্ষ অধ্যাপক হয়ে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতিতে যদি পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে যেতেন সেটা অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু তিনি যান নি। কেন তিনি যান নি?

জ্যোতির্ময় বাবু পূর্ববঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন কিনা, তা আমার জানা নেই। কিন্তু তিনি অসচেতন ছিলেন না, অরাজনৈতিক ছিলেন না। তাঁকে র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট বলে আখ্যায়িত করত। তিনি তা অস্বীকার করতেন না। আমাদের দেশের বামপন্থী চিন্তার ইতিহাসে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট একটি চিন্তাধারার নাম। প্রখ্যাত মানবেন্দ্রনাথ তথা এম. এন. রায় কমিউনিস্ট সংগঠন পরিত্যাগ করে এই নামের একটি সংগঠন দাঁড় করিয়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলার অনেক বুদ্ধিজীবী এম. এন. রায়ের এই 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' সংগঠন ও চিন্তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। এ সংগঠন কোন জঙ্গি আন্দোলনের সংগঠন ছিল না। কিন্তু নাম থেকেই বুঝা যায়, সংগঠনটি ছিল শ্রেণী-উর্ধ্ব একটি মানবতাবাদী সংগঠন। শ্রেণী নির্বিশেষে কোনো মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখা। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট ছিলেন। কিন্তু তারও বেশি, তিনি তাঁর নিজের জন্মগত স্বদেশ ও পরিবেশের মহৎ পরিবর্তনের সংগ্রামের একজন সচেতন অংশীদার ছিলেন। তার না হলে আসন্ন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও সেই প্রবাদের সক্রেটিসের ন্যায় হাসিমুখে তিনি গেয়ে উঠতে পারতেন না : 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান'। হাঁ, জেনে শুনেই তো। তা না হলে, জীবনের এই বিষ, এই বিপর্যয়, এই করুণ মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা আমাদের অপর দশ জনার মতো করতে তার বাঁধা ছিল কোথায়?

বাসন্তী দেবী বলছিলেন ২৫ তারিখ রাত আড়াইটায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জীপগুলো জগন্নাথ হলের উপর আক্রমণের পরে তাঁদের আবাসিক এলাকার বাইরে গেটের তালা ভেঙে ঢুকে প্রত্যেক ঘরে বুটের লাথি মারতে মারতে, অবশেষে তাঁর ঘরের পেছন দিক দিয়ে তাঁর বাসায় এসে 'প্রফেসর হ্যাঁয়?'

বলে হাঁক দিয়েছিল। তাঁর চোখ দুটি ছিল আজকের পঁচাশি থেকে তের বছর আগের সেই ২৫শে মার্চের রাত আড়াইটার দৃশ্যে। আমার শুনে শুনে কেবল বিস্ময় জাগছিল এই ভাবে, কেমন করেই না সত্যিকার সাহসী মানুষ বিপদের মুহূর্তে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে, কেমন করে যে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বাসন্তী দেবী আর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার আদ্যন্ত জীবনের কাহিনী আমি জানি নে। তাঁদের প্রিয় ছাত্র অজয় রঞ্জন বিশ্বাস তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন : এঁরা দুজন কেবল দম্পতি নন, সারা জীবনের বন্ধু ছিলেন। আজ সেই ২৫ তারিখের রাত্রির কাহিনী বাসন্তী দেবীর মুখে শুনতে শুনতে অজয় রঞ্জন বিশ্বাসের কথাটিকে যথার্থ বলে মনে হল। এবং তাদের সেই জীবনভর বন্ধুত্ব তার চরম প্রকাশ পেয়েছিল ২৫শে মার্চের সেই ভয়াল মুহূর্তটিতে।

এই বিপদের আশঙ্কায় জ্যোতির্ময় বাবু রাতের প্রথম প্রহরেও স্ত্রীকে বলেছিলেন, তুমি মেয়েকে নিয়ে অন্য কোথাও যাও। আমার তো যাবার উপায় নেই।

জ্যোতির্ময় বাবুর পরামর্শের জবাবে বাসন্তী দেবী বলেছিলেন : না, তোমাকে ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না।

পাকিস্তান সামরিক অফিসারের হাঁকের জবাবে বাসন্তী দেবীই বেরিয়ে এসে বললেন : হ্যাঁয়।

সামরিক অফিসার বলল : উনকো লে যায়েগা।

বাসন্তী দেবীও কিছু কথা উর্দুতে বলতে পারেন। তিনি বললেন, কিউ লে যায়েগা, কাঁহা লে যায়েগা?

এমন কথার প্রতি উত্তর কী হয়েছিল, কেমন করে হয়েছিল, সেটি আজ স্মরণে নেই। কিন্তু বাসন্তী দেবী যখন ভেতরে গিয়ে স্বামীকে বললেন : ওরা তোমাকে এ্যারেস্ট করতে এসেছে, তখন নিঃশব্দে জ্যোতির্ময় বাবু ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

জল্লাদের দল জোর করে হাত ধরে তারপর ওঁকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে তাঁর নাম, ধর্মের কথা সব জিজ্ঞেস করল। আমার স্বামী তাঁর যা নাম তাঁর ধর্ম-সব বললেন। তাপরই গুলির শব্দ। একটা গুলি গলার মধ্য দিয়ে গেল। আর একটা পিঠে। লুটিয়ে পড়লেন তিনি সিঁড়ির সামনে। আমাদের বাসার পাশে। লুটিয়ে পড়েও সংজ্ঞা হারান নি। স্বাভাবিক কণ্ঠে যেন বলে উঠলেন বাসন্তী জল দাও।

এমন অবস্থার কথা পুনরায় স্মরণ করে বর্ণনা করা বাসন্তী দেবীর পক্ষে যে কী মর্মান্তিক আর কষ্টকর তা ভেবে আমি একবারে নির্বাক আর নিঃস্পন্দ হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। তিনি সেদিনও যেমন আজও তেমনি আবেগে বা বেদনায় সম্বিতহীন নন। কাহিনীকে বিস্তারিত করে বললেন : কিন্তু আমার স্বামী তো একা নন। ঐ সিঁড়ির গোড়াতেই লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করেছে পশুর দল

পরিসংখ্যানের মনিরুজ্জামান সাহেব এবং তাঁর আত্মীয় আরো তিনজনকে। তাঁদের তিনতলার ঘর থেকে টেনে নামিয়েছে।

"আমরা যখন ভেবেছি, আমার স্বামীকে ওরা মেরে ফেলেছে তখন উপর তলার রাজ্জাক সাহেব এবং আরো কে যেন ডেকে বলল : আপনার স্বামী মারা যান নি। উনি পানি চাচ্ছেন। তখনি সম্বিত ফিরে পেয়ে ছুটে গিয়ে ওকে ধরাধরি করে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলাম।

বাসন্তী দেবী বললেন : "তারপরে ২৬ তারিখ যেন অবরুদ্ধ হয়ে বাসার মধ্যেই কাটল। কাছেই হাসপাতাল। কিন্তু কেমন করে নিব ওকে হাসপাতালে? ২৭ তারিখ সকালে কারফিউ উঠলে ওকে ওর শোওলার বিছানার উপর রেখে কয়েকজনে ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে যে কোনো চিকিৎসা হল তা নয়। আর সে অবস্থাও তখন ছিল না।"

"তারপর ২৮ গিয়ে ২৯ এলো এবং ৩০ তারিখ সকালে তিনি মারা গেলেন। আমরা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। ডাক্তাররা কেবল বলতেন উনি যে কেমন করে বেঁচে আছেন এই কয়দিন তাই আমাদের কাছে বিস্ময়।"

মৃত্যুর জন্য ধীরভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন জ্যোতির্ময় বাবুও। বিষাক্ত গুলিবিদ্ধ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মুখে কাতর কোন ধ্বনি কেউ শোনে নি। এই কটি দিনে সুহৃদদের কেউ যখন দেখতে এসেছেন এবং আলোচনাকালে বাসন্তী দেবীর কাছেই জানতে চেয়েছেন অপর কোনো বন্ধুর কথা, সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত কারুর কথা, তখন তিনি যদি তাদের পরিচয় ও ঠিকানা বলতে গেছেন, জ্যোতির্ময় বাবু তখন সতর্কতার বোধ থেকে স্ত্রীকে বলেছেন : যা জানো, সব বল কেন? অবস্থা ভালো নয়। সব বলতে নাই। ... ২৫ তারিখ রাতে যখন চারদিকে আগুনের হল্কা ছুটছে, মেশিনগানের গুলি ছুটে আসছে তখন স্ত্রীকে বলেছেন, খাটের নিচে যাও। মেয়েকে বুকে করে খাটের নিচে আশ্রয় নিয়ে তরল পরিহাস করেই যেন বলেছেন : এ হচ্ছে যুদ্ধ। ট্রেঞ্চে তোমাকে এ ভাবেই থাকতে হবে। খাওয়া দাওয়ার কোনো চিন্তা করবে না। কোন বাছবিচার থাকবে না। যেখানে মলত্যাগ, সেখানেই আহার গ্রহণ, বুঝেছ ...।

এই জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ৩০শে মার্চ সকালে 'যুদ্ধের ট্রেঞ্চে' আহত অবস্থায় থেকে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করলেন। তার প্রিয় ছাত্র তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণটির শিরোনাম দিয়েছেন : 'সেই জ্যোতির্ময় মানুষটি'। এ নামটি শেষমুহূর্তেও যথার্থ বলে প্রমাণিত হল। বাসন্তী দেবীর বর্ণনাতে ছিল : 'মৃত্যুর আগের দিনও বোধহয় আমার স্বামী তাঁর সেই প্রিয় গানের প্রিয় কলিটি নিয়ে গুন গুন করেছিলেন। বলছিলেন : আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান ...।'

এই লেখাটি 'জ্যোতির্ময় গুহ স্মারক গ্রন্থে' সরদার ফজলুল করিম লিখেছিলেন।

একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী আকস্মিকভাবে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে (২৪শে জুন, ১৯৮১) মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর বিবরণে দেখলাম যে-রাত্রিতে মারা গেলেন সেদিন সন্ধ্যার পরে এক বন্ধুর বাড়িতে তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানেই রাত নটার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ড. মতিন চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনে যেমন একজন সর্বজন পরিচিত এবং উদ্যোগী অধ্যাপক এবং প্রশাসক হিসাবে গত কয়েক বছরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তেমনি তিনি বেশ বিতর্কিত এক ব্যক্তিত্বও ছিলেন। আমি তাঁর ঘনিষ্ঠতায় খুব না গেলেও তিনি যেমন ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানতেন, আমিও তাঁর কর্মময় জীবনকে সোৎসুকভাবে দেখার চেষ্টা করেছি।

আমি নিজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে প্রত্যাবর্তন করেছি মাত্র '৭২ সালে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে। প্রায় পঁচিশ বছর বাদে। এই '৭২ সালেই বোধহয় মতিন চৌধুরী পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তন করেন। অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে চলে গেলে শেখ সাহেব ড. মতিন চৌধুরীকে '৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত করেন।

আমার শিক্ষকতা পদেরই একটা ব্যাপারে একবার তাঁর সামনে আমাকে যেতে হয়েছিল। সে এক পদগত সাক্ষাৎকার। তাঁর সঙ্গে আরো কিছু কর্মকর্তা ছিলেন। অধ্যাপক চৌধুরীর কথা বলার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি ছিল। তাঁর যে কোনো আলাপে কিছুটা পরিহাস এবং গুরুত্বের মিশেল থাকত। সেদিনকার সাক্ষাৎকারের সময়েও তিনি তাঁর সেই স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বলেছিলেন : আপনার রেকর্ড তো উত্তম। কিন্তু আপনি 'দর্শন' ছেড়ে 'পলিটিকস'-এ কেন এলেন? ...

আমি বিনীতভাবে বললাম : আমি আসিনি। আমাকে আপনারা এনেছিলেন। এবং এখনো যেখানে উপযুক্ত মনে করবেন, সেখানেই যেতে বলবেন। আমার তাতে আপত্তি থাকার কিছু নেই।

আমার জবাবে তিনি বললেন : না না, কোথাও যাওয়ার কথা আমি বলছিনে।

'৭২ কিংবা '৭৩ সালের পূর্বে তিনি কোনো রাজনীতি করেছেন কিনা, আমার জানা নেই।' ৭৩ সাল থেকে ভাইস-চ্যান্সেলারের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি শেখ সাহেবের দল এবং রাজনীতির যে দ্বিধাহীন সমর্থক—এ কথা তাঁর আলাপে, আলোচনাতে, ভাষণে এবং আচরণে গোপন রাখেননি। সরকার এবং সরকারি দল ও তার নেতার সঙ্গে এই দৃষ্টিগোচর একাত্মতাই বোধহয় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনাপ্রবল শিক্ষকদের নিকট কিছুটা বিতর্কের পাত্র করে তোলে। কিন্তু তিনি এমন সমালোচনা ও বিতর্কের কোন পরোয়া করতেন না। প্রশাসনিক যে কোনো সিদ্ধান্তে তিনি বেশ ত্বরিত এবং সাহসী ছিলেন। শিক্ষক নিয়োগ, কর্মচারীদের অনুদান মনজুর, পদোন্নতি প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠান বা খাতে অর্থব্যয় : কোথাও দ্বিধা কিংবা কোনো আনুষ্ঠানিকতাকে প্রাধান্য দেওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না। ক্ষমতার ব্যবহার বা অপব্যবহার : তাঁর সমালোচকরা যাই বলুক না কেন, তিনি যে ক্ষমতাবান এবং সর্বক্ষণ ক্রিয়াশীল ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শেখ মুজিবুর রহমানে শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট হলেন এবং 'বাকশাল' ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েও ড. মতিন চৌধুরী বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলেন।

শেখ সাহেবকে তিনিই উদ্যোগ নিয়ে '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন। শেখ মুজিবের সেই পরিদর্শনের প্রস্তুতি কার্যের সংগঠনেও তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। শেখ সাহেব কোন পথে আসবেন, যাবেন, তার মহড়াও হয়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিব সেই আসার দিন ১৫ই আগস্টের ('৭৫) পূর্ব-রাতে সপরিবারে নিহত হন।

এই ঘটনার পরবর্তীতেই ড. মতিন চৌধুরী উপাচার্যের পদ থেকে অপসারিত হন। এবং ১৫ই আগস্ট-পরবর্তী সরকার গ্রেফতার করে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করে। সেই কারানির্যাতন ভোগ করে প্রায় দেড় বছর পরে বোধহয় তিনি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে ফিরে আসেন।

বলা চলে '৭২ সাল থেকেই ড. মতিন চৌধুরীর জীবনে নব পর্যায়ের শুরু। এবং এই পর্যায়ে থেকে তিনি যে অবসর গ্রহণ করতে চান না, যে-রাজনৈতিক আদর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন তা থেকে তিনি যে সরে যেতে চান না, এই দৃঢ় বক্তব্যটিই প্রমাণিত হয়েছে তাঁর কারাগারে গমন, কারাদণ্ড ভোগ এবং সেই দণ্ড ভোগের পরে আবার পরিপূর্ণভাবে দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজের বিশ্বাসগত ভূমিকাকে দিনরাত্রের উদ্যোগ এবং কর্ম দিয়ে পালন করার প্রয়াসে।

ড. মতিন চৌধুরীর এই পর্যায়টিই আমাকে চমকিত করেছে। শেখ মুজিব জীবিত থাকাকালে উপাচার্য হিসাবে সরকারকে সমর্থন করা, এমন কি সরকারি দলে যোগদানের মধ্যে বিস্ময়কর কিছু ছিল না। তখন সেটাই স্বাভাবিক বলে বোধ হয়েছে। সে সময়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে বা অপর কোনো ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে তাঁর প্রদত্ত আলোচনা বা ভাষণকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখা যেত না। তাতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির ক্ষমতাবোধ এবং পরিহাসের ভাবটি থাকত বলে মনে হত। কিন্তু শেখ মুজিবের হত্যার পরে পদচ্যুতি এবং কারানির্যাতনের পরে তাঁর ভূমিকাকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এমন প্রতিকূল পরিবেশে এমন হাওয়া-বিরোধী ভূমিকা খুব কম লোকেই দেখাতে পারে এবং খুব কম লোকই দেখিয়েছেন।

এদিক থেকে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর হতে এই আকস্মিক মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবনের পর্যায়টিকে যথার্থই নবতর পর্যায় বলে অভিহিত করা চলে।

ড. আবদুল মতিন চৌধুরী উদ্যোগেই 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' গঠিত হয়। নিজের বিশ্ববিদ্যালয়-বাসাতেই তিনি তার কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। এই পরিষদের উদ্যোগে ৭ই মার্চ, ২৬ মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর এবং শেখ মুজিবের জন্ম দিবস পালিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই পরিষদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। অধ্যাপক মতিন চৌধুরী এসব আলোচনায় সভাপতিত্ব করেছেন এবং তাঁর নিজের ভাষণে তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে কোনো সময়ে ইংরেজি বাক্যে, আবার আচম্বিতে বাংলাভাষাতে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। এতেও তাঁর সেই অভ্যাসগত হাল্কা আমেজ যে থাকত না তা নয়। তবু বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর হাল্কা সুরের গুরুত্বপূর্ণ কথাকে দর্শক-শ্রোতারা হালকাভাবে গ্রহণ করতে পারতেন না। তাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হত।

সাম্প্রতিক কালে স্বাধনিতার আদর্শ ও আবেগ-বিরোধী মহল বাংলাদেশ সরকারের আনুকূল্যে আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এরই প্রতিবাদ হিসাবে হয়ত ১৬ই ডিসেম্বর ('৮০) পালনের জন্য বঙ্গবন্ধু পরিষদ যে আলোচনার আয়োজন করেছিল ব্যক্তিগত ঔৎসুক্য থেকে আমি সেটি দেখতে গিয়েছিলাম।

সকলের আলোচনা শেষে সভাপতি ড. মতিন চৌধুরী তাঁর হাল্কাসুরে মেশানো ভঙ্গীতে বললেন, "আই হিয়ার দ্যাট লিস্ট ইজ বিয়িং মেইড ইন সাম কোয়ারটারস।" ... স্বাধীনতার বিরোধী শিবিরে নাকি আবার লিস্ট বানানো হচ্ছে। "ইফ দ্যাট ইজ সো, আই ডিক্লেয়ার, উই আর অলসো প্রিপেয়ারিং আওয়ার লিস্ট" ... আমরাও লিস্ট বানাচ্ছি এবং আমাদের সে লিস্ট দীর্ঘ হওয়ার দরকার হবে না। কেননা আমরা জানি স্বাধনিতার বিরোধী শক্তি কারা।" এমনি জোরালো সুরে কথা বলে ড. মতিন চৌধুরী এমনও বলেছিলেন, "প্রয়োজন হলে আবার অস্ত্রের দ্বারাই অস্ত্রের মোকাবেলা করা হবে।" ...

এমন দ্ব্যর্থহনী উক্তি ড. চৌধুরী জীবনের এই নব পর্যায়েরই বিস্ময়কর স্মারক হিসাবে শ্রোতাদের সেদিন চমকিত করেছিল। তাঁর এই সামাজিক-রাজনীতিক

আবহাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ততা বা 'কমিটমেন্ট' তাঁকে দেশব্যাপী পরিচিত এবং জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

ড. চৌধুরী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর উপাচার্যের দায়িত্বকালে তিনি যেমন "বোস অধ্যাপক" পদ তৈরি করেছিলেন, তেমনি তিনি নিজেই তাতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এই নিয়োগ বা পরিচয় তাঁকে বাংলাদেশে তেমন পরিচিত করেনি, যেমন পরিচিত করেছিল তাঁর সাম্প্রতিক কালের এই সংগ্রামী রাজনৈতিক ভূমিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকালীন শিক্ষক ড. মতিন চৌধুরী এই ভূমিকাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনকে অতিক্রম করে জাতীয়ভাবে পরিচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

কয়েকদিন আগে ১৪ জুলাই, '৮১ তারিখে বঙ্গবন্ধু পরিষদ থেকে টিএসসিতে ড. মতিন চৌধুরীর শোকসভার আয়োজন করা হয়। এতে সভানেত্রীত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল। কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাসহ এত ড. চৌধুরীর উপর আলোচনা করেন অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এবং অধ্যাপক ইন্নাস আলী। অধ্যাপক রাজ্জাক সাধারণত বক্তৃতা করেন না। তাই ড. মতিন চৌধুরীর শোক সভাতে বলতে তিনি যে সম্মত হয়েছিলেন, একে আমাকে চমকিত করেছিল। অধ্যাপক রাজ্জাকও তাঁর আলোচনায় ড. মতিন চৌধুরীর এই নব পর্যায়ের জীবনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার উল্লেখ করলেন। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন এবং চৌধুরী হারুনর রশীদ ব্যতীত শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনাও এদিন বক্তৃতা দেন।

শেখ হাসিনা কয়েকদিন আগে মাত্র দিল্লী থেকে দেশে ফিরেছেন। এবং বলা চলে কয়েকদিন আগে মাত্র তিনি রাজনীতিক জীবন শুরু করেছেন। বয়সে, দলের মধ্যে শেখ হাসিনা নেতাদের মধ্যে অবশ্যই সর্বকনিষ্ঠ। তাঁকে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর চেয়ারম্যান করা হয়েছে। শেখ হাসিনা তার এই ভূমিকায় কতোখানি পারদর্শী হবেন তা এখনো একটি প্রশ্ন হিসাবে সকলের মনে জেগে আছে। আমার নিজের মনেরও সেটি একটি প্রশ্ন। শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। তেমন কোন সভায় সাক্ষাৎভাবে আমি তাঁর বক্তৃতা শুনিনি। ড. মতিন চৌধুরীর শোক সভায় দেখলাম, তাঁকে সবার শেষে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হল। এ প্রথাটি সাধারণত কোনো সভার প্রধান বক্তার জন্য রাখা হয়। প্রধান বক্তাই শেষ বক্তা।

শেখ হাসিনার বক্তৃতা সাক্ষাৎভাবে সেদিনই আমি প্রথম শুনেছিলাম। কোনো লিখিত বক্তৃতা নয়। শেখ হাসিনা মৃদু উচ্চারণে ড. মতিন চৌধুরীর প্রতি বেশ উপযুক্ত ভাষাতেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। আলোচনার মধ্যে বললেন, ড. চৌধুরীকে হারিয়ে আমি "দ্বিতীয়বার আমার পিতাকে হারাবার শোক অনুভব করছি।" ... শেখ হাসিনার এই উপস্থাপনাটি আমার বেশ ভালো লাগল। ...

১৭-৭-৮১

বায়ান্নরও আগে

বায়ান্ন সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির অমর শহীদদের স্মরণে রচিত হয়েছে শহীদ মিনার। মাটি থেকে অসংখ্য সিড়ির ধাপ। সেই ধাপের পরে বিস্তীর্ণ চত্বর। চত্বরের পেছনে সারিবদ্ধ দণ্ড। একদিন এখানে সিড়ির ধাপ ছিল না। চত্বর ছিল না। মিনার ছিল না। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ছাউনির পাশে একটুখানি খালি জমি। সে জমি আমাদের দেশের কিশোর সালাম বরকতের রক্তে ভিজে লাল হয়েছিল। সে রক্ত নয়। বীজ। সে বীজ থেকে শুধু মিনার হয়নি। সে বীজ থেকে বৃক্ষ হয়েছে। সে বীজ থেকে একটা জাতি জন্মলাভ করেছে। অমৃতের কথা আমরা শুনেছি। রূপ কথায়। পুরানের কাহিনীতে। অমৃত আহরণের জন্য একদিন দেবতারা সপ্তসিন্ধু মন্থন করেছিল। অমৃত সুধা পান করে দেবতারা অমর হয়েছিল। আমরা তো কেউ দেবতা নই। আমরা সাধারণ মানুষ। বর্বর দস্যু যখন আমাদের মারে তখন আমরা অসহায় হয়ে কাঁদি। ওরা যখন আমাদের মুখ বেঁধে দেয় তখন আমরা বোবা হয়ে যাই। আমরা গুমরে মরি। ওদের মারে আমরা মরে যাচ্ছিলাম। আমরা কে তা আমারা জানতাম না। আমাদের গর্ব করার কী আছে তা আমরা জানতাম না। আমাদের বোবা মনে সেদিন একটাই আর্তনাদ ছিল। কোথায় অমৃত? কোথায় অমৃত-সন্তান যারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনে নতুন প্রাণ জাগাবে। যারা আমাদের মুখে ভাষা জোগাবে।

আমরা দেবতা নই। কিন্তু আজ আমরা বলতে পারি আমরা বরকত সালামের মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু, দোসর। আমরা বরকত সালামের প্রিয়জন। বরকত সালামকে আমরা ভালোবাসি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বরকত সালাম আমাদের ভালোবাসে। ওরা আমাদের ভালোবাসে বলেই ওদের জীবন দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করেছে। ওরা আমাদের জীবনে অমৃতরসের স্পর্শ দিয়ে গেছে। সে রসে আমরা জনে জনে, প্রতিজনে এবং সমগ্রজনে সিক্ত। আমরা তাই

অমরতা পেয়েছি। আজ আমরা বলতে পারি দস্যুকে, বর্বরকে এবং দাম্ভিককে : তোমরা আর আমাদের মারতে পারবে না। কেননা বরকত সালাম রক্তের সমুদ্র মন্থন করে আমাদের জীবনে অমৃতের স্পর্শ দিয়ে গেছে।

শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে বড় রাস্তা। বাস চলে। হর্ণ দেয়। মানুষ চলে। চীৎকার করে। ঢাকা শহরের জীবন বয়ে যায়। মানুষের জীবন বয়ে যায়। আমরা শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে আসি যাই। আমরা হাসি। তর্ক করি। দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকি। পোস্টার লাগাই। আমরা কেউ ছাত্র। কেউ কেরানী। কেউ দোকানী। কেউ কর্মচারী। শহীদ মীনারের দিকে আমরা সব সময়ে তাকাইনে। বরকত সালামকে আমরা সব সময়ে হাত তুলে সালাম জানাইনে। ওদের জন্যে মোনাজাত করিনে। কিন্তু ছাত্র শিক্ষক দোকানী কেরানী কর্মচারী কেউ আমরা কল্পনা করতে পারিনে যে শহীদ মিনারটা ওখানে নেই। কেউ কি কল্পনা করতে পারে যে বরকত সালাম আর তার সাথিরা আমাদের অমর রক্ষী হয়ে ওখানে আর পাহারা দিচ্ছে না? না, তা আমরা কেউ ভাবতে পারিনে। তেমন হলে যে ভয়ানক শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তাতে আমরা কেউ আর আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবো না। কেউ না। আমি না। ছাত্র না। দোকানী না। কর্মচারীও না। বরকত সালাম আমাদের দিনের সূর্য, রাতের তারা। আমাদের আলো। আমাদের বাতাস। আগের দিনের মানুষ সূর্যের বন্দনা গাইত। সকালে উঠে হাত তুলে সূর্যকে স্বীকার করত, নমস্কার জানাত। কেননা তারা জানত সূর্য বাদে তাদের অস্তিত্ব নেই। আজকের মানুষ আমরা সূর্যকে বন্দনা করিনে। কিন্তু তবু সূর্যের অস্তিত্বকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? সেই আদিকালের মতো আজো এ কথা সত্য যে সূর্যের তাপেই আমাদের অস্তিত্ব। আর প্রায় বিশ বছর আগের মতো আজো একথা সত্য যে বরকত সালামের জীবনের তাপেই আমরা জীবিত।

কিন্তু বরকত সালামও আকস্মিক নয়। জীবনেই জীবন সৃষ্টি। জগতের কোনো কিছুই হঠাৎ নয়। আকস্মিক নয়। বরকত সালাম নিজেরাই সেদিন বলেছিল ওরা হঠাৎ খসা নক্ষত্র নয়। বরকত সালাম মুমূর্ষু দেশের কানে বহু দিন ধরেই আশ্বাস দিয়ে বলছিল : তোমরা ভয় করো না। আমরা আসছি। আমরা আসব। কেউ আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কেননা আমরা আমাদের মায়ের মুখের ভাষা। আমরা আমাদের পিতার মনের আশা। আমরা আমাদের বোনের চোখের স্বপ্ন। আমরা আমাদের জাতির সম্মান। জাতির মর্যাদা। আমাদের অপর নাম জীবন। কোন মৃত্যুই জীবনক ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আমরা আসব।

বায়ান্নর শহীদ মিনারের চত্বরে পৌঁছতে কতটা সিড়ি পেরোতে হয় তা আমি আজো গুনিনি। কিন্তু যখনি আমি ঐ সিড়ির ধাপ বেয়ে চত্বরে উঠতে চেয়েছি তখনি আমার মনে হয়েছে, এ সিড়ি শুধু সিড়ি নয়। এ সিড়ির ধাপ চত্বরের

প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে বরকত সালামেরই পূর্বাভাস। ওদের আগমনের ধ্বনি।

আজ যারা কিশোর, যারা ছাত্র তাদের কাছে মধুর ক্যান্টিন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা কতো পরিচিত। মধুর ক্যান্টিন শুধু ক্যান্টিন নয়। মধুর ক্যান্টিন কতো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অগ্রদূত। বটতলা কেবল বৃক্ষমূল নয়। বটতলা কতো ঐতিহাসিক জোটের মঞ্চভূমি। কিন্তু পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের আম গাছটিকে আজ অনেকে চেনে না। আমরা কিন্তু ঐ আম গাছটিকে চিনতাম। ঐ আম গাছের নিচেই একদিন বরকত সালামদের আগমনী-সড়ক রচিত হয়েছিল।

ঘটনা তারিখ বুঝে ঘটে না। ঘটনাকে আমরা তারিখ দিয়ে স্মরণ রাখি। ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখ নয়। ঘটনা। কিন্তু বায়ান্ন সালের আগের সেই প্রস্তুতি পর্বের ঘটনাকে মনে করতে যেয়ে আজ আর তারিখ খুঁজে পাইনে। কিন্তু ঘটনার যে টুকরো আমরা মনের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে তাদের আমি চোখ বুঝলেই দেখতে পাই।

একদিনের কথা মনে পড়ে। ১৯৪৮ সালেরই কোনো একদিন। আমার নিজের ছাত্রত্ব শেষ হলেও তখনকার আর্টস বিল্ডিং-এর সামনের আম গাছের আকর্ষণ আমি তখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আম গাছের তলায় সভা বসবে। কে সভাপতিত্ব করেছিল, আজ আর তা মনে নেই। রাস্তায় ১৪৪ ধারার নিষেধ। কিন্তু সেই নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' মুখে নিয়ে মেডিকেল কলেজের লোহার রেলিং টপকে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের মাঠ পেরিয়ে, জগন্নাথ হলে প্রতিষ্ঠিত আইন সভার উল্টো দিকে যে আমরা হাজির হয়েছিলাম সে স্মৃতি কিছুতেই মুছে যেতে চায়না। সেদিন কোন রক্তারক্তি হয়নি। কেমন করে ঘটনার সংকট সেদিনের জন্য কেটে গেছিল, তা মনে নেই। হয়ত বা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মন-জয়-করা কথা বলার শক্তিতে। কারণ এখনো স্মৃতির পটে সেদিনকার ছাত্র জমায়েতের সামনে সেই বিপুলকায় পুরুষটির হাজির হওয়ার ছবিটি ভাসছে।

আর এক দিনের স্মৃতি।

মিছিল বেরিয়েছে। কোনখান থেকে তার শুরু হয়েছে তা আমি জানিনে। আমার চোখে ভাসছে কার্জন হল আর হাইকোর্টের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে মিছিল এগুচ্ছে। ছাত্রদেরই মিছিল। আওয়াজ উঠছে অনেক। কিন্তু সব আওয়াজের মূল আওয়াজ হচ্ছে : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিছিল এবার হাজী ওসমান গনি রোডে ঢুকে পড়েছ। মিছিলের গতি বেড়ে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিছিল ইডেন বিল্ডিংস এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর কিছুক্ষণ পর দেখলাম ছেলেরা কোনো এক মন্ত্রীকে তার কামরা থেকে নিয়ে এসেছে। মন্ত্রীকে উঠিয়ে দিয়েছে একটা

বাক্স কিংবা কিছু উঁচুর উপর। সেখান থেকে উজির সাহেব বলছেন : বাবারা তোমরা বিশ্বাস কর, আমি বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি। আমি বলছি, বাংলা ভাষা ভালো। পৃথিবীর সব চাইতে ভালো ভাষা, বাংলা ভাষা। উজিরের কথা শুনে হাসব কিংবা কাঁদব তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। উজির সাহেব বলছেন, বাংলা ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ভাষা। আর এঁরাই তাকে আমাদের রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করছেন। আমি অবাক হচ্ছিলাম তরুণদের শক্তি দেখে। একটি একটি করে দেখলে এদের তো কোনোই শক্তি নেই। কিন্তু হাজার মিলে এরা কী শক্তিরই না সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শক্তি কি কেবল সংখ্যাতে? না। তা নয়। শক্তি আদর্শের ন্যায্যতায়।

আর একদিনের স্মৃতি।

সেও নিশ্চয়ই ১৯৪৮ সালের ঘটনা কায়েদে আজম এসেছেন পূর্ব-পাকিস্তান ভ্রমণে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এই তাঁর পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম আসা। হাজারে হাজারে নয়। লক্ষের কোঠায় মানুষ যেয়ে হাজির হয়েছে রেসকোর্সের ময়দানে। পশ্চিম প্রান্তে কায়েদে আজমের মঞ্চ করা হয়েছে। পূর্ব-বঙ্গে তখন মুখর ছাত্র-জনতার আওয়াজ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। নাজিমুদ্দীন আর নুরুল আমীন সাহেবরা তখন পূর্ব-বঙ্গের শাসন চালান। লক্ষ জনতা হাজির হয়েছে রেসকোর্সে। কায়েদে আজম পূর্ব-বঙ্গের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কী বলেন তাই শুনতে। এমনিতেই দেরি হয়েছে কায়েদে আজমের আসতে। জনতা অস্থির হয়ে উঠেছে। অবশেষে এলেন তিনি। সেই পরিচিত শীর্ণকায় দীর্ঘ মানুষটি। অস্থির জনতাকে শান্ত করার জন্য ধমক দিয়ে বললেন : বৈঠ্ যাও। খামোশ ছে সোন। তাঁর সুরের কঠিনতা আমার কানকেও সেদিন উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। সেই উদ্বেগ শেষ হতে না হতে শুনলাম তিনি বলছেন ইংরেজিতে : আই টেল ইউ, উর্দু এ্যালোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগোয়েজ অব পাকিস্তান। "আমি সোজা বলছি, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" এই অকরুণ আঘাতে জমায়েত লক্ষ মানুষ সেদিন স্তম্ভিত হয়েছিল। ছাত্রদের বেদনা ফেটে পড়েছিল তাদের নিজেদের হলের সাজানো তোরণ ভেঙে ফেলার মধ্য দিয়ে। আর পড়েছিল পরের দিন কার্জন হলের সমাবর্তনে। সেদিন সেই সমাবর্তনে আমিও শরীক হয়েছিলাম। তার স্মৃতি মনের পটে এমন করে আটকা পড়ে থাকতোনা যদি বরকত-সালামের অগ্রদূতরা সেদিন গম্ভীর আর মিলিত কণ্ঠে হঠাৎ তিনটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ না করত। আর শব্দ তিনটি ছিল : নো, নো, নো। না, না, না।

সমাবর্তনে পাস করা ছাত্রদের সার্টিফিকেট বিতরণ হয়ে গেছে। কায়েদে আজম এবার প্রধান অতিথির ভাষণ দেবেন। উপযুক্ত মর্যাদায় কার্জন হলের বিরাট মিলনায়তন শান্ত। কায়দে আজম বক্তৃতা করে চলেছেন। ইংরেজি ভাষাতে। কাটা

কাটা তাঁর কথা। অকরুণ কাঠিন্যে আজো তিনি বললেন : 'আই টেল ইউ : উর্দূ এ্যালোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগোয়েজ অব পাকিস্তান।' আহত তরুণের দল জাতির বিবেকের বাণী হয়ে এক অপূর্ব ঐক্যতানে বেজে উঠল : 'নো, নো, নো।'

আমার এটুকুই মাত্র মনে আছে। আর সেদিন এটুকুই মাত্র ঘটে ছিল। তিনটি মাত্র শব্দ : না, না, না। অন্যায়কে আমরা মানবো না, মানবো না, মানবো না। এমন কথা বরকত-সালামের ভাই—এরাই তো বলতে পারে। আর ঠিক তারাই বলেছিল। আর সেই আওয়াজই প্রতি-মুহূর্তে জমতে জমতে বরকত-সালামদের আসার পথ তৈরি করেছিল। অপরাজেয় ন্যায়ের সড়ক বানিয়েছিল। শহীদ মিনারের সিঁড়ি এমনি করে তৈরি হয়েছিল।

১৯৭০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ

কথারম্ভ

চিন্তাটি আমার মনে বছরখানেক আগে এসেছিল। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। আমি 'রাজ্জাক স্যার' বলি। সেই ১৯৪২ সালে আজ এই '৭৭ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে, আমি যখন ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে বি.এ. অনার্স ক্লাসে ভর্তি হই তখনো তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। তখন থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত ধারাবাহিক এবং অবিচ্ছিন্নভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে এবং শিক্ষক হিসেবে জড়িত রয়েছেন। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়তেই ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৩১ সালে। তখন থেকে ধরলে পঁয়তাল্লিশ বছর, অর্ধশতাব্দীর সচেতন সম্পর্ক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামীদামী অধ্যাপক অনেক আছেন। কিন্তু অধ্যাপক রাজ্জাকের মতো এত দীর্ঘ সম্পর্কের অধ্যাপক আর কে আছেন? আর এই সময়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটেছে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিকথা অধ্যাপক রাজ্জাকের ন্যায় জীবিত খুব কম অধ্যাপকই জানেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করার একাধিক তাৎপর্য আছে। পূর্ববঙ্গ ধর্মগতভাবে মুসলিম—প্রধান। কৃষক-প্রধানও। পূর্ববঙ্গের এই সমাজে আধুনিককালে শিক্ষা ও চেতনা বিস্তারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিভাগপূর্ব থেকে এই দেশের মধ্যবিত্ত তরুণসমাজে রাজনৈতিক ধারা-উপধারা সৃষ্টিতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ইতিহাস নেই। কথাটা কিছুটা আলোচিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সমিতি আয়োজিত একটি সেমিনারে : ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৬-এ। অধ্যাপক ডক্টর আবদুর রহিম 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজের জাগরণ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সে প্রবন্ধটির ওপর প্রাসঙ্গিক একটি আলোচনা

আমিও করেছিলাম। কিন্তু আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস তত জানিনে। আর ইতিহাসের কথা বলতে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল, তার ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির বর্ণনাকে আমি বুঝতে চাচ্ছিনে। ইতিহাস বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে যে শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনবোধের পরিবেশ সৃষ্টিও বিবর্তিত হয়েছে, তার ইতিকথাকেই আমি বোঝাতে চেয়েছি। আর এই ইতিকথাই অধিকতর মূল্যবান। এই ইতিকথা লিখিতভাবে দিতে পারতেন অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। কিন্তু তাঁর এক স্বভাব যে তিনি কিছু লেখেন না। লিখতে তাঁর ভয়ানক অনিচ্ছা। অথচ সুন্দর আকর্ষণীয় আলাপচারী মানুষ তিনি। তাঁর আলাপে সমাজজীবনের বিভিন্ন যুগ এবং দিক সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এবং জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পায়। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেও আমাদের মুগ্ধ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত শিক্ষক-কর্মচারীর পদপ্রাপ্তি ও পদোন্নতির উপদলীয় কোন্দল ও রাজনীতিতে আগ্রহের চেয়ে অধিক আগ্রহ তিনি বোধ করেছেন জ্ঞানের চর্চায়, পুস্তক সংগ্রহ ও পাঠে। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি অগোছাল হলেও বিদ্বজ্জনের নিকট তা অশেষ রহস্যের আকর বলে বোধহয়। নতুন এবং পুরনো, বিশেষ করে পুরনো গ্রন্থ সংগ্রহে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। গল্প করতে ভালবাসেন। আনুষ্ঠানিক বক্তৃতাতে স্বভাবগতভাবে ভয় পান। এ কারণে শিক্ষকতা করেও শিক্ষকোচিত বক্তৃতা ক্লাসেও কখনো করেন নি। এটা তাঁর সম্পর্কে একটি প্রতিক্রিয়ার উৎসও বটে। অধ্যাপক রাজ্জাক একে তাঁর দুর্বলতা বলে সহাস্যে আজো স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর কিছু না লেখার অভ্যাস দুঃখজনক। অথচ তিনি 'পলিটিক্যাল পার্টি', 'রাজনীতিক দল' শিরোনামে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে যে গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে তৈরি করেছিলেন তা বিশ্লেষণী চিন্তার পরিচয়ে বিশিষ্ট। সে রচনা তাঁর ইংরেজিতে। কিন্তু তরুণ সমাজকে তিনি উৎসাহিত করেন বাংলা রচনায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের বিস্তারিত কোনো ইতিহাস নেই। তাঁর উপাদানও ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট ও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এ বেদনাবোধ থেকে আমার চিন্তা জেগেছিল, অধ্যাপক রাজ্জাক নিজে না লিখলেও আমার তাঁর সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে ঢাকা ইউনির্ভাসিটির সেই গোড়া থেকে তার বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের স্মৃতিকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে পারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস তৈরিতে তার মূল্য নিশ্চয়ই কম হবে না।

এই চিন্তা থেকে ১৯৭৬-এর জুলাই মাসে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করি তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণের। আনুষ্ঠানিকভাবে এরূপ প্রস্তাব দিলে তিনি সংকোচ করে অস্বীকার করবেন, এ কারণে তাঁর প্রায় অজ্ঞাতেই একাজ আমি শুরু করি। এ ইচ্ছার গোড়াতে বাংলা একাডেমির প্রকাশনা—পরিচালক ফজলে রাব্বি আমার সাথে ছিলেন। তিনি তাঁর শব্দগ্রাহক যন্ত্রটি দিয়ে অধ্যাপক রাজ্জাকের আলাপ

রেকর্ড করে রাখতে আমাকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক রাজ্জাক বেশ 'মুডি' লোক। এ কারণে মাঝে-মাঝে বিরতিসহ দীর্ঘদিন আমাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর যে স্মৃতি আছে তা ধরে রাখার চেষ্টা করতে হয়েছে। বিষয়টি প্রথমে যত অসম্ভব মনে হয়েছিল, আলাপটি শুরু করার পর তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ আমাকে উৎসাহিত করে সে আশঙ্কাকে দূর করেছে। প্রায় আটটি ফিতায় অধ্যাপক রাজ্জাকের স্মৃতি প্রায় মাসকালের বৈঠকে আমরা গ্রহণ করি। তারপরে এক বছর এ নিয়ে আর কোনো কাজ করতে পারি নি। এ কাজটিকে অপর দশজন পাঠকের সামনে বোধগম্য আকারে উপস্থিত করার জন্য প্রয়োজন অধ্যাপক রাজ্জাকের স্মৃতিকথার সেই 'টেপ'কে বাজিয়ে শুনে শুনে কাগজে লিখিত আকার দেওয়া। এ কাজটি করতে যেয়ে দেখলাম, এ খুব সহজ কাজ নয়। পূর্বে একে সহজ মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল বিজ্ঞানের অলৌকিক অন্যতম দান ক্ষুদ্রাকারের ক্যাসেট টেপরেকর্ডারটি বক্তার মুখের কাছে ধরলেই তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস, হাসিকান্নাসহ সব উক্তি অমর হয়ে থাকবে। তারপরে বক্তা লোকান্তরিত হলেও তুমি তার সেই কণ্ঠস্বর যতবার ইচ্ছা ততবার শুনতে পারবে। এ কথাটি সত্য। আর এজন্য বিজ্ঞানের এরূপ কৌশল আমাকে মোহিত করে। কিন্তু আসল কাজের পরিশ্রম তাতে যে কিছু লঘু হয় না, সেকথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি সেই ক্যাসেট বাজিয়ে তার শব্দ কাগজে লেখার চেষ্টা করার সময়ে। এমন কাজ যাঁরা করেছেন এবং করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা ব্যতীত এর দুরূহতা এবং মেজাজ-নষ্টকর ব্যাপারকে কেউ বুঝতে পারবেন না। যে কোনো বক্তার বক্তৃতা শব্দ—রেকর্ড থেকে লিখিত অবস্থায় নেওয়া কষ্টকর। অধ্যাপক রাজ্জাকের ক্ষেত্রে দেখলাম, এটি দুরূহতম। কারণ অধ্যাপক রাজ্জাকের পরিচিতজনেরা জানেন, অধ্যাপক রাজ্জাক কথা বলেন আমাদের মধ্যবিত্তের সাধারণ কথ্য ভাষায় নয়। তাঁর আলাপে ঢাকার স্থানীয় অধিবাসীদের আকর্ষণীয় উচ্চারণভঙ্গির প্রাধান্য। তাতে তাঁর আলাপ শুনতে যতটা আনন্দের সঞ্চার করে তা লিখতে ততটাই অসুবিধার সৃষ্টি করে। এক কথায় বলা যায়, তাঁর আলাপ হুবহু আদৌ লেখা সম্ভব নয়। তাই তাঁর কথা 'রেকর্ডে' শুনে তার মর্মার্থই আমাকে লেখার চেষ্টা করতে হয়েছে। হুবহু লেখা সম্ভব হয় নি। তাতে ক্ষতি এই হয়েছে যে তাঁর আলাপের মূল আমেজও রসটি তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তথাপি আমেজ ও রসের চেয়েও তাঁর বক্তব্যের এবং স্মৃতিচারিত ঘটনা ও মূল্যবোধের একটি স্থায়ী গুরুত্ব আছে মনে করে আমি আমাদের সাক্ষাৎকারের সেই বিবরণটি যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

অধ্যাপক রাজ্জাকের আলাপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইংরেজি বাক্য কিংবা বাকাংশে প্রচুর এসেছে, যেমন আমাদের অপর পাঁচজনের আসে। সে সব বাক্য বা বাক্যাংশের বাংলা দেওয়া যায়, কিন্তু আলাপের মূল আমেজটি রাখার চেষ্টা করতে যেয়ে আমি তার বাংলা করি নি, ইংরেজি রেখে দিয়েছি। আমাদের এ আলোচনাটি

যে খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল তা নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের এগুতে হয়েছে। কথায় কথা উঠে এসেছে। ঘটনা ঘটনাকে উজ্জীবিত করেছে। আমাদের মূল প্রসঙ্গ, অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিকথার সঙ্গে হয়ত সে কথা বা ঘটনার সম্পর্ক তত প্রত্যক্ষ নয়। আবার তা একেবারে সম্পর্কহীনও নয়। তাই এই আলাপচারের কোনো প্রসঙ্গই বর্তমান বর্ণনা থেকে আমি বাদ দিই নি। এদিক থেকে কথার স্ত রটিকেই কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বোধহবে। প্রথমে সাক্ষাৎকারে কেমন করে যেন আলাপটি ঊনবিংশ শতকের সমাজ নিয়ে শুরু হয়। অবশ্য অধ্যাপক রাজ্জাকের দিক থেকে এটি আকস্মিক নয়। কেননা ঊনবিংশ শতকের উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলার ইতিহাস, সমাজ, শিক্ষা এবং হিন্দু ও মুসলমান সমাজের শিক্ষিত অংশের চিন্তার বিবর্তন নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন চিন্তাভাবনা করেছেন। এ শতাব্দীর ঘটনাবলি সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে জ্ঞাত। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজে শিক্ষা ও চেতনার বিকাশের কথা উঠতেই অধ্যাপক রাজ্জাক ঊনবিংশ শতক সম্পর্কে কিছু কথা বলেন সেই আলোচনাটির বর্ণনা দিয়েই আমরা এই সাক্ষাৎকারের বিবরণীটি শুরু করেছি।

আশুতোষের কথা ১৭.০৭.৭৬

বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের কোনো কথা বোধহয় আশুতোষ মূর্খার্জীর উল্লেখ বাদে সম্ভব নয়। সে কারণেই এদিন আশুতোষের কথা উঠেছিল। আর আশুতোষের সঙ্গে হিন্দু কিংবা মুসলমান শিক্ষিত সমাজের সম্পর্কের কথা উঠেছিল।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : স্যার আশুতোষ অবশ্যই হিন্দু ছিলেন। আর এটা তো স্বাভাবিক, তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলের কথাই আগে চিন্তা করবেন। আর সত্যিকারভাবে 'ভদ্রলোকের' আত্মীয় ভদ্রলোকই। আর এ ব্যাপারে আশুতোষ উদার ছিলেন। মুসলমান 'ভদ্রলোকও' তাঁর আত্মীয়সম ছিল। সলিমুল্লাহ, মানে নওয়াব সলিমুল্লাহ, সেদিক থেকে তাঁর আত্মীয় ছিলেন। তাঁর কথা বলতে আশুতোষ উচ্ছ্বসিত হতেন। আর তাই ছেলে হাবিবুল্লাহ গুণাগুণ যাই থাক, আশুতোষের কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা পেতে কোনো অসুবিধা হয় নি। মোটকথা ভদ্রলোকের আত্মীয় ভদ্রলোক।

পুরনো শিক্ষিত মুসলমানদের কথা উঠতে বোধহয় সোহরাওয়ার্দী পরিবারের কথা উঠেছিল।

রাজ্জাক সাহেব বললেন : আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর বাবা ছিলেন মৌলবী ওয়ায়দুল্লাহ। জাস্টিস আমির আলীর অটোবায়োগ্রাফিতে একটা সেন্টেন্স আছে। আই আন্ডারস্ট্যান্ড, হিজ সন্স এ্যাফেক্ট 'সোহরাওয়ার্দী' আফটার দেয়ার নেম। মৌলবী ওয়ায়দুল্লাহ ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন। তিনি যখন মারা যান তখন স্বাভাবিকভাবে তাঁর কাফনের পয়সা ছিল না। কারণ তিনি যথার্থই ভদ্রলোক

ছিলেন। ... ওয়াদুল্লাহকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিল নওয়াব পরিবার। খুব সম্ভব সলিমুল্লাহ। ওবায়দুল্লাহর সব ছেলের লেখাপড়া আহসান মঞ্জিলের পয়সায়। দিস, অফকোর্স, ডাস নট ইনক্লুড শহীদ সোহরাওয়ার্দীস ফাদার জাহেদ সোহরাওয়ার্দী।

ফজলে রাব্বি বললেন : কিন্তু আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী তো 'সোহরাওয়ার্দী' ছিলেন? আরে না, এরা কেউই 'সোহরাওয়ার্দী' নয়। এ ক্ষেত্রে জাস্টিস আমির আলীর কথাই ঠিক : 'আই আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ চিলড্রেন নাউ এ্যাফেক্ট 'সোহরাওয়ার্দী' আফটার দেয়ার নেম।' মৌলবী ওবায়দুল্লাহ' বলেই পরিচিত ছিলেন। আমির আলীরা স্বাভাবিকভাবে আবদুল্লাহ বা ওয়াদুল্লাহর সন্তানদের এই সম্ভ্রান্ত হওয়ার দাবি স্বীকার করতে পারে না। কারণ আমির আলীর বংশ সম্ভ্রান্ত শিয়া বংশই ছিল। হুগলি সাইডের লোক এরা। হুগলির দিকে পুরনো মুসলমান পরিবার বেশকিছু ছিল।

এ বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে আমি একেবারে অজ্ঞ। আমাদের নিজেদের কৌতূহল সলিমুল্লাহ হলের ব্যাপারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রাবাস সলিমুল্লাহ হল। নওয়াব সলিমুল্লাহর আর্থিক দানে এ ছাত্রবাস তৈরি হয়েছিল কি? সে কারণেই কি হলের নাম 'সলিমুল্লাহ' দেওয়া হয়েছে?' অধ্যাপক রাজ্জাক নিশ্চয়ই জানবেন। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম : স্যার, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের প্রথম ছাত্রাবাসের নাম যে সলিমুল্লাহ হল রাখা হল এর কারণ কী? এতে নওয়াব পরিবারের কি কোনো আর্থিক কনট্রিটিউশন ছিল?

রাজ্জাক সাহেব বললেন : আদৌ কোনো কনট্রিবিউশন ছিল না। আবদুল্লাহ 'সোহরাওয়ার্দী' লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট ছিল। এরা আহসান মঞ্জিলের টাকায় লেখাপড়া শিখেছে। এরা সলিমুল্লাহর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করত। ঢাকা ইউনির্ভাসিটি প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বছর পরে তার একটা মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর নামে একটা ছাত্রাবাস করার প্রস্তাব এঁরা করেন। মুসলিম ছেলেদের জন্য হল তখন তৈরি হয়ে গেছে। প্রথমে এ হল ছিল এখনকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বিল্ডিংয়ে। আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী বললেন : এই হলকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল করা হোক। কোনো মুসলমান ধনীর কাছ থেকেই ঢাকা ইউনির্ভাসিটি ডাইরেক্টলি কোনো ফাইনেন্সিয়াল কনস্ট্রিবিউশন পায় নাই। কথা ছিল গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ঢাকা ইউনিভার্সিটি করবে। সেই জন্য ১৯১০ থেকে কিছু টাকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আলাদা করে রাখত। ১৯২০-২১-এ এই টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০ লক্ষ। কিন্তু এই ৬০ লক্ষ টাকা বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ডিড নট গিভ টু দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি। তারা সে টাকাটা পুরো নিয়ে নিল। সলিমুল্লাহ হল যে তৈরি হল তা পুরোই সরকারের টাকায়। নওয়াব পরিবারের টাকায় নয়; নওয়াব পরিবারের জায়গাতেও নয়। রমনার যে জায়গায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি-এর পুরাই খাসমহল, সরকারের

জমি। সেটলমেন্ট রিপোর্ট-এ তাই আছে। বরঞ্চ লাখেরাজ সম্পত্তি বললে রমনা কালীবাড়িকে বলা যায়। ঢাকা শহরে লাখেরাজ সম্পত্তি কী এ নিয়ে আলোচনা চলেছে ১৮১৫ কি ১৮২০ সাল থেকে। ঢাকার নওয়াবদের জমিজমা এসেছে প্রধানত একটি সূত্র থেকে। ঢাকার স্থানীয় মুসলমানরা মৃত্যুর সময়ে কোনো কোনো সম্পত্তি নওয়াব আবদুল গনি ও আহসানউল্লাহকে ওয়াকফ করে দিয়ে যেত। ঢাকার নওয়াবদের জমির উৎস এই। তাও বেশিকিছু জায়গা জমি নয়। এটার ভেরিফিকেশন তো সোজা। যে কেউ ইন্টারেস্টেড, সে ঢাকা কালেক্টরেটে যেয়ে দেখে আসতে পারেন। কাজেই নওয়াব পরিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি দিবে, এমন জমি কোথায় ছিল? আহসান মঞ্জিলের কোনো জমি ছিল না।

আমাদের আর একটি প্রশ্ন ছিল: ঢাকার লোকের সঙ্গে ঢাকার নওয়াবদের সম্পর্ক কীরূপ ছিল?

এ প্রশ্নের জওয়াবে রাজ্জাক সাহেব বললেন : ঢাকার মুসলমানদের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মুসলমানরা এদের পরিবারকে নিজেদের সমাজের কোনো বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বলে যে গ্রহণ করেছিল, এমনও নয়।

ঢাকার পুরনো লোকদের নাম উল্লেখ করতে যেয়ে অধ্যাপক রাজ্জাক হেকিম হাবিবুর রহমানের নাম উল্লেখ করলেন।

ফজলে রাব্বি প্রশ্ন করেন : হেকিম হাবিবুর রহমান কোত্থেকে ঢাকায় এসেছিলেন? রাজ্জাক সাহেব বললেন : হেকিম হাবিবুর রহমানের বাবা এসেছিলেন দিল্লি থেকে। তিনি অসাধারণ লোক ছিলেন। লেখাপড়া ছিল এবং খুব উঁচুদরের হেকিমও ছিলেন। নওয়াব পরিবারের কথা রাজ্জাক সাহেব আরো একটু বললেন : স্যার সলিমুল্লাহ ওয়াজ ইনস্টলড এজ নওয়াব, ইট ওয়াজ বিকজ অব দি গভর্নমেন্ট। আতিকুল্লাহর নওয়াব হবার কথা ছিল। গোড়াতে এরা ব্যবসায়ী ছিল। আহসানউল্লাহর সময়তেও এরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত পুরোপুরি। সলিমুল্লাহর সময় ব্যবসা এরা একেবারেই ছেড়ে দেয়।

১৮৩৬-এ ঢাকায় গৃহের সংখ্যা

ঊনবিংশ শতকের গোড়াতে ঢাকার লোকসংখ্যা কী ছিল তার উল্লেখ করে একটি পুরনো বই ধরে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এই বই থেকে ঢাকার লোকসংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। আর সে সময়ে ঢাকার যে পতন ঘটেছিল তারও আভাস পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায়, ১৮১৪ সালে ঢাকায় বাড়ির সংখ্যা ছিল ২১০০০। কিন্তু ১৮৩৬ সালে এই সংখ্যা হয়ে গেল ১০,০০০। থ্রু-আউট নাইনটিনথ সেনচুরি ইট ওয়াজ ডিকলাইনিং। দিস ওয়াজ ডিকলাইন অব মুহাম্মেডান মোস্টলি। আঠার শতক মানে মুর্শিদাবাদে রাজধানীটা নেওয়া থেকেই এই অবনতি শুরু হয়। আস্তে আস্তে ইট গ্যাদার্ড মোমেন্টাম। বাই এন্ড অব

এইটটিনথ সেনচুরি ইট ওয়াজ ফুল। এই বইয়ে দেখা আছে যে ১৮১৪ সালে চৌদিকার ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল ৩০,০০০ টাকা। ১৮৩৬ সালে এটা হল ৮০০০ টাকা।

রাজ্জাক সাহেব বলতে চাচ্ছিলেন : রাজনীতিক পরিবর্তনে পুরনো অবস্থাপন্ন মুসলমান পরিবারগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

পুরনো যারা ছিল, দে ফেইল্ড টু একোমোডেট দেমসেলভস উইথ দি নিউ চেঞ্জেস। ফলে যার যা ছিল সব বিক্রি হয়ে যায়। এই যে আরমানিটোলাতে 'রায় হাউস', এখন যেটা মেয়েদের স্কুল, এটা একটা মুসলমান জমিদারের বাড়ি ছিল। আনন্দ রায়—পরিবার সে জমিদারের কাছ থেকে এটা কিনে নেয়। রায়রা উকিল ছিল।

পুরনো পরিবারের ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করতে যেয়ে বললেন : জেলখানার রাস্তায় হাসিনা মঞ্জিলের পেছনে কিছু বাড়ি আছে। এখনও আপনারা দেখতে পারেন। বাড়িগুলোর বিশ ফুট উঁচু ছাদ। এখন হয়ত এরা দপ্তরী কিংবা এ ধরনের কোনো পেশায় আছে। ১৯৩০-এর দিকে আমরা দেখেছি, এ পরিবারগুলো পুরনো, সম্ভ্রান্ত পরিবার। এদের বিষয় সম্পত্তি ছিল। ল্যান্ডেড প্রপারটিই প্রধান ছিল। কিন্তু কেমন করে যে নিলাম হয়ে গেছে তা টেরও পায় নি।

ঊনবিংশ শতাব্দী সম্পর্কে অধ্যাপক রাজ্জাকের একটা অভিমত এই যে ১৮৫৭-এর পরে ইংজেরা মুসলমানদের প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে তাদের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে বাদ দিয়ে ছিল আর সে কারণেই মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ল, একথা ঠিক নয়। শিক্ষিত মুসলমানরা বৃটিশ সরকার ও শাসনের সঙ্গে নন কো-অপাশেন করেছিল, একথাও ঠিক নয়। তাঁর মতে, গত শতকের গোড়াতে, এমনকি শেষের দিকেও ইংরেজ কোম্পানি ও সরকারের দপ্তরে মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা কম ছিল না। এই অভিমতের উল্লেখ করে তিনি বললেন :

১৮১৪ সালে কোলকাতার উকিলদের যে তালিকা আমরা দেখি তাতে দেখা যায় ১৬ জন উকিলের মধ্যে ১৪ জন মুসলমান। ১৮৬৫ সালে ৫০% উকিল মুসলমান। কিন্তু তারপর থেকে একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া শুরু হল। এর প্রধান কারণ, ইংরেজি শিক্ষার দিকে এই শিক্ষিত মুসলমানরা একেবারেই ঝুঁকলো না। আরো মজার ব্যাপার দেখা যায় এই যে স্কুলগুলোর গভর্নিং বডির প্রায় সব ছিল মুসলমান। গোড়াতে স্কুল যা হত তার বেশির ভাগ ইউরোপিয়ান। কিন্তু দেশীয় যা ছিল তার গভর্নিং বডির অধিকাংশ মেম্বার মুসলমান। আপনারা যারা গবেষণা-টবেষণা করেন তাদের কাছে আমার এটাই প্রশ্ন : ঢাকা মাদ্রাসা এবং পুরনো স্কুলগুলোর ছাত্র কারা। আরো অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা ছিল তার ছাত্র কারা। কেন এই শিক্ষকদের বংশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি শিক্ষায় এল না। একটা কারণ বলা যায়, শিক্ষা খুব খরচের ব্যাপার ছিল। দ্যাট এডুকেশন ওয়াজ কস্টলি। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না।

আমরা বললাম : আপনার একথা ঠিক। কারণ, এই যে উকিল যাদের কথা আপনি বললেন, এরা তো অবস্থাপন্ন ছিল। তাহলে তারা কেন ইংরেজি শিক্ষায় এল না?

রাজ্জাক সাহেব বললেন : সেটাই তো রিডল। কেন তারা আইল না? 'আই ডোন্ট নো'। প্রথম ব্যারিস্টার দুজনকেই দেখতে পাই মুসলমান। তাদের ছেলেপেলে—হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দেম? বিলেত থেকে আমি এদের লিস্ট নিয়ে এসেছিলাম—যদি আপনারা কেউ কোনো সময়ে এদের ট্রেস করতে পারেন। ১৮৩১ সালে প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিল। যারা তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হল, তাদের অধিকাংশ মুসলমান।

আমরা প্রশ্ন করলাম: এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা কি ইংরেজি জানতেন?

না, তারা ইংরেজি জানতেন না। এঁরা ফার্সি পড়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কেউই ইংরেজি জানতেন না। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির এরকম কর্মচারী চাই, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চাই। কিন্তু রিক্রুটমেন্ট করবে কোত্থেকে? 'নেটিভদের' তখন অবস্থা কী? নেটিভরা যে-চাকরিতে এলিজিবল ছিল তার মধ্যে হাইয়েস্ট ছিল প্রিন্সিপাল সদর আমিন। ১৭৯৫ কিংবা ১৮০১-এ ছয়শ' টাকা মাইনে কম নয়। এই উচ্চপদের কর্মচারী প্রিন্সিপাল সদর আমিন সব ছিল মুসলমান। এর হোল লিস্ট আমার কাছে আছে। আমি নিয়ে এসেছি। হয়ত একটি কপি আছে আনিসের কাছে। কাজেই ১৮৩১-এ যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তৈরি হল, তাদের রিক্রুটমেন্ট সবই প্রিন্সিপাল সদর আমিন থেকে। ইংরেজি শিক্ষার কথা বলছেন? বি.এ.পাস করা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট? ১৮৩১ সালে তো কোলকাতা ইউনিভার্সিটি হয় নি। সুতরাং বি.এ. পাসের কথা ওঠে না। কোম্পানিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফার্সি শিক্ষিতদের মধ্যে থেকেই নিতে হয়েছে। এর চেয়ে নিচের দিকের ডেপুটি ছিল হিন্দু। ১৮৬৫ সালে সবচেয়ে বেশি মাইনে পাওয়া উপরের তিনজন ডেপুটি ছিলেন মুসলমান। এদের ছেলেদের কী হল, এটা আমরা কেউ বলি না, কেউ বলতে পারি না।

আমরা আবার প্রশ্ন করলাম: এদের বংশ কি একেবারে শেষ হয়ে গেল : এদের fall হলো?

অধ্যাপক রাজ্জাক আবার জোর দিয়ে বললেন : এই কথাই আমি কইবার লাগছি। এদের হইল কী? এই ফ্যামিলিগুলোকে আইডেন্টিফাই করে আপনারা সন্ধান করুন : হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দেম? এই তো সেদিন কথায় কথায় জানলাম, যে শামসুর আলম আমাদের পুলিশের ডি. আই.জি. ছিল ওর গ্রান্ডফাদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কিন্তু অবস্থার দিক থেকে দেখা যায় তার বাবার আমলে শামসুল আলম যখন পড়ছে তখন তার লেখাপড়ার খরচ চালানো তার বাবার পক্ষে দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে : হার্ডলি হি ওয়াজ এ্যাবল টু পে হিজ ওয়ে।

চলতি ধারণার ব্যতিক্রম এই অভিমতের কথা আরো বলতে যেয়ে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আনিসের প্রথম বইটির প্রায় ১০০ পৃষ্ঠার মধ্যে একটা কথা এই ছিল যে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার গোড়াতে ঘটে নি কিংবা ইংরেজি শিক্ষায় যে মুসলমানরা পিছিয়ে রইল তা নট বিকজ অব দি স্পিরিট অব নন-কোঅপারেশন : মুসলমানদের অসহযোগিতার কারণে নয়। কারণ গোড়াতে মুসলমানদের কোঅপারেশন ছিল। সব বড় বড় চাকরি-বাকরি মুসলমানরা করেছে। কাজেই নন-কোঅপারেশনের কথা আসে কোত্থেকে; আনিসের সঙ্গে কথাটা হয়েছিল মৌখিকভাবে। সেই ফিফটিতে। পঞ্চাশের দিকে। তখন নিজের মেমোরির ওপরও ডিপেন্ডেন্স বেশি ছিল। আমি কোনো তথ্য লিখে টিকে আনি নাই। কিন্তু ড. করিমদের এ ব্যাপারে আপত্তি আছে। কিন্তু এবার যখন লন্ডন গেলাম তখন লিখেই আনলাম। দিস ইজ অ্যাবসলুটলি ট্রু। যে পিরিয়ডে, আপনারা বলছেন, মুসলমানরা নন কোঅপারেট করছে সেই সময়ে কোম্পানির চৌদ্দআনা কাজই মুসলমানরা করছে। আর তো কেবল সে যুগের মুসলমানদের কথাই নয়। এই প্যারালেল তো টেরোরিস্ট মুভমেন্টের সময়ও পাওয়া যায়। টেরোরিস্ট মুভেমেন্ট তো ইংরেজদের হত্যা করার মুভমেন্ট কিন্তু তখন ইংরেজের সব কাজ তো হিন্দুরা করছে। সরকার ১৯১২-তে আই. বি. ডিপার্টমেন্ট গঠন করে। আর এটা ছিল মোস্ট সেনসিটিভ ডিপার্টমেন্ট, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের অন্যতম মাধ্যম। এর প্রথম বছর বাজেট হল ১২ লক্ষ টাকা। আর তার সাড়ে দশ লক্ষই তো হিন্দু পুলিশ কর্মচারীরা ভোগ করেছে। কিন্তু গোখলে নাকি একবার এ্যাসেম্বলিতে ইংরেজদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এডুকেটেড ইন্ডিয়া ইজ এগেইনস্ট ইউ। তখন ইউরোপিয়ান হোম মেম্বার হেসে জবাব দিয়েছিল : কই, যারা সবচেয়ে বেশি এডুকেটেড তারা তো আমার কাছেই আসে, চাকরির জন্য। যাদের আমি নেই না, তারাই মাত্র তোমার সাথে যায়। আসলে রোমান্টিসিজম দিয়ে এ্যাডমিনিস্ট্রিশন চলে না। আর রোমান্টিক আইডিয়া ইতিহাস নয়। ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে স্যার সৈয়দ আহমদের জন্ম সেখানে মুসলমানের সংখ্যা ১৬% আর এই ১৬% মুসলমানের ৮০% ই টাউন টু ১৯২০ ইংরেজের চাকরি করেছে, বড় বড় চাকরি সবই তাদের দখলে ছিল। অথচ আপনাদের ধারণা যে ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের নন-কো-অপারেশন স্যার সৈয়দ আহমদ দূর করলেন। কীসের নন-কো-অপারেশন? ১০০%-এর উপরে যদি কোনো কো-অপারেশন দেওয়ার থাকে মুসলমানরা তাই দিয়েছে। এটা সত্য যে ভেরি লার্জ নাম্বার অব মুসলমানস ওয়েয়ার ভিকটিমাইজ্‌ড এ্যাজ এ রেজাল্ট অব ১৮৫৭। একদিক দিয়ে দেখলে সাধারণভাবে বেঙ্গলে হিন্দুদের যে পজিশন, ইউপিতে মুসলমানদের ছিল সেই পজিশন : কেবল তফাৎ এই যে, ইউপি-র মুসলিম মাইনরটি ইজ মোর ইনসিগনিফিক্যান্ট দ্যান দি হিন্দুস ইন বেঙ্গল। বাংলায়

অনুপাতটি ছিল ৫৫% আর ৪৫%, অর ইউপিতে ৮৫% আর ১৫% পঁচাশি পার্সেট হিন্দু পনের পার্সেন্ট মুসলমান। বাট দিস ১৫% এ্যাকাউন্টেড ফর এভরি জব অব ইমপরট্যান্স। আর স্যার সৈয়দের ইনফ্লুয়েন্স-এর মূলে কী? সেকি ইউ.পি? পাঞ্জাব বিহারে মুসলমানদের পার্সেন্টেজের আধিক্য? আসলে স্যার সৈয়দের মারা যাওয়া পর্যন্ত পাঞ্জাব ও বেঙ্গলে তার ইনফ্লুয়েন্স ওয়াজ নিল। তিনি মারা যাওয়ার পরেই উই বিগ্যান টু-বিল্ড্-আপদি মিথ। তিনি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তি অবশ্যই ছিলেন। বাট হিজ এ্যাবাউডিং কন্ট্রিবিউশন হ্যাজ নথিং টু ডু উইথ হিজ এডুকেশনাল এ্যাক্টিভিটিস। রাজা রামমোহন আর স্যার সৈয়দ আহমদ : এ দুজন সম্পর্কে রং রিজন্‌স আর বিইং পারপেচুয়াল্লি এ্যাডভান্সড টু এসটাবলিশ দি রিয়েল গ্রেটনেস অব দিজ মেন।

অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর এই অভিমতটি ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বললেন :

রাজা রামমোহন রায় পারমিট হান্টার মানুষ। ব্যাসিক্যালি ইট ইজ দ্যাট। উনি ৪০ টাকা মাইনায় চাকরি করতেন। আর সেই চাকরিতেই তিনি ১০,০০০ টাকার জমিদারি করলেন। ৬-৭ বছর চাকরি করেছিলেন। এটা তো হাওয়ায় হয় নাই।' উনি সারাটা জীবন বাবার সঙ্গে মোকদ্দমা করেছেন। আবার বড় বড় কথাও কইতেন। উনি মারা গেলেন বিলেতে গিয়ে। বিলেত গিয়েছিলেন বাদশাহ শাহ আলমের উকিল হিসেবে। এটার সাথে এ্যাডভান্সড আইডিয়াস-এর কী সম্পর্ক আছে? আমি বলব, যেটা ওর রিয়েল ক্লেইম টু গ্রেটনেস, সে হচ্ছে ওর বাংলা চর্চা, বাংলাতে লেখা। এ ব্যাপারে হি ডিড নট লুক টু দি রাইট অব লেফট।

রাজ্জাক সাহেবের মতটির অভিনবত্ব আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : কেন তিনি বাংলায় লিখতে গেলেন? বাংলায় লেখা তখনো তো কোনো গৌরব বা প্রশংসার ব্যাপার হয় নি।

রাজ্জাক সাহেব জবাব দিলেন : এটাকেই আমি বলব তাঁর গ্রেটনেস। একে আপনারা ইনটুইটিভ বলেন আর যাই বলেন, আমি মনে করি উনবিংশ শতকের যে ভারতবর্ষ তার গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে এটা বুঝতে হবে যে নাইনটিনথ সেনচুরিস ইমপরট্যান্স লে ইন দি রাইজ অব দি ভারন্যাকুলার্স। দেশীয় সব ভাষার চর্চাই হচ্ছে উনিশ শতকের বৈশিষ্ট্য। একেবারে অল দি ভারন্যাকুলার্স, কেইম টু ম্যাচুরিটি ডিউরিং দি নাইনটিনথ সেনচুরি, সাউদার্ন ইন্ডিয়ার দুই একটা ছাড়া। এটা কেন হল, ইজ এ মোর ইনভল্‌ভড কোশ্চেন। সে প্রশ্ন আলাদা। রামমোহন রায়কে বোঝার জন্য এ জওয়াবের দরকার নাই। অল দ্যাট আই নিড নোট ইজ, হি সোয়াম উইথ দি টাইড। এই যে রাইজিং টাইড হুইচ গেইভ ক্যারেক্টার টু দি এন্টায়ার নাইনটিন্থস সেনচুরি, এখানে কার কী কনট্রিবিউশন, এটাই বড় প্রশ্ন। আর এই কনট্রিবিউশন—এই তাঁর গুরুত্ব। দেশী ভাষার চর্চা যারা করেছেন তাঁরাই গুরুত্বপূর্ণ, ইমপরট্যান্ট। সংখ্যায় তারা যাই হোক না কেন। সাম অব দেম এ্যাট

দি ইনিশিয়াল পিরিয়ড হ্যাড নট আন্ডারস্টুড দি সিগনিফিক্যান্স অব দেয়ার ওইন ওয়ার্ক। বঙ্কিমচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন ইংরেজিতে লেখা শুরু করলেন। বাট জাস্ট ইন টাইম দে কেইম ব্যাক টু বেঙ্গলি। এ্যান্ড দেয়ারফোর দে বিকেইম বঙ্কিমচন্দ্র এ্যান্ড মাইকেল। যদি তাঁরা কেবল ইংরেজিতেই লিখতেন অবস্থাটা কী হত, চিন্তা করে দেখুন। এই যে, তাদের চেঞ্জ, এটা যে তারা খুব বুঝেসুঝে করছেন, তা নয়। এই চিন্তা থেকে তাঁরা বাংলা লেখেন নি যে বাংলার ভবিষ্যটা তাদের হাতে; তাঁরা না লিখলে বাংলার ভবিষ্যটা নষ্ট হয়ে যাবে। তারা বাংলাতে এলেন বিকজ দে ফেইল্‌ড্ টু ফাইন্‌ড্ সেলফ এক্সপ্রেশন ইন ইংলিশ। আবার এদের সবার আগে রামমোহন রায় বাংলা লেখা শুরু করেন। আমি তো মনে করি, বাংলা ব্যাকরণই তার ক্লেইম টু ফেইম। রামমোহনের সঙ্গে স্যার সৈয়দের মিল এখানে। সারাটা জীবন স্যার সৈয়দ খালি উর্দুতে লিখেছেন। কী লিখেছেন সেটা আসল কথা নয়। লিখেছেন, সেটাই কথা। উর্দুর এই চর্চাই তার মনুমেন্ট, তার কীর্তি স্তম্ভ : ইট উইল এভার রিমেইন। আমার তো এই বুঝ। আপনাদের কথা আলাদা। আপনারা মনগড়া সব ব্যাখ্যা বার করেন। তারা কতো মহৎ, কতো উদার ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফজলে রাব্বি আলোচনাটিকে আর একটু তীক্ষ্ণ করার জন্য বললেন : রামমোহনের ধর্মপ্রচারও তো তাঁর খ্যাতি কিংবা স্থায়িত্বের কারণ হতে পারে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : না, তার নয়। তাঁর ব্রাহ্মসমাজের কথা বলছেন? অষ্টাদশ, উনবিংশ শতকে এই ধর্মসংস্কারের ব্যাপার তো শিক্ষিতদের একটা ফ্যাশনই ছিল। তাতে আর রামমোহনের বাহাদুরি কী? সকলেই তখন সর্বধর্ম সমন্বয় নিয়ে কথা কয়। রামমোহনের প্রথম লেখা এই নিয়েই, ফার্সিতে। ইট ইজ ওয়ান অব হিজ লিস্ট এব্‌ল। তাতে তার ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিচয় নেই। ধর্মসমন্বয় নিয়ে আরো অনেকে তখন লিখেছেন। রামমোহনের চেয়ে জোরালোভাবে লিখেছেন। তাঁদের সে রচনার কাছে রামমোহনের এ রচনা অকিঞ্চিৎকর। এগুলো ওটার সাথে না মিলিয়ে দেখলে ক্যাম্‌নে হবে। তাছাড়া রামমোহনকে তার সমাজও তখন গ্রহণ করে নি। উনি যে সময়ে হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে যান সে সময়ে হিন্দুদের একটা লম্বা রিপ্রেজেনটেশন পড়ে তার বিরুদ্ধে: 'রামমোহন রায় এর সাথে থাকলে এই স্কুলের ব্যাপারে আমরা থাকব না'—এই ছিল হিন্দুদের দাবি। হিন্দুদের অভিযোগ, রামমোহন 'যবনী' অর্থাৎ মুসলমান মহিলা নিয়ে ঘর করতেন। রামমোহন ধর্ম নিয়ে কী কইছেন তা নিয়া আমি মাথা ঘামাতে যাব না। আমি বলি, উনি সারা জীবনই অর্ধমাচারী ছিলেন। এর মধ্যে কোন অসত্য নেই। তখনকার দিনে সকলেই একথা জানত। যে রিপ্রেজেটেশনের কথা বলছিলাম: বর্ধমানের মহারাজ, শোভাবাজারের মহারাজ—এরা সব সংঘবদ্ধভাবে বললেন : রামমোহন স্কুলের কমিটিতে থাকলে তারা থাকবেন না।

রামমোহন ওয়াজ ডিসক্রিট। হি উইথড্রিউ। তিনি নিজে সরে গেলেন। কাজেই এ দিক থেকে বলা যায় : হি ওয়াজ নট এ ফাউন্ডার অব দি হিন্দু স্কুল।

ফজলে রাব্বি প্রশ্ন করলেন। এই যে ধর্মের প্রচার, এটা কি রামমোহন সচেতনভাবে করেছেন?

রাজ্জাক সাহেব বললেন : সচেতনভাবে করেছেন কিন্তু বুঝতে পারেন নি ওটাই তার বড় কাজ নয়। সাম টাইমস ইউ ডু সামথিং হুইচ ইজ নট দ্যাট ইমপরট্যান্ট এ্যাজ ইউ থিঙ্ক। স্যার আইজ্যাক নিউটন নাকি মনে করতেন তাঁর 'লাইফওয়ার্ক'—জীবনের কাজ 'গ্রাভিটেশনের তত্ত্ব' নয়, তার বড় কাজ হচ্ছে, বাইবেলে পৃথিবীর বয়সের যে কথা আছে তার সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা! কিন্তু নিউটনের দুর্ভাগ্য যে আমরা তার বড় কাজকে বড় বলিনে, তার সাবসিডিয়ারি কাজটাকেই প্রাইমারি বলি। রামমোহনেরও ব্যাপার তাই। তাঁর নিজের কোন কাজের কী গুরুত্ব তা তিনি বুঝেন নি।

অধ্যাপক রাজ্জাক এই ধারাতে বলতে যেয়েই বললেন : ধরুন নেহরু আর গান্ধীঃ এদের মধ্যে চিরজীবী হবেন, মানে বেঁচে থাকবেন কে? আমি বলব গান্ধী, নেহরু নয়। অথচ নেহরু গান্ধীর চেয়ে অধিক বৈজ্ঞানিক, সমাজবাদী ইত্যাদি। তবু নেহরু বাঁচবেন না। গান্ধী বাঁচবেন। কারণ তিনি হিন্দিতে রচনা করেছেন। জওয়াহের লাল বা জিন্নাহ— এরা কেউই কালের ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন না। যতটুকু থাকবেন সে কেবল মানুষের কিউরিসিটি হিসেবে, মানুষের কৌতূহলের উৎস হিসেবে। থ্রু-আউট দি মেডিয়াভ্যাল এইজ ইন ইউরোপ, পাওয়ারফুল ইনটেলেক্ট-এর অভাব ছিল না। তারা জাতে ইংরেজ, জাতে ফ্রেঞ্চ, জাতে জার্মান। কিন্তু লিখতেন তাঁরা ল্যাটিন ভাষায়। কেউ তাঁদের নাম আজ বলতে পারবে না। কিন্তু যারা ভারনাকুলারে লেখা শুরু করল, যার যার দেশি ভাষায়, তাঁরা ঠিক বেঁচে আছে। এটা ইন এসকেপেব্‌ল; অনিবার্য বাঙালি মুসলমানদের যেটা সত্যিকার ঘাটতি ছিল সে হচ্ছে এই যে বেঙ্গলি মুসলমানরা টউক টু মর্ডান বেঙ্গলি ম্যাচ লেইটার। কেন এটা হল, সেটা পরে বিচার করবেন। কিন্তু দিস ব্রড ফ্যাক্ট ইজ ইনডিসপুটেব্‌ল। অথচ বাংলা ভাষার সঙ্গে মুসলমানদের সম্বন্ধ ছিল কাস্ট হিন্দুদের চেয়ে অনেক নিকটতর। পাদ্রীদের উপর আমার একটা রাগ এজন্য যে এর জন্য পাদ্রীরা অনেকখানি দায়ী, বাঙালি মুসলমানকে বাংলা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য এদের দায়িত্ব কম নয়। পাদ্রীরা বললো, বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা। 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদকীয় ছিল : আমরা কি জন্য বাংলা ভাষার সমর্থন করি? কারণ মুসলমানরা ইহা পছন্দ করে না। ইহারা কখনো বাংলা শিখিতে পারিবে না।

আমি প্রশ্ন করলাম : স্যার, মুসলমানদের প্রতি পাদ্রীদের এই বিরাগের কারণ কী?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এই যে কেরি, মার্শম্যান, এরা ৩০০০ মাইল দূর থেকে এসেছে। এ দেশবাসীর আত্মাকে উদ্ধার করতে টু সেভ দি সোল্‌স, এর তরিকাটা কী? তাদের কথা হল, এদেশের ধর্মের বেইজ হল পলিথিস্টিক। একথা হিন্দুদের সামনে যখন বলত তখন হিন্দুরা বলত : 'হ্যাঁ, ভাল কথাই বলছে। কিন্তু মুসলমানদের কাছে বললে, মুসলমানরা ঠাট্টা করতো, তারা পাদ্রীদের ট্রিনিট নিয়ে ঠাট্টা করত। পাদ্রীরা এই ঠাট্টায় খেপে যত মারেন, ধরেন, রাগ করেন, এটা সহ্য করা যায়, কিন্তু ঠাট্টা করলে তো আর সহ্য হয় না। একেশ্বরবাদ নিয়ে বলতে গেলেই তাঁরা ঐ ট্রিনিট নিয়ে ঠাট্টা করত। এই জন্য মুসলমানদের সম্পর্কে পাদ্রীদেররাগটা একটু বেশি।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন উঠল। সে সময়ে যে ধর্মান্তরের মরশুম এসেছিল, অনেক হিন্দু যুবক খৃস্টান হয়েছিল, সে মরশুমে মুসলমানরা কী পরিমাণে খৃস্টান হয়েছিল?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : খুব সামান্য। দুএকজন ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে। কিন্তু দলে দলে নয়। এরা যখন বলত, পলিথিজম ইজ অফুল, হিন্দুরা এ্যাগ্রি করত : হয়ত ঐ ধরনের একটা কিছু হিন্দু ধর্মে আছে। কিন্তু মুসলমানদের কাছে বললে, কোনো রকমেই পাত্তা পেত না।

আমরা এ আলোচনা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকে যেতে চাইলাম। এ সময়কার ছাত্র-শিক্ষক, বিশেষ করে শিক্ষকরা যখন সংখ্যায় হিন্দুপ্রধান ছিলেন, তখন শিক্ষকদের সঙ্গে মুসলমান ছাত্রদের কীরূপ ছিল; হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যকার সম্পর্কই বা কীরূপ ছিল? আমরা বললাম : স্যার, এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : তখন হিন্দু ও মুসলমানদের কোনো কমন এ্যাক্টিভিটিস ছিল বলে আমি মনে করি নে। টেররিস্ট মুভেমেন্ট অবশ্যই একটা রিমার্কেবল ফেজ ছিল। কিন্তু তাতে মুসলমানদের ওপর কোনো প্রত্রিক্রিয়া সৃষ্টি হয় নাই।

আমি বললাম : নানা ঘটনা তো ঘটত। ১৯৩০ সালে কিছুসংখ্যক বিপ্লবী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করল। এসব ঘটনা তো পত্রিকায় বড় আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তার কি কোন প্রতিক্রিয়া পড়ে নি মুসলমান ছাত্রদের ওপর?

আমার প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক রাজ্জাক আর একটু বিস্তারিতভাবে বললেন : ঢাকাতে সিমসন, হাডসন—এসব ইংরেজ সাহেবদের মারা হল। বিনয় বোস এসবের একজন নেতা ছিল। এসব ঘটনা লেফট দি মুসলিম বডি এন্টায়ারলি আনটাচড।

: এর কোনো ঘটনার কথা আপনার মনে আছে।

: হ্যাঁ, আছে। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট-এ পড়ি। ব্যক্তিগতভাবে আমি এসব ব্যাপারে কমপ্লিটলি আনকনসার্নড ছিলাম। আমার বহু বন্ধুবান্ধব ছিল।

এগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিল এমন লোকও ছিল। যারা জড়িত ছিল তাদের আমি আশ্রয়ও দিয়েছি।

আমি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম : আপনি আশ্রয়ও দিয়েছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আফটার সিম্পসন ওয়াজ শট আফটার, একজন দেড় মাসের জন্য আমার কাছে পালিয়েছিল। কিন্তু এর বেশি কিছু না। আমার কোনো আগ্রহ হয় নি, ব্যাপারটা কী? আমি মনে করেছি এটা ওদের ব্যাপার। আমার জানার দরকার কী? আমার কিছু না, এরকমই চিন্তাই তখন ছিল।

আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন : ১৯৩১-এ অর্থাৎ যে বছর আমরা ইউনিভার্সিটিতে এ্যাডমিশন নিলাম সেই বছর একটা ছেলে ডিমনস্ট্রেশন-এ মারা গেল। সেও ভর্তি হওয়ার ছাত্র ছিল। হিন্দু ছাত্র। মারা গেল কার্জন হলের সামনে। তখন টেররিস্ট আন্দোলনে লবণ সত্যগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে হৈচৈ চলছে। ঘটনায় আই ওয়াজ অলমোস্ট এ ক্যাজুয়ালটি। কারণ যেদিন ঘটনাটা ঘটে সেদিন আমি ঘটনাস্থলেই প্রায় আটকা পড়েছিলাম। কারণ আমার তো কাণ্ডজ্ঞান একেবারেই ছিল না। ক'দিন ধরেই রাস্তায় মিছিল হচ্ছিল। কার্জন হলের সামনে এইদিন মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এই লাঠিচার্জেই ছেলেটি মারা যায়। আমার মনে আছে। পুলিশ বড় বড় লাঠি নিয়ে ছাত্রদের তাড়া করছে, মারছে। আমি তখন হাইকোর্ট মাজারের গেট বরাবর। হাইকোর্ট তখন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল। আমিঐ কলেজ থেকে বের হয়ে ইউনির্ভাসিটিতে আসব। সবে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি। এখনো ইউনিভার্সিটিতে আসি নি। কলেজ আর ইউনিভার্সিটি দুটার সঙ্গেই সম্বন্ধ। ঐ গেট দিয়ে বেরুতে যাব। জাস্ট ঐ জায়গায় আই গট কট। এখনো মনে আছে, একটা পাঠান লাঠি তুলেছে আমাকে মারার জন্য। তারপর লাঠিটা যখন পিঠে পড়তে যাবে তখন বোধহয় আমার চেহারাটা তার চোখে পড়েছে। এ্যান্ড টু হিম আই লুকড ভেরি স্মল। তাই লাঠিটা দিয়ে মারতে গিয়ে সে পাঠান হঠাৎ থামল আর তারপর ভেঙচি কেটে বলল : ভাগ যাও, যাও, ভাগ যাও! আর কিছু না। রাস্তায় অন্যদিকে, ঐদিন দ্যাট বয় ওয়াজ কিলড।

: তখনকার এই ডিমনস্ট্রেশনগুলো আকারে কতো বড় ছিল?

: আজকালকার তুলনায় তেমন কিছু না। ভেরি স্মল, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ছাত্র ছিল দুশো-সোয়া দুশো। সেসনের শুরুতে নতুন ভর্তি চলছে। তখন মুসলিম হল, মানে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছিল এখানকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপরতলায়। আমার বন্ধুবান্ধব কিছু আছে মুসলিম হাই স্কুলে। কিছু আছে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। কলেজ ছেড়ে ইউনিভার্সিটি যাব: সো অই বিলংড টু অল দি থ্রি ওয়ার্ল্ডস। আমরা তখন বেশির ভাগ ধূর্তি-শার্ট পরতাম।

সঙ্গী ফজলে রাব্বি একটি প্রশ্ন করলেন : আপনি বলছেন, হিন্দু-মুসলমানদের কোন যোগসূত্র ছিল না, তাদের সম্পর্ক ছিল গঙ্গা-যমুনার, তাহলে কাপড়-চোপড়ে মুসলমানরা হিন্দুদের ধুতি কেন পরতো?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : প্রশ্নটা উত্তম। বিষয়টা চিন্তা করার। আমি মনে করি হোয়াটওভার মাইট হ্যাভ বিন দি ওভার্ট প্রটেস্টেশন, তখনকার পিরিয়ডে দি মুসলিম ওয়েয়ার কমপ্লিটলি সোয়েফট্ ওভার। আমি এ্যাডিশনাল ম্যাথমেটিক্স নিয়েছিলাম। ফার্সি পড়ি নাই। তার কারণ, এ্যাট দি ব্যাক অব মাই মাইন্ড ভাবটা ছিল, আরবি ফার্সি পড়া, এগুলো তো মোল্লাগিরি। অথচ আমরা মুসলিম হাই-এর ছাত্র। আর মুসলিম হাই-এর কম্পলসারি পোশাক ছিল পায়জামা-টুপি।

: মুসলিম হাই-এর সব শিক্ষক কি মুসলমান ছিলেন?

: একজন হিন্দু শিক্ষকের কথা মনে পড়ে। বাসু দেব সাহা। অঙ্ক পড়াতেন। কিংবা ইংরেজি। তাও অল্প কিছুদিন পর চলে যান। আর সব শিক্ষকই মুসলমান।

ত্রিশের ঢাকা

আমরা আর একটা প্রশ্ন করলাম। ঢাকা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার জন্যও সেকালে, মানে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বিখ্যাত ছিল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম। ঢাকায় রায়ট কবে শুরু হয়?

: অনেকে আগে থেকে শুরু হয়েছে। '২৬ সালে হয়েছে। তবে ১৯৩১ সালের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঢাকায় তখন এ্যাকিউট রায়ট। আমি গেছি ঢাকা স্টেশনে, ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে। আমার ভাইয়েরা আসবে হুগলি থেকে। তাদের আনতে গেছি। তখন ঢাকা মেইল আসত বিকেলে, দুটো-আড়াইটার দিকে। মানে কোলকাতার মেইল। কোলকাতা থেকে গোয়ালন্দ। গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ। তারপর নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে ঢাকা। সেদিন আমি স্টেশনে গেলাম। অলমোস্ট ডেজারটেড স্টেশন। ট্রেন যখন এল তখন আমার ভাইদের সঙ্গে একটি মেয়ে নামল। হিন্দু। বয়স উনিশ-কুড়ি বছর। আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম : কে এই মেয়েটি। আমার ভাইয়েরা বলল : নারায়ণগঞ্জে এর লোক আসার কথা ছিল। কিন্তু কেউ আসে নি। তাই আমাদের সঙ্গে ঢাকায় এসেছে। মেয়েটি আমাকে বলল যে তাকে উয়ারী পৌঁছে দিতে হবে। এমন অনুরোধ আমি মুশকিলে পড়লাম। আমি জাস্ট আই.এ পড়ি। 'আমারে বইবার লাগছে। আমি না-ও করবার পারি না, হাঁ করলেও বিপদ। আমি আমতা আমতা করছি।' তখন দেখলাম গাড়োয়ানদের একজন সর্দার আমাদের দিকে আসলো। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান। তখন ঘোড়ার গাড়িই তো একমাত্র বাহন। আট দশটা গাড়ির সর্দার। নিজে গাড়ি চালায় না, কিন্তু গাড়ির সর্দারি করে। সে ঐ মেয়েটিকে এসে জিজ্ঞেস করল : আপনি কই যাইবেন?

মেয়েটি বলল : উয়ারী।

গাড়োয়ানের এই সর্দার এবার আমাকে জিগাইল : আপনার কিছু অয় নাকি?

আমি বললাম : না।

: উনি হিন্দু না?

: হ্যাঁ, উনি হিন্দু।

: তা, আপনি নিয়া যাইবেন নাকি উয়ারী?

আমার কথা শুনে বয়সে বুড়োমত সেই সর্দার মেয়েটিকে বলল : না, উনি যাইব না। আমি পৌছাইয়া দিমু।

কিন্তু মেয়েটি তার সাথে যেতে রাজি নয়। মেয়েটির আপত্তি দেখে গাড়োয়ানদের সর্দার বলল : দেখেন, আমার গাড়ি আছে। গাড়ি আমি চালাই না। কিন্তু চালাইবার পারি। আমি আপনারে গাড়িতে নিয়া যামু। উয়ারীতে কোনো মুসলমান পোলারে যাইবার দিমু না।

তার কথাতেই বুঝা গেল, কথাবার্তা বেশ গুছিয়ে বলতে পারে। আমাকে জিজ্ঞেস করল : কলেজে পড়েন না?

আমি বললাম : হ্যাঁ।

আমার জবাব শুনে আবার বলল : আপনারে যাইবার দিমু না। মেয়েটিকে বলল : আমার লগে চলেন। আমি আপনারে মা কইবার লাগছি। আমি পৌছাইয়া দিমু। কিন্তু কোনো মুসলমান পোলারে যাইতে দিমু না। আমাকে আবার বললো। আপনি উয়ারী যাইবেন যে, ফিরবেন ক্যামনে? উয়ারী গেলে হিন্দুরা আপনারে আইবার দিব? মেয়েটার যে সাহায্য করবার চাইছেন, তা হেরা মনে রাখবো। আবার মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বললো। এ পোলা আপনাগো পাড়ায় যা কউক, হের দাম থাকবো না।

পনের মিনিট ধরে এই রকম কথাবার্তা চলছে। মেয়েটি রাজি না গাড়োয়ান বলছে : দেহেন আর কোনো গাড়িই আপনারে নিয়া যাইবার সাহস করবো না। আমি নিয়া যামু। জি. আর.পি. আছে (অর্থাৎ রেলের পুলিশ স্টেশন)। তাদের কাছে আমার নাম নিয়া যাইতাছি। আমি আপনারে পৌছাইয়া দিমু। আমারে যদি রাখবার পারে তবে যেন রাইখ্যা দেয়।

কাহিনীটি শুনতে আমাদের ভাল লাগছিলো। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বিভক্ত ও জর্জরিত ঢাকা শহর, ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের ঢাকা শহর। সেদিনকার মানুষ বাদে এ কাহিনীর পটভূমি অন্যদের পক্ষে বোঝা সহজ হবে না। হিন্দুপাড়ায় কোনো মুসলমান গেলে তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। মুসলমানপাড়ায় হিন্দুও তাই। আবার তার মধ্যে সাধারণ মানুষের মানবিকবোধের দৃষ্টান্ত ছিল। রাজ্জাক সাহেবের এ কাহিনীতে সেরূপ বোধেরই দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। তাছাড়া ঢাকার স্থানীয় 'অশিক্ষিত' গাড়োয়ানদের শিক্ষার ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য যে অকৃত্রিম সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল তার পরিচয়ও ঘটনাটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

অধ্যাপক রাজ্জাক সেই পুরনো দিনের কথা মনে করে বললেন : তখনকার গাড়োয়ানদের সাহস ছিল। আমি একজন মুসলমান পোলা। লেখাপড়া করি। তাই আমার জন্য তার দরদ। আমারে হিন্দুপাড়ায় বিপদের মধ্যে যাইতে দিব না।

নিজে যাবে। ... কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে দেখা গেল, প্লাটফরমের অন্যদিকে থেকে কয়েকটি হিন্দু ছেলে আসছে। তাদের দেখে এই সর্দার ডাক দিয়ে বলল : এই যে বাবুরা, এই দিকে আহেন। আপনাদের মেয়েছেলে আপনারা নিয়া যান।

আমি একটি প্রশ্ন করলাম : রায়টে ছাত্রদের ভূমিকা কী ছিল? হিন্দু ছাত্র, মুসলমান ছাত্র এরা নিজেরা রায়ট করত অর্থাৎ মানুষ মারতো?

: মুসলমান মধ্যবিত্ত ছেলেরা রায়টে তেমন পার্ট নিত না। কিন্তু স্কুল-কলেজের হিন্দু ছাত্ররা পুরো পার্ট নিত।

: তখন রায়ট কেন হত? রাজনৈতিক কারণে?

: ইট ওয়াজ হার্ডলি পলিটিক্যাল। জন্মাষ্টমী, মহরমের মিছিল—মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো এগুলোই ছিল উপলক্ষ। পহেলা রায়ট '২৬ সালের দিকে হবে। তখন আমি এইট-নাইনে পড়ি। তারপরের এইটা ১৯৩১ সালে। আমি আই. এ. পড়ি। ঢাকা শহরের মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০%, মুসলমান ছাত্রসংখ্যা সামান্য। মুসলমান ছাত্রের প্রায় সবই ঢাকা শহরের বাইরের। দে ওয়েয়ার কমপ্লিটলি আনাইন্টারেস্টেড। মারামারি হত লোক্যাল হিন্দু মধ্যবিত্ত ও মুসলমানদের মধ্যে। কিন্তু এ রায়টের প্রভাব তখনো ইউনিভার্সিটির মধ্যে ছিল না। ইউনিভার্সিটির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের দাঙ্গা হত না। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে এর প্রভাব দেখি নি। হিন্দু শিক্ষকদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তারা যে সাম্প্রদায়িক ভাব থেকে মুসলমান ছাত্রদের লেখাপাড়ার ক্ষেত্রে 'ভিকটিমাইজ' করবে, তা ছিল না। এমন কোনো রেকর্ড নাই। মুসলমান ছেলে বলে যে ফার্স্ট ক্লাসের যোগ্য হলেও সেকেন্ড ক্লাস করে দেবে, টু মাই নলেজ, এমন দৃষ্টান্ত আমি দেখি না। এটা তারা করত না। একদম না। এমনকি যারা খুব নামকরা কম্যুনাল শিক্ষক ছিল তারাও ছাত্রদের ব্যাপারে এটা করত না। মুসলমান ছাত্রদের যে অসুবিধা ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, হিন্দু ভাল ছাত্রদের সঙ্গে তাদের শিক্ষকদের যে একটা সামাজিক সম্পর্ক ছিল, মুসলমান ছেলেদের সেটা ছিল না। শিক্ষক বেশির ভাগ হিন্দুছিল। হিন্দু ছেলেদের বেশির ভাগেরই এদের সঙ্গে সামাজিক এবং আত্মীয়গত একটা পরিচয় ছিল : কেউ আত্মীয়, কেউবা আত্মীয়ের বন্ধু। এই সূত্রে শিক্ষকদের বাড়িতে এই ছাত্রদের একটা স্বাভাবিক যাতায়াতও ছিল। এ ক্ষেত্রে মুসলিম স্টুডেন্টস ওয়েয়ার কমপ্লিটলি আউট। আর্থিক শ্রেণীগত পার্থক্যটাও কম নয়। যে শ্রেণী থেকে হিন্দু শিক্ষক হত, সে ক্লাসের ছাত্র তো মুসলমান নয়। তবে মুসলমান ছেলে ভালো করলে হিন্দু শিক্ষক অবশ্যই খুশি হতেন। তার কৃতিত্ব তাঁরা স্বীকার করতেন। হরিদাস বাবু, মানে হরিদাস ভট্টাচার্য, দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তার কম্যুনাল বলে পরিচয় ছিল। টিকিধারী ব্রাহ্মণ। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে, ছাত্রদের বিদ্যার বিচারে কখনো তিনি কম্যুনাল হন নি।

আমরা তবু একটা প্রচলিত অভিযোগের কথা উল্লেখ করলাম যে, মুসলমান ছাত্রদের অনেকের ক্ষোভ থাকতো যে হিন্দু শিক্ষক বলেই তাদের কাছে সে বিচার

পায় নি; না হলে সে ফার্স্ট ক্লাস পেত—এরকম অভিযোগ তো পুরনো দিনে আমরা শুনতাম। একথা বলাতে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হ্যাঁ, মুসলিম কোনো ছেলে যে এরূপ বলতো না, তা নয়। কিন্তু তাদের সে বলা জাস্টিফাইড ছিল না। মযহার সাহেবের কথা আমি জানি। মযহার সাহেব (মযহারুল হক) এক নম্বরের জন্য ফার্স্ট ক্লাস পায় নি।

আমরা একথা শুনে একটু আশ্চর্য হলাম। আমরা বললাম : কিন্তু স্যার এরূপ একেবারে মারজিন্যাল বা সীমানার ক্ষেত্রে গ্রেস দেবার তো এখতিয়ার থাকে পরীক্ষা পরিষদের।

রাজ্জাক সাহেব বললেন : 'হ্যাঁ, দশ পর্যন্ত গ্রেস দিতে পারত। কিন্তু আমি বলছি, সে যুগে সেকেন্ড ক্লাস-ফার্স্ট ক্লাসের ব্যাপারটা কেবল এক নম্বরের বেশি কম বলে মনে করা হত না। যে ফার্স্ট ক্লাস সে ফার্স্ট ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাস থেকে এক নম্বরে যদি তাকে কম দেওয়া হয়ে থাকে তবে তা চিন্তা করেই দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষকের জাজমেন্ট রং হতে পারে। কিন্তু তাদের চিন্তার ভিত্তিটা এই ছিল। সে সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্র, সে ভাল সেকেন্ড ক্লাস বলে তাকে আমি ২৯৯ পর্যন্ত দিতে পারি, কিন্তু তাকে ৩০০ আমি দেব না। তখনও চিন্তায় লাভ নেই যে সে ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, কেবল এক নম্বরের জন্য ফার্স্ট ক্লাস পাইল না। 'এটা এমন হইবার পারে যে, লিখিত উত্তরে সে ২৯৪ পাইছে। তাঁকে ৫ নম্বর যোগ কইরা আমি ২৯৯ করতে পারি। কিন্তু সে যদি ফার্স্ট ছাত্র না হয়, তাহলে আমি তাকে ৬ নম্বর যোগ কইরা ৩০০ করুম না।' অবশ্য কোনো অবস্থায়ই যে কাউকে ২৯৯ থেকে ৩০০ করা হয় নি, এমন নয়। তবে তেমন করার আগে দে হ্যাড টু বি স্যাটিসফাই : যারা সেটা করবে তাদের বুঝতে হবে যে ছাত্রটি যথার্থই ফার্স্ট ক্লাসের, সেকেন্ড ক্লাসের নয়। মোটকথা সেদিন একাডেমিক লাইফ-এ এই বিবেচনাটা প্রধান ছিল : সেকেন্ড ক্লাস আর ফার্স্টক্লাস আলাদা : এক নম্বর, দুই নম্বরের কথা না এটা। ইফ ইউ রিলং দেয়ার, ইউ উইল গেট, নট আদারওয়াইজ। পরীক্ষা নিয়ে কোনো রকমের কারচুপি, কোনরকমের শিথিলতা ছিল না ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। এমন কোনো একজন শিক্ষক ছিল না হু ড্রেমট অব ডুয়িং এনিথিং, যার তার করা উচিত না। পরীক্ষার ব্যাপারটা নিতান্ত সেকরেড ছিল।

পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করে, শিক্ষা ও পরীক্ষার সেই হারানো মানের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক রাজ্জাক আফসোস করে বললেন : 'এইগুলো মিস করি আজকাল। তা না হলে আজকালকার আপনারা লেখাপড়ায় খারাপ না। কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যেএই বোধটা দেখি না, দ্যাট ইজ এ সেকরেড টাস্ক। এই বোধ যেন চলে গেছে। লেখাপড়াটিকে হালকাভাবে তারা নিতেই পারত না। এটা সিরিয়াস ব্যাপার। আমার মনে আছে, এক বয়স্ক ভদ্রলোক, বার তেরবার বি.এ.

পরীক্ষা দিয়েছে। কেবল ফেল করে। আমাদের চেয়ে বয়সে বেশ বড়। আমি তখন মাস্টার হইছি। পরীক্ষার খাতা দেখতে শুরু করছি। একদিন দেখি সেই ভদ্রলোক আমার বাসায় আইছে। সে কেবল ছাত্র না। সে মোক্তারিও করে। নারায়ণগঞ্জে অনেক বছর যাবৎ মোক্তারি করছে। আমার বাসায় এসে বলল। শুনলাম, আপনি নাকি বি.এ'র খাতা দেখবেন। তা আপনার পেপারে ... তার প্রস্তাব বিস্তারিত না করতেই আমি বুঝলাম। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু বয়স্ক মানুষ। খারাপ কিছু বলতেও পারি না। আমি জিগাইলাম : রোল নম্বর কতো? সে জবাবে তার রোল নম্বর কইল। আমি কইলাম : 'আপনি খোঁজখবর তো বেশ রাখেন, কে কোন খাতা পাইছে। ভালো কথা। আপনি অন্যান্য কিসে কী পাইছেন, হেইডা কইয়া যাইএন। আমি ঘাটতিটা পূরণ কইরা দিমু।' আমার সেই কথাতেই সে খুশি। আমার জবাব শুইনা সোজা চইলা গেছে সে ডিপার্টমেন্টের হেড দেবেন বাবুর বাসায়। তারে যাইয়া কইল : 'স্যার, এই যে রাজ্জাক ছেলেটিকে এক্সামিনার বানাইছেন সে খুব ভালো ছেলে। আমারে সে কইছে দুই পেপারে আমি কতো পাইছি কইয়া দিলে সে বাকি নম্বর দিয়া দিব। এখন স্যার আপনি কন আমি দুই পেপারে কত পাইছি।' বোঝেন ব্যাপার!

তার পরদিন এসেই দেবেন বাবু বলে পাঠালেন : রাজ্জাক, উইল ইউ সি মি ফর এ মোমেন্ট?

যেতেই দেবেন বাবু বললেন : রাজ্জাক, তুমি এই ছেলেকে কী বলেছ?

এবার আমি আমার বিদপটা বুঝলাম। মোক্তার সাহেব যে এমন মোক্তার তা আমি কেমন করে জানব। এখন আমি কী জবাব দিই? দেবেন বাবু তো আমার শিক্ষকও। শেষে আমি রাগের ভাব করে বললাম : এটা কী ব্যাপার স্যার? এই লোক ১২/১৩ বছর যাবৎ পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। এবার এটাকে পাস, তো পরের বার এটাতে ফেল আর একটাতে পাস। ঘুরেফিরে সে তো আপনাদের সব পেপারেই পাস করেছে। তবু এই বার তের বছর সে পাসের সার্টিফিকেট যোগাড় করতে পারল না, আপনাদের কাছ থেকে। এ আপনাদের কেমন শিক্ষাব্যবস্থা। আমি এই রাগের ভাব বজায় রেখেই বললাম : আমি স্যার 'হাচাই করে কইছি' আমি তারে কইছি, আমি তার নম্বর বাড়াইয়া দিমু। আপনি স্যার একবার হিসাব করে দেখুন এই যে সে বছরের পর বছর পরীক্ষা দিয়ে চলেছে তাতে এমন কোন বিষয় আছে যাতে সে অনন্ত দুবার পাস না করেছে।

আমার কথার ভঙ্গিতে দেবেন বাবু একটু দমে গেলেন। তবু বললেন : কিন্তু তাইবলে এই কথা বলতে হয় নাকি? তুমি এখন এক্সামিনার হয়েছ, তুমি একথা বললে কী করে?

আমি তবু বলতেই থাকলাম : স্যার আমি তো আর বেশি কিছু বলি নাই। এটা একটা কথাই বলেছি। আর এটা আমি বলব।

কিন্তু দেবেন বাবু তবু খুশি না। বহুক্ষণ তিনি গজগজ করলেন। বললেন : তাই কি হয় নাকি? পরীক্ষার আইন আছে। পরীক্ষার আইন আমাদের মানতে হবে না?

এই ঘটনা বর্ণনা করে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : কাজেই পরীক্ষার আইন ছিল এঁদের কাছে অলঙ্ঘনীয়। পরীক্ষার ব্যাপারটা ছিল সেকরেড। এই বোধ তাঁদের রক্তমাংস ছিল। কিন্তু সেই সিরিয়াসনেস তো আজকাল একেবারে উঠে গেছে। আজকাল কী হয়?

একথা বলে অধ্যাপক রাজ্জাক আর এক ঘটনার কথা বললেন : এই কিছুদিন আগে আমাকে এক তরুণ শিক্ষক এসে বলল : স্যার অমুক ছাত্র তার পরীক্ষার খাতায় নকল করেছে।

আমি বললাম : তুমি কি করে জানলে বাবা? সে টিচার বললো, আমি জানি স্যার। আমি সেদিন ইনভিজিলেটর ছিলাম।

আমি বললাম : তুমি ইনভিজিলেটর ছিলে, দেন হোয়াট ডিড নট ইউ রিপোর্ট?

সে বলল : স্যার, ও ছেলে এন.এস. এফ. করে।

অর্থাৎ এন.এস.এফ ছাত্রদের ভয়ে সে রিপোর্ট করে নি। আমি বললাম : তুমি তখন রিপোর্ট কর নাই, তা আমি এখন কী করব? তার খাতায় যা লেখা আছে তা বাদ দিয়ে আমি খাতায় নম্বর কমিয়ে দেব? ... ইট ডিড নট এন্টার হিজ হেড, দ্যাট, ইট ওয়াজ নট উইথইন মাই রাইট টু ডু ইট! তাকে বুঝাতে আমার অনেকক্ষণ সময় লাগল যে এগুলো করা যায় না। পরীক্ষা নিয়ে ট্যাম্পারি? ওরে বাবা! সেদিক একথা চিন্তা করা যেত না। তাছাড়া পরীক্ষা কমিটিও শতকরা দুই-এর বেশি নম্বর গ্রেস দিতে পারত না। তাও অনেকখানি কাণ্ডজ্ঞান আর হিউমিলিটির ভিত্তিতে তারা সেটা করা কিংবা না করার কথা চিন্তা করত। হালকাভাবে নয়।

আমরা প্রশ্ন করলাম : কোনো ইররেগুলারিটি হত না?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : না, আমার জানা নেই যে বাড়াবার রাইট কেউ আনজাস্টলি এক্সারসাইজ করছেন।

: আপনার অনার্সের সময়ে কে কে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক হেসে বললে। কেউ না। আমি তো ইকনমিক্স-এর ছাত্র। তখন ইকনমিক্স ও পলিটিকস একটা বিভাগ ছিল। ইকনমিক্স-এ সবসময় ফার্স্ট ক্লাস উঠত না।

আমি বললাম : আপনার ভাইভা ভোসি পরীক্ষায় উপস্থিত না হওয়ার একটা গল্প শুনেছিলাম। সেটা একটু বলুন।

: আমি সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিয়েছিলাম।

: অনার্সে?

: না, এম.এ'তে। যখন রেজাল্ট প্রকাশ করা হত বর্ণক্রমে। ভাইভাতেও ডাকা হত নামের বর্ণক্রমে। আমার নাম আবদুর রাজ্জাক। কাজেই আমিই আগে। কিন্তু পয়লাবার হাজির হলাম না। দ্বিতীয়বারও দেরি করেছিলাম। তখন ডি.এন. ব্যানার্জি, এইচ.এল.সে দুজনই আমাকে চিঠি দিয়ে পাঠালেন : তুমি ভাইভাতে এপিয়ার হচ্ছ না কেন? এটা হয়ত তাঁদের একটা ইন্ডিকেশন যে লিখিত উত্তরে আমাকে ফার্স্ট ক্লাস দেওয়া হয়েছে। সেদিনই আবার এইচ.এল. সে প্রফেসর হিসেবে ডিপার্টমেন্টের চার্জ নিচ্ছেন। ডি.এন. ব্যানার্জি প্রফেসর হিসাবে ডিপার্টমেন্টের চার্জে ছিলেন। ডি.এন. ব্যানার্জি ওয়াজ গোইং ওন লং, লিভ, নট হ্যাভিং বিন এ্যাপোয়েন্টেড প্রফেসর।

: এটা কি ১৯৩৬-এর কথা বলছেন?

: হ্যাঁ,তবে আমার এম.এ. ডিড ছিল ১৯৩৫-এ। প্রথমে বছরও দিয়েছিলাম, কিন্তু ভাইভাতে আর হাজির হই নাই। তাই এম.এ. ডিগ্রি নিই আমি দ্বিতীয় বছর, মানে ১৯৩৬-এ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : এট তো খুবই বড় কথা যে একজন ছাত্র কেন ভাইভাতে আসছে না তার সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন হয়ে খবর নিচ্ছেন প্রধান প্রফেসররা।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন। এদিক দিয়ে আমি এক্সট্রিমলি লাকি। আমি ভাগ্যবান। সকল অধ্যাপক আমাকে স্নেহ করতেন। আর এই স্নেহ না পেলে আমি মাস্টারির চাকরি করতেই পারতাম না। অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে আমি চাকরি করতে পারতাম না। আমার দ্বারা কুলাত না। আমাদের ইউনিভার্সিটিতেও আমি প্রথমে ছ'মাস কোনো ক্লাস নিতে পারতাম না। পাঁচ-মিনিট-দশ মিনিটের বেশি ক্লাসে থাকতাম না। পড়া একেবারে মুখস্থ কইরা যাইতাম। তবু ক্লাসে যাইয়া মনে থাকত না। চেষ্টা করতাম। কিন্তু মোটের ওপর একেবারেই বক্তৃতা দিতে পারতাম না।

প্রবীণ এবং আমাদের সকলের সুপরিচিত অধ্যাপক রাজ্জাকের মুখে তাঁর তরুণ বয়সের এই অকপট উক্তি শুনতে আমাদের মজা লাগছিল। তাঁর এই মেজাজের সঙ্গে যারা পরিচিত তারা অধ্যাপক রাজ্জাকের অকপটতাতে বেশ আনন্দবোধ করবেন। শুধু তার অধ্যাপনা করার গোড়ার কথা নয়। আমি যখন তাঁর ছাত্র, ১৯৪২-৪৩ সালে, তখনো তাঁর এই আদৌ বক্তৃতা না দেওয়ার বৈশিষ্ট্যটি সুপরিচিত। অথচ ছাত্রদের সকলকে ক্লাসের বাইরে, করিডোরে, শিক্ষকদের কক্ষে, নিজের বাড়িতে আলাপে-আপ্যায়নে তিনি একইভাবে সুপরিচিত। এটি তাঁর আর এক বৈশিষ্ট্য। আমার নিজেরও একটি দিনের কথা পরিষ্কার মনে আছে। আমি এবং আর কয়েকটি ছাত্র তাঁর সঙ্গে টিউটরিয়াল-এর স্টুডেন্ট। অধ্যাপক রাজ্জাক ক্লাসে এসে কিছুক্ষণ বসলেন। আমাদের বাড়িতে করা খাতাগুলো সংগ্রহ করলেন। তারপর আর একটু বললেন এবং স্মিতমুখে তাঁর ঢাকাইয়া টোনে বললেন : আর কতো! এবার আপনারা বাড়ি যাইবার পারেন।

আজ যেদিন এই আলাপ তুলেছিলাম সেদিন সেই ফেলে আসা তাঁর নিজের ছাত্রজীবনের শিক্ষকদের নিকট থেকে পাওয়া স্নেহের কথা স্মরণ করতে তৃপ্তিবোধ করছিলেন। আমরা তাঁকে বাধা দিলাম না।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : কিন্তু আমার ছাত্ররা কখনো আমাকে 'টিজ' করে নাই। আমার সম্পর্কে তাঁদের সকলের একটা সিমপ্যাথি ছিল। কেন তা আমি জানি না। তবে সবাই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহারও করেছে। একটা দিনও কোনো গোলমাল করে নাই, কোনো খারাপ ব্যবহার করে নাই কোনো নালিশ করে নাই।

আমরা একটু টিজ করার জন্যই বললাম : কিন্তু কেমন করে আপনি পার পেয়ে আসতেন?

: ঐ পাঁচ-দশ মিনিট ক্লাস কইরা, আই শ্যাল নট টেক মাই ক্লাস বইলা চইলা আসতাম। তারপরে কিছুদিন মোটে ক্লাসই নিতাম না। একদিন এইচ, এল. দে ডাকিয়ে আমাকে বললেন : রাজ্জাক আমি শুনেছি, তুমি নাকি মাঝে-মাঝে ক্লাস নাও না? ড. দেব এমন প্রশ্নের জবাবে আমি খুব ব্রাইটলি বললাম : স্যার, ক্লাস না নিলে তো নোটিশ দিয়ে দিই। আমার একথা শুনে এইচ. এল. দে প্রথমে একটু হকচকিয়ে যেয়ে তারপরে বললেন : 'ও! তুমি নোটিশ দিয়ে দাও! তা বেশ, তা বেশ। এরপরে আমাকে জানিয়ে দিও, আমি নোটিশ দিয়ে দেব! হি ডিড নট টেল মি দ্যাট আই ওয়াজ নট এন্টাইটল্ড টু দি প্রিভিলেজ অব নট টেকিং ক্লাস ... মাস্টার ছাত্র উভয়ই আমাকে স্নেহ করতেন।

আমি সকৌতুকে বললাম : স্যার, আপনার সম্পর্কে একটা গল্প আছে। আপনি নাকি আপনার ডিপার্টমেন্টের হেডকে লিখেছিলেন : 'আমি ক্লাস নিতে পারবো না। আমার মায়না কিছু কমিয়ে দিবেন।'

অধ্যাপক রাজ্জাক স্মিত মুখে বললেন : না সেরকম কিছু করি নাই। ... তারপরে দেবেন বাবু ছুটিতে চলে গেলেন। একদিনের কথা মনে আছে। লাইব্রেরিতে বসে পড়ছি। হঠাৎ অজিত সেন, একটু দূরে ছিলেন, আমার পাশে এসে বসলেন। অজিতবাবু তো কথাবার্তা তেমন বলতেন না। গম্ভীর হয়ে থাকতেন। আমার পাশে বসে এক মিনিট চুপ করে থেকে বললেন : 'রাজ্জাক, তোমার নাকি ক্লাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে?'

আমি বললাম : হ্যাঁ, স্যার, আমি ক্লাস নিবার পারি না।

একথা শুনে তিনি খুব কনসানর্ড হয়ে বললেন, কেন, ক্লাসে কয়েকটি মেয়ে আছে, সেজন্যে?

তখন মাত্র নতুন মেয়েরা পড়তে আসছে। হিন্দু মেয়েরা।

আমি বললাম : না স্যার, মেয়ে ছাড়া যে ক্লাসগুলো, সেগুলোও আমি নিতে পারি না।

শুনে হেসে বললেন। ও কিছু না। ও তোমার ঠিক হয়ে যাবে।

এই গল্প বলে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এই ছিল আমার ব্যবস্থা। অন্য কোথাও হলে আমি বোধহয় চাকরি করতেই পারতাম না। অথচ মজা হল, আমার সঙ্গে নিখিলও চাকরি পায়ঃ নিখিল রঞ্জন রায়। ওর ক্লাসে ছেলেরা বড় গোলমাল করত।...

রাজ্জাক স্যারের একথা ঠিক। নিখিল বাবুকে আমিও পেয়েছি, ১৯৪৩-৪৪ সালে। আমি তখন বি.এ.ক্লাসের ছাত্র। দর্শনে অনার্স। সাথে আছে ইংরেজি সাহিত্য আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান। নিখিল বাবু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যুবক অধ্যাপক। নাদুস-নুদুস চেহারা। তখনো ক্লাসে হিন্দু ছেলেই বেশি। তারা তাঁকে খুব বিরক্ত করত। খুব গোবেচারী ছিলেন তিনি। মনে আছে। তিনি খুব সিরিয়াসলি পড়াচ্ছেন। ইংরেজিতে বক্তৃতা করছেন। তখন অজিত সেন বাদে সবাই ইংরেজিতে বক্তৃতা করতেন। কিছুক্ষণ হয়ত বক্তৃতা চলছে। দুষ্টু ছেলের দল সমস্বরে বলে উঠল : স্যার, বুঝি না। বাংলাতে কন স্যার, বাংলাতে কন। নিখিল বাবু ভাবলেন : ছেলেরা সত্যি বোধহয় বুঝতে চাচ্ছে, ইংরেজিতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই তিনি আবার বাংলা বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু একটু বাংলা না বলতেই দুষ্টু ছেলের দলবলে উঠল : সংস্কৃত চালান স্যার, সংস্কৃত। নিখিল বাবু বুঝলেন। তবু খেপলেন না। লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন। সেদিনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবনের এগুলো ছিল চাটনি। এরকমভাবে সরল গোবেচারী অধ্যাপককে দুষ্টু ছেলেরা নাজেহাল করে আনন্দ পেত। কিন্তু অধ্যাপক রাজ্জাকের আচার-আচরণ এত সহজ, অমায়িক এবং বেপরোয়া ছিল যে তাঁর একথা ঠিক যে তাকে কেউ বিরক্ত করার কথা ভাবতো না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের কয়েকজন অধ্যাপক ১৮.০৭.৭৬

আজকের আলাপে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের প্রশ্ন উঠেছিল। আমি বলেছিলামঃ স্যার, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আজকাল জবাব লেখে, নওয়াব সলিমুল্লাহর দাবিতে ১৯০৫-এ বেঙ্গল ওয়াজ পার্টিশনড, একথার কি কোনো যথার্থতা আছে?

রাজ্জাক সাহেব বললেন : বেঙ্গল পার্টিশন-এর সময়ে সলিমুল্লাহ ওয়াজ এ ফিগার। তিনি একজন মুসলিম নেতা ছিলেন। পার্টিশন রদ করার পেছনে সারা ভারতব্যাপী নানা ঘটনা ঘটেছিল। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরির ব্যাপারে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার একটা রিজোল্যুশান ছিল। ভাস্ট মেজরিটি অব দি মিডল ক্লাস হিন্দুস অপোসড দি রিজোল্যুশন। সে অপোসড ইট টুথ এ্যান্ড নেইল, স্যার আশুতোষ ইনফ্লুডেড়। স্যার আশুতোষের আপত্তির কারণ, দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে তাঁর জমিদারি খাটো হয়ে যাবে। আর এই মনোভাব থেকেই জ্ঞান ঘোষ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসার পরে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করেছিলেন।

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : জ্ঞান ঘোষ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন—সেখানে তিনি রিসার্চ করতেন। তারবোধ হয় শর্ত ছিল রিসার্চ ছেড়ে চাকরি নিলে টাকা ফেরত দিতেহবে। এটা স্যার আশুতোষ মাফও করতে পারতেন। তা তিনি করেন নি। জ্ঞান ঘোষকে ঢাকা আসার মাসুল দিতে হল। স্যার আশুতোষমেড হিম পে দি ফুল সাম। দশ হাজার টাকাই তাকে দিতে হয়েছিল। ... সেন্ট্রাল লেজিসলেচার-এর এ্যাক্ট অনুযায়ী ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন্ট্রাল লেজিসলেচার-এর ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটটা ইন্টারেস্টিং। ঐ ডিবেটটা দেখলেই হয়। ঐ ডিবেটটা আছে আমার কাছে। জ্ঞান ঘোষ ২৯ বছর বয়সে পুরো প্রফেসর হন। হি ওয়াজ প্রবাবলি দি ইংগেস্ট প্রফেসর। তিনি কেমিস্ট্রির প্রফেসর ছিলেন। জ্ঞান ঘোষ, সত্যেন বোস দি ইংগেস্ট প্রফেসর। তিনি কেমিস্ট্রির প্রফেসর ছিলেন। জ্ঞান ঘোষ, সত্যেন বোস—এঁরা এক ব্যাচের ... ।

অধ্যাপক রাজ্জাকের কাছ থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি গোড়াকার কথা শুনছিলাম।

: সত্যেন বোস ওয়াজ এ্যাপয়েন্ডেড এ্যাজ এ রিডার। কিন্তু জ্ঞান ঘোষ যখন আসেন তখন হি ওয়াজ স্ট্রেইটওয়ে প্রফেসর। আর প্রফেসর ছিলেন জেনকিনস সাহেব ফিজিক্স-এ; তিনি ছিলেন আই.এ.এস অর্থাৎ ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস-এর লোক। তিনি ছিলেন ঢাকা কলেজে। সেখান থেকে হি অপটেড ফর ঢাকা ইউনিভার্সিটি। জেনকিনস সাহেব এসেছিলেন চুক্তির ভিত্তি। তাঁর সরকারি চাকরি বহাল ছিল। তিন বছরের কন্ট্রাক্টে এসেছিলেন। অনেক দর কষাকষি করেছিলেন মায়না নিয়ে। সিনিয়রদের মধ্যে সবচেয়ে দর কষাকষি তিনিই করেছিলেন। জেনকিনস যখন পরে চলে যান তখন ফিজিক্স-এর প্রফেসরশিপ ওয়াজ এ্যাডভার্টাইজড। জেনকিনস-এর চলে যাওয়াটা বোধহয় স্বাভাবিক ছিল না। ছাত্রদের কোনো অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি তখন বলেছিলেন, হি ওয়ান্টেড টু গো ব্যাক টু গভর্নমেন্ট সার্ভিস। ইতোমধ্যে সত্যেন বোস জার্মানি গিয়েছিলেন; বোসের আসল কাজ ছিল স্ট্যাটিসটিক্স-এর ওপর। জার্মানিতে আইনস্টাইনের সঙ্গেও কিছু কাজ করেছিলেন। ফিরে আসার পর ডিপার্টমেন্টে প্রফেসরশিপ যখন এ্যাডভার্টাইজ করা হয় এবং তিনি দরখাস্ত করেন তখন সিলেকশন কমিটিতে হি ওয়াজ নট নমিনেটেড ফর প্রফেসরশিপ। ডি. এস. বোসকে নমিনেশন দেওয়া হয়। কিন্তু ডি. এম. বোস বোধহয় জয়েন করেন নি। তখন বোসকে প্রফেসর করা হয়। মোস্ট প্রবাবলি বোস ডিজার্ভড প্রফেসরশিপ মোর দ্যান এনিওয়ান এল্‌স। কিন্তু তাঁর ফাইলে দেখা যায় যে তিনি প্রথমে নমিনেশন পান নাই।

আমি বললাম : স্যার আপনার নিজের ছেলেবেলার কথা কিছু বলুন ...

অধ্যাপক রাজ্জাক জবাব দিলেন : আমার আবার ছেলেবেলার কথা কি? কিছু মনেটনে নাই।

আমি জোর করলাম : তবু কিছু বলুন। আপনার স্কুলের কথা বলুন।

এরপরে রাজ্জাক সাহেব কিছু কথা বললেন। তেমন ধারাবাহিকভাবে কিছু নয়। তবু তাঁর সে কথায় এই শতকের গোড়াকার অবস্থা কিছু পাওয়া যায়, একটি মুসলিম কিশোরের পরিবেশের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

রাজ্জাক সাহেব বললেন? আমি খুব সম্ভব জন্মবার পরে কিছুদিন রংপুরে ছিলাম। সে ১৮/১৯ সালে। খুব কম বয়সে।

: আপনার বাবা কী করতেন?

: তিনি তখন পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর রংপুরে। ওখান থেকে উনি হুগলি ট্রান্সফারড হয়ে যান ১৯১৯-২০ সালের দিকে। আমরাও ওখান থেকে চলে আসি। রংপুরের কথা খুব ভেগ, আবছা হয়ে আছে। দুএকটা কথা মনে পড়ে।

: তখন আপনি কী পড়তেন?

: কিছুই না। একটা খালি মনে আছে। আমাদের অক্ষর পরিচয়টা কলাপাতাতে না, তালপাতাতেও না, তেঁতুল বিচিতে। তেঁতুল বিচি দিয়ে আমরা অ, আ, ক, খ লিখতাম, ১,২,৩ লিখতাম।

: মজার ব্যাপার তো! কেমন করে লিখতেন?

: তেঁতুল বিচি সাজিয়ে, সাজিয়ে। একটা খালি মনে আছে।

: আপনার জন্ম কোন সালে?

: জন্মের কথা প্রিসাইজলি বলতে পারব না। খুব সম্ভব ১৯১৪তে। চার পাঁচ ছর বয়সে আমি হুগলি যাই। তারপর হুগলি কয়েক বছর থাকি। হুগলির একটা স্কুলের কথা খালি মনে আছে। এইখানে, মানে হুগলির আসার আগে পাণ্ডুয়ার একটা মাদ্রাসায় পড়েছিলাম, ক্লাস টু-তে, ক্লাস ওয়ান কিংবা টুতে। পাভুয়া হুগলি জেরাতেই। পাভুয়া আমাদের হাবিবুল্লাহ সাহেবের বাড়ি কিংবা শ্বশুরবাড়ি। পাভুয়াতে বহু পীরের কবর আছে। থানার ওপরও একটা ছিল। সেই ছোট বয়সের কথা। একটা ঘটনা কেন জানি মনে আটকে আছে। 'একদিন সকালে স্কুলে যাইতেছি। খুব সম্ভব পরীক্ষা, ঐ মাদ্রাসায়। যাওয়ার পথে আমাদের বাড়ির সামনে একটা মাজার। যাওয়ার সময়ে মাজারের ধুলাবালি কিছুটা মুখে মাইখা লইলাম। রাস্তায় একটি লোক আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কইল : খোকা মুখে অত ধুলাবালি কেন? স্কুলে যাচ্ছ ... তাঁর কথার অর্থ, আমি মুখটা কেন পরিষ্কার কইরা যাই না। তাঁর প্রশ্নে আমি খুব সগৌরবে কইলাম : এটা ধুলাবলি নয়, এটা মাজারের ধুলা ...।

লোকটি হেসে বলল : ও! মাজারের ধুলাবালি বুঝি ধুলাবালি নয়। এই ঘটনাটা মনে আছে।

হুগলির পরে আর একটা জায়গায় ছিলাম। চন্ডীতলা তার নাম। ফুরফুরার পীর সাহেবের বাড়ি থেকে পাঁচ ছ'মাইল দূরে। এস, ওয়াজেদ আলীর বাড়িও হুগলিতে। এসময়ে স্কুলে যে খুব পড়েছি, মনে হয় না। একটু-আধটু যাওয়া-আসা হয়ত করেছি। তারপরে আমার মার অসুখ হওয়ায় আমরা দেশে চলে এলাম, গ্রামে। নিজেদের গ্রামে। এটা কত সন, তা গুণে বার করতে হবে। ১৯২৮-এ আমি ক্লাস টেন-এ; তাহলে ২৭-এ নাইনে, ২৬-এ এইটে ২৫-এ সেভেনে, ২৪-এ সিক্সে, ১৯২৩-এই খুব সম্ভব উই কেম টু দি ভিলেজ। এখানে এসে আমাদের গ্রামের মাইনর স্কুলে, কলাতিয়ায়, কেরানীগঞ্জে, ঢাকা শহর থেকে ৭-৮ মাইল দূরে ফাইভে ভর্তি হলাম। ফাইভে থাকার সময়ে মা মারা গেলেন। মা মারা গেলেন পরে আমরা দুভাই, বড় দুজন স্টেয়েড ব্যাক উইথ আওয়ার আঙ্কল। বাবা হুগলি চইলা গেলেন। ঐ দুই বছর গ্রামে পড়ি। তখন মাইনর স্কুলের শিক্ষকরা বললেন : এম. ই. স্কলারশিপ পরীক্ষা দাও। ঐ স্কুল থেকে সেবারই প্রথম এম. ই. স্কলারশিপ-এর পরীক্ষা দেওয়া হয়। আমি আর একটি ছেলে পরীক্ষা দিলাম। আমাদের দুজনের মধ্যে 'কপালগুণে' আমি স্কলারশিপ পাইলাম। স্কলারশিপ পাইয়া সেভেনে পড়ে ক্লাস এইটে ঢাকা মুসলিম হাইতে আসি। তখন মুসলিম হাই-এর হেড মাস্টার খালেক সাহেব। খালেক সাহেব আমার বাবার সঙ্গে পড়তেন। তিনিই খুব সিরিয়াসলি ইনসিস্ট করতে লাগলেন, বাবা যেন আমাদের ঢাকায় তাঁর স্কুলে পাঠিয়ে দেন। তাই ক্লাস এইটে মুসলিম হাইতে এসে ভর্তি হলাম। এই আমার ঢাকা আসা। আর ঢাকা ত্যাগ করতে পারলাম না। আর সেদিক থেকে বলতে পারেন আমি একজন 'ওয়ান অব দি ওলডেস্ট সিটিজেন অব ঢাকা'। এই খালেক সাহেব, খান বাহাদুর আবদুল খালেক হন। তিনি পরে বেঙ্গলের এ.ডি.পি.আই এবং মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি পর্যন্ত হয়েছিলেন।

এই খালেক সাহেবকে আমিও দেখেছিলাম বোধহয়, আমার 'স্কুল' জীবনে ১৯৩৮-৩৯ সালে। সেকথা নিশ্চিত করার জন্য বললাম। ইনি খুব কালো ছিলেন গায়ের রঙে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : খুব কালো ছিলেন। খুব হাই পারসনালিটিও ছিল তাঁর। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আবার যখন M E Scholarship দিতে আসলাম তখন প্রথম আবদুর রহমানকে দেখি। তিনি তখন নরম্যাল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। এখন যেটা মুসলিম হাই, তখন সেটা নরম্যাল স্কুল ছিল। আর এখন যেটা কলেজিয়েট স্কুল, সেটা তখন মুসলিম হাই। আবার পাকিস্তান আমলে এক সময়ে যেটা স্টেট ব্যাঙ্কের বিল্ডিং ছিল সেটা তখন কলেজিয়েট স্কুল ছিল। এই তিনটা পাশাপাশি ছিল। স্কলারশিপ পরীক্ষা দিলাম। তারপর আবার ইংরেজিতে ইন্টারভিউ। খান বাহাদুর আবদুর রহমান সেই ইন্টারভিউ নেন। তাঁর

সেদিনের পোশাকটি আমার এখনো মনে আছে : ফ্লানেলের ট্রাউজার, আচকান আর মাথায় রুমি টুপি। তখন তাঁর দাড়ি ছিল না। তারপরে পরিচয় হয়েছে তাঁর সঙ্গে। হাকিম সাহেব, রাজ্জাক সাহেব—এরা তাঁর ছোট ভাই। রাজ্জাক সাহেব পরে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন। হাকিম সাহেব জজ হয়েছিলেন।

খান বাহাদুর আবদুর রহমান লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি ম্যাথেমেটিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস। বাংলাতেও তার দক্ষতা ছিল। মুসলিম হাইতে ভর্তি হলাম ক্লাস এইটে। থাকতাম ডাফরিন হোস্টেলে। এখন মিউনিসিপ্যালিটির পশ্চিম পাশে যেটা নজরুল কলেজ, এটা প্রথমে মাদ্রাসা ছিল। পরে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হয়। এরপাশে একটা বিল্ডিং ছিল। সেটা ডাফরিন হোস্টেল। মুসলিম হাই-এর ছেলেদের জন্য। মাদ্রাসার ছেলেরাও থাকত। তিনবেলা খাওয়া দিত। থাকা-খাওয়া বাবদ মাসে মোট আট টাকা লাগতো।

আমি একটি প্রশ্ন করলাম : মুসলিম হাই-এর ছাত্রদের কম্পোজিশন কী ছিল? সবই কি মুসলমান ছিল?

: হ্যাঁ, সবই মুসলমান ছিল। মাইনে কম নিত, অন্যান্য স্কুলের চেয়ে কম। মোহসিন ফান্ড থেকে মুসলমান ছাত্রদের সাহায্য করা হত। একটা নোশন তখন ছিল যে মুসলিমস ওয়েয়ার ব্যাকওয়ার্ড ইন ইংলিশ এডুকেশন। তাদের সাহায্য করতে হবে এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার একটা উদ্দেশ্যে এই : ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওয়াজ ইন্টেন্ডেড টু বি ওয়ান সাচ স্টেপ : টু ব্রিজ দি গ্যাপ, দি গ্যাপ দ্যাট এক্সিস্টেড বিটুইন মুসলিম এ্যান্ড নন-মুসলিম স্টুডেন্টস। এরই আরলিয়ার স্টেপ ছিল নিউ স্কিম মাদ্রাসা, ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা হ্যাড ফেইল্ড্।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির গোড়ার দিকে ইসলামিক স্টাডিস-এর ওপর খুব জোর ছিল। এর কারণ প্রসঙ্গে অধ্যপক রাজ্জাক বললেন : তখন মুসলিম প্রধানদের মধ্যে কিছু লোক বললেন : মুসলিম উইল নট এ্যাক্সেপ্ট এডুকেশন আনলেস এ টিজ অব রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন ওয়াজ দেয়ার। এজন্য এ্যারাবিক, পারসিয়ান শুড বি গিভেন এ মোর ইমপোরট্যান্ড প্লেস। এই ধারণা নিয়েই নিউ স্কিম দাঁড় করানো হয়েছিল : নাইদার মাদ্রাসা, নর—ইংলিশ হাই স্কুল। মুসলিম নেতাদের ইচ্ছা ছিল : এই নিউ স্কিম-এর কোপিং স্টোন হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিস-এর ফ্যাকাল্টি। এখানে মেন উইলহ্যাভ বিন ট্রেইন্ড ইন এ্যারাবিক, পারসিয়ান, উর্দু, উইথ সাম রিলিজিয়াস ভিউ। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ইসলামিক স্টাডিস-এ জয়েন করে উইল এ্যাক্ট এজ লিডারস অব দি মুসলিমস।

আবু নাসের ওয়াজেদ সাহেব তখন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। হি ওয়াজ দি প্রপোনেন্ট অব দিস আইডিয়া। অন্যান্য মুসলমান যারা ফেল্ট লাইক দ্যাট, অন্তত এরকম কোনো আইডিয়া তাদের পক্ষে থেকে পাওয়া যায় না। আবু নাসের

ওয়াহেদের নোট আছে : দ্যাট দিস ওয়াজ দি অরিজিন্যাল আইডিয়া বিহাইন্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি : এ্যাট লিস্ট ওয়ান অব দি আইডিয়াস। দেয়ারফোর ইসলামিক স্টাডিস শুড বি সেন্টার পিস। বাট ইট ওয়াজ এ্যালাউড টু ডাই। আবু নাসের ওয়াহেদের পরে আর কেউ এটা নিয়ে খুব লড়াই করে নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এ. কে. ফজলুল হক

ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রথম এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল-এর মুসলমান মেম্বারদের মধ্যে এ. কে. ফজলুক হক সাহেব ছিলেন। মোস্ট প্রবাবলি প্রথম তিন বছরের একটা মিটিংও তিনি এ্যাটেন্ড করেন নাই। মেম্বার ছিলেন, কিন্তু মিটি-এ আসতেন না। পার্টি নেওয়া তো দূরের কথা। ওনলি পার্ট যেটা নিয়েছেন, কাগজে-কলমে যেটা দেখা যায়, তাহলো সি. এল. ওয়ারেন যখন চলে যায় তখন হক সাহেব একটা নোট দিয়েছিলেন : সি.এল. ওয়ারেন যদি চলে যায় তাহলে তখন মুসলমান সমাজ খুব বিক্ষুব্ধ হবে। এছাড়া মুসলমানদের নিডস কী, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হোয়েদার দে শুড হ্যাভ এ্যনি রাইটস—এসবের কোনো আলাপ-আলোচনায় তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না। মোটকথা, তিনি মিটিং-এ আসতেন না। অন্য মুসলমান মেম্বারদের মধ্যে আহসান মঞ্জিল থেকে নওয়াব ইউসুফ থাকতেন। ইউসুফই তখন এঁদের মধ্যে সবচেয়ে এ্যাক্টিভ। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও বোধহয় হয়েছিলেন। আর ছিলেন, আফজাল কি, আজম, এদের একজন। কিন্তু ইউনিভার্সিটির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল-এর প্রোসিডিং-এর মধ্যে এদের কোনো ভূমিকা গ্রহণের উল্লেখ দেখা যায় না। অন্যদের মধ্যে ছিলেন : জ্ঞান ঘোষ, রমেশ মজুমদার পি. কে. বোস। এডুকেটেড নিউ মুসলিম মিডল ক্লাস-এর মধ্যে পাওয়া যায় এক মৌলবী এ. কে. ফজলুল হককে। কিন্তু তিনি তো পার্টি এ এ্যাটেন্ড করতেন না। ইউনিভার্সিটি কোর্ট-এর মিটিং-এ হয়ত আসতেন। আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী রুটিনমাফিক একটা প্রস্তাব দিতেন; মুসলিম হলকে সলিমুল্লাহ হল করা হোক। নওয়াব আলী চৌধুরী, মোস্ট প্রবাবলি এ্যট ও এ ডিস্ট্যান্স টুক সাম ইনটারেস্ট। তাছাড়া ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রথম কবছরের প্রগ্রেসে আর কোনো মুসলমানের কোন অংশগ্রহণ বা ভূমিকা ছিল, এমন তো দেখা যায় না। মুসলমানদের সক্রিয় আন্দোলনগত কাজকর্ম শুরু হয় ফজলুল রহমান সাহেব যখন ইউনিভার্সিটিতে আসে। দে বিগান টু টেক এ্যাকশন। ইন ফ্যাক্ট হি ওয়াজ দি ফার্স্ট। হি প্যারসুয়েডেড শাহাবুদ্দিন টু টেক ইনটারেস্ট। ইউনিভার্সিটিতে প্রথমে ১২/১৪ বছর কোন মুসলমান কোনো ইস্যু টেক-আপ করে নাই। স্যার এফ. রহমান তিন বছর প্রভোস্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপে, তার পার্টিসিপ্যাশন-এ মুসলমানদের সম্পর্কে বিশেষ কোনো ইন্টারেস্ট-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তবে মুসলমানদের একজন হিসেবেই তিনি চাকরি পেয়েছিলেন : কিন্তু দ্যাট দি

মুসলিমস হ্যাড এ প্রবলেম ইন ম্যাটারস অব এডুকেশন, দ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওয়াজ ডিসাইনড টু ডু এ্যাবাইট ইট, সে ব্যাপারে মুসলমানদের তরফ থেকে কোনো কনসার্টেড এ্যাকশন দেখা যায় না। ফজলুল রহমানের পূর্বে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। অবশ্য ফজলুল রহমান পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে পরবর্তীকালে খ্যাতি পেয়েছেন বাংলা ভাষার বিরোধিতাতে ...

ঢাকা ইউনিভার্সিটির গোড়ার দিক, বিশেষ করে ১৯৩০-এর পরের সময় থেকে অধ্যাপক রাজ্জাকের সক্রিয় ভূমিকা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রও শিক্ষকদের সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদির আলোচনা-সমালোচনায়। ফজলুর রহমান সাহেব তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়কেই তাঁর রাজনীতির ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। রাজ্জাক সাহেব ফজলুল রহমান সাহেবের বয়োকনিষ্ঠ হলেও বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ফজলুর রহমান সাহেবের এই সময়কার ভূমিকার কথা আর একটু বিস্তারিতভাবে বলতে যেয়ে রাজ্জাক সাহেব বললেন : ফজলুল রহমান পাস করে উকিল হবেন। আমি ১৯৩১-এ প্রথম যখন ইউনিভার্সিটিতে এলাম তখন তিনি ল' পড়তেন। মুসলিম হলের পলিটিক্স নিয়েই ব্যস্ত পাস করতে করতে বোধহয় ১৯৩৩ হল। হি ওয়ানটেড টু ফাইন্ড এ প্লেস ইন দি ঢাকা ইউনিভার্সিটিস এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে যাওয়ার তিনি চেষ্টা করলেন। তার আগে রেজায়ে করিম সাহেবও একবার মেম্বার ছিলেন। সুলতানউদ্দিন সাহেবও ছিলেন। রাইট অর রং, ইউনিভার্সিটিতে মুসলমানদের বিষয়ে এদের কারো কোনো টোটাল প্ল্যান ছিল না। ফজলুল রহমান ওয়াজ নো বডি এ্যট দি টাইম। সো হি হ্যাড টু ফাইন্ড এ্যান এ্যলাই। শাহাবুদ্দিনকে তিনি কনভার্ট করলেন। এ্যান্ড ইন এ্যালায়েন্স উইথ শাহাবুদ্দিন, উনি ইউনিভার্সিটি পলিটিক্স শুরু করলেন। এর ফলে ফজলুর রহমান বিকেম এ্যান আইসোর টু রেজায়ে করিম হু ওয়াজ ফার মোর ব্রিলিয়ান্ট দ্যান হিম। তাছাড়া হিন্দুদের মধ্যে যারা এক্সিকিউটিভের মেম্বার ছিলেন তারাও ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ছিলেন। ফজলুর রহমানই প্রথম বলতে আরম্ভ করলেন : মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা কম কেন, তারা কেন শিক্ষক হবে না, মুসলমান ছাত্ররা কেন ভর্তি হবে না। অর্থাৎ যেসব কথা আগে কেউ বলে নি, ফজলুর রহমান তা বলতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : মুসলমান ছাত্র ভর্তি হবে না, এ প্রশ্ন কেন এল?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ভর্তি হবে না মানে, তাদের আরো আকর্ষণ করার ব্যবস্থা করা হোক। তার মানে, এমনি এমনি মুসলমান ছাত্র অধিক সংখ্যায় আসবে না। স্পেসিয়াল এর্ফোর্টস হ্যাভ টু বি মেড টু ইনডিউস দেম টু কাম। এক হিসেবে ইট ওয়াজ অপোরচুন ইন দি সেন্স যে, ডাউন ট্যু ১৯৩৫-৩৬ মুসলমান ছাত্র যারা ভর্তি হত তাদের একাডেমিক পারফরম্যান্স ওয়াজ ভেরি পুওর।

অধ্যাপক রাজ্জাক বলতে চাচ্ছিলেন, সবেমাত্র মুসলমান ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষায় আসতে শুরু করেছে। তাই তাদের কৃতিত্বের মান তখনো সমসাময়িক হিন্দু ছাত্রদের তুলনায় উজ্জ্বল ছিল না। এটা ব্যাখ্যা করে বললেন : মানে, একেবারে নতুন তো। বিটুইন ১৯২১ এ্যান্ড ১৯৩৬ খুব সম্ভব তিন চারটি মুসলমান ছেলে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। ইকোনমিক্স-এ ফার্স্ট ব্যাচে দুজন অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পায়। হাফিজুর রহমান যিনি পরে পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং হেদায়েতুল ইসলাম। হেদায়েতুল ইসলাম অবশ্য এম.এ.তে যেয়ে থার্ড ক্লাস পান। হাফিজুর রহমান এম.এ,-তে ফার্স্ট ক্লাস। হাফিজুর রহমান ড. আনিসুর রহমানের বাবা। এছাড়া ইকোনমিক্স-এ, তারপর খুব সম্ভব ১৯৩১-এ সাদেক ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন। ইন বিটুইন ১৯৩১ এ্যান্ড ১৯৩৬, এই তিনজন। এ্যান্ড দিস ওয়াজ মোর দ্যান, ইন মোস্ট আদার সাবজেক্টস। হিস্টোরিতে তিনজন পেয়েছেন : নাজিরউদ্দিন, কামালউদ্দিন, বাচ্চু মিয়া (আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ)। আর কেউ আছে কি না, মনে পড়ছে না।

: জাকির হোসেন সাহেব যিনি পরে গভর্নর হয়েছিলেন, পুলিশ অফিসারও ছিলেন, তিনিও নাকি ভাল রেজাল্ট করেছিলেন।

: জাকির হোসেন বোধহয় ফার্স্ট ক্লাস পায় নাই। ইংরেজিতে শুধু পায় আলতাফ হোসেন যিনি পরে 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। তাছাড়া জাকির হোসেন ঢাকার বি.এ. না; তিনি এম. এ. পড়তে ঢাকা এসেছিলেন। স্যার আবদুর রহিম সেই সময়ে মুসলিম হল ভিজিট করতে আসেন এবং কী কারণে জানি না মুসলিম হল স্টুডেন্টস বয়কটেড হিম। জাকির হোসেন তখন ডাইনিং হল সেক্রেটারি। হি ওয়াজ ও ব্ল্যাকলেগ ইন দি সেন্স দ্যাট হি রিফিউজড টু জয়েন দি বয়কট। সেই খাতিরে ওনাকে নমিনেশন-এ আই পি মানে ইনডিয়ান পুলিশ সার্ভিস-এর সদস্য করা হয়। কিন্তু এ্যাকাডেমিক রেকর্ড ভাল না হলেও তার লেখার ক্ষমতা ভাল ছিল।

অধ্যাপক রাজ্জাকের স্মৃতিশক্তিতে মুগ্ধ হতে হয়। অবশ্য এই সমস্ত পুরনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাদের কথা স্মৃতি থেকে বলছিলেন, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিককার ছাত্র ছিলেন এবং কমবেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে অধিকতর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেই মাত্র অধ্যাপক রাজ্জাকের এই উল্লেখ ও বিবরণ পূর্ণতর করা সম্ভব। অধ্যাপক রাজ্জাক পুরনো মুসলমান ছাত্রদের কৃতিত্বের কথা বলতে যেয়ে বললেন :

ডন-এর আলতাফ হোসেন ওয়াজ দি ওনলি ম্যান হু সিকিউর্ড এ ফার্স্ট ক্লাস ইন ইংলিশ বিটুইন ১৯২১ এ্যান্ড ১৯৩৮-৩৯। তরপরেই খুব সম্ভব মুসা : আবু মুসা শরফুদ্দিন, যে পাকিস্তান আমলে পুলিশের চিফ ছিল, বি.এন. আর-এর ডাইরেক্টর ছিল। তার পিতা ছিলেন গভর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষক, সিরাজুদ্দিন সাহেব, তিনি বরিশাল জিলা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন ১৯৩৮-৩৯ সালের দিকে।

আমি বললাম : 'হ্যাঁ, স্যার। সিরাজুদ্দিন সাহবকে আমি চিনি। আমি ১৯৩৮ থেকে '৪০ সাল পর্যন্ত বরিশাল জিলা স্কুলে পড়েছি। সিরাজুদ্দিন সাহেব তখন বরিশাল জিলা স্কুলের হেডমাস্টার।

রাজ্জাক সাহেব বললেন : এই শরফুদ্দিন ইফ আই এ্যাম রাইট, অনার্স-এ ইংরেজিতে প্রথম ফার্স্ট ক্লাস পায়। তারপর খুব সম্ভব ফজলুর রহমান, যিনি পূর্ব পাকিস্তানে ডিপিআই হয়েছিলেন। এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর মেম্বারও। আমি এম. এ. ডিগ্রি পাই ১৯৩৬ সালে। আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই ১৯৩১-এ। এরা ভর্তি হয়েছে ৩৫-৩৬ সালে : মুসা, কায়সার, নুরুল হুদা। এঁদের সময় থেকে সব সাবজেক্টেই মুসলমান ছাত্ররা অনার্স এবং এম.এ. উভয় পর্যায়েই ফার্স্ট পেতে শুরু করে। কিন্তু এদের পূর্বে তেমন নাই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : নুরুলহুদা, মানে ড. এম. এন. হুদা কি আপনার জুনিয়র?

রাজ্জাক সাহেব বললেন : হ্যাঁ, হুদা, আমার ছাত্রতো, আমার প্রথম দিকের ছাত্র। আতোয়ার হোসেন নূরুল হুদা—এদের কে সিনিয়র, কে জুনিয়র, ঠিক মনে নাই। ১৯৩৫-এ আতোয়ার হোসেন আসলো। অনার্সে সে ফার্স্ট ক্লাস, নূরুল হুদা হয়ত এসেছে ১৯৩৬-এ। আতোয়ার হোসেন এখন বিলেতে আছে, ইকোনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস। ১৯৩৮-এর দিকেই আতোয়ার হোসেন লিটন স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে যায়। বিলেতে যুদ্ধের সময় আটকা পড়ে যায়। দেশে ফিরতে পারে না। হি কেইম ব্যাক ইন ১৯৪৯। এখানে ইকোনমিক্স-এ রিডার হয়। তারপরে হি ওয়াজ প্রফেসর অব কমার্স। এখানে থেকে আর একটা কী চাকরি নিয়েছিল। সেখান থেকে ইস্ট পাকিস্তান-এর প্ল্যানিং বোর্ডে আসে। পরে সেন্ট্রাল প্ল্যানিং বোর্ড-এ যায়। তারপরে '৭২ সালে একবার দেশে ফিরে এসেছিল। আবার বিলেতে চলে গেছে।

: আপনার অনার্স ব্যাচের সহপাঠী কারুর কথা মনে আছে?

: ঐ যে বললাম জালালউদ্দিন সিকদার। ... আমাদের সময়ে সবচেয়ে ভাল ছেলে যে ছিল সে ঢাকাতে পড়ে নাই। কিন্তু ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েটে সে ফার্স্ট হয়েছিল। আবদুস সোবহান চৌধুরী কোলকাতায় যেয়ে আর তেমন ভাল করে নাই। বাট হি ওয়াজ ওয়ান অব দি ব্রাইটেস্ট। তার বাড়ি নাটোরে। আমাদের মধ্যে, আমার নিজের ধারণা, সবচেয়ে ভাল ছেলে ছিল ওসমান গনি যিনি পরে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। আর একজন ছিল। সে পুলিশ সার্ভিস-এ গেছে। বাচ্চু মিয়ার (আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ) ছোট ভাই গেদু মিয়া। বাচ্চু মিয়ার রেজাল্ট ভাল। কিন্তু তার ভাই গেদু মিয়া অনেক সুপেরিয়র ছিল। কোলকাতায় আই.জি. পুলিশ হয়েছিল বোধহয়। হি ওয়াজ রিয়েলি ব্রিলিয়ান্ট। তাছাড়া আমাদের ব্যাচের ভালো ছেলে আর কে ছিল? তেমন

মনে পড়ে না। তবে সাইন্স-এর দিক থেকে দেখলে ড. ওসমান গনি যিনি ইউনিভার্সিটির ভাইসচ্যান্সেলর হয়েছিলেন, তিনি আমার সমাময়িক ছিলেন। একই সময়ের।

আমি জিজ্ঞেস করলাম। স্যার, এখনতো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্সেও কতো ছাত্র; বলা চলে শত শত। তখন আপনারা অনার্সে কতোজন ছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ১৯-২০ জন। এর মধ্যে মুসলমান ছেলে ছিল ৩-৪ জন হয়ত। মহিউদ্দিন, জালালউদ্দিন, হোসেন সেকেন্দার এবং শামসুল হক বলে আর একজন। ... আর বরিশালের একটি ছেলে ছিল। হোয়াট হ্যাপেন্ড টু হিম, আই ডু নট নো। দে ওয়েয়ার অল। আর বাকি সব হিন্দু ছাত্র। ৬-৭ জন মুসলমান। ১০-১২টি হিন্দু। প্রিসাইজ নাম্বার মনে নেই। ১৯-২০-জনের বেশি হবে না। ১৯৩১-এ খুব সম্ভব প্রথম মেয়ে ভর্তি হয়। এর আগে খুব সম্ভব করুণা গুপ্ত নামে একটি মেয়ে পড়েছে। '৩১-এর দিকে আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগে মোট ৪-৫ টি মেয়ে। ইকোনমিক্স-এ একটি মেয়ে পড়ত, সাধনা সেন। এম. এ.তে সে ফার্স্টক্লাস পেয়েছিল। করুনা গুপ্ত বাবা উপেন গুপ্ত ইউনিভার্সিটিতে ফিলসফির অধ্যাপক ছিলেন।

আমি বললাম : স্যার আপনার স্মৃতিতে দেখা যায় যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দশ বছর পরেও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা তেমন নয়। এর কারণ কি?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : কোলকাতা ইউনিভার্সিটির পুলটা হার্ডার ছিল। কোলকাতার টান ছিল বেশি। তখন সব আকর্ষণ কোলকাতার : ঢাকা, রাজশাহী কিংবা চাটগাঁ নয়। গভর্নমেন্ট এবং রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টিও কোলকাতার ওপর। এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির বাজেট এবং কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বাজেট তুলনা করলেই বোঝা যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের বাজেট ওয়াজ হাইয়ার দ্যান দ্যাট অব দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি। সো ইফ ইট ওয়াজ ডিসাইডেড টু হেল্প দি মুসলমানস, দি ম্যাগনিচুড অব দি হেল্প ওয়াজ নট ভেরি কনসিডারেব্‌ল। এমন কিছু ছিল না। কিন্তু সংখ্যার প্রশ্ন নয়, এ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে ডিউরিং প্রিপার্টিশন ডেজ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি যেটা এটেইন করেছিল সেটা এই যে তার এভারেজটা খুব ভালো করেছিল। বেস্ট কিংবা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে তখনো প্রেসিডেন্সি কলেজেই পাওয়া যেত সমস্ত বেঙ্গলে। এটা কোনো চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল না। তবে এখানকার এভারেজ ওয়াজ ফার হাইয়ার দ্যান দি প্রেসিডেন্সি কলেজে এভারেজ। ঢাকাতে ছাত্র কম ছিল এবং দি টিউটোরিয়াল সিস্টেম হ্যাড সাকসিডেড। এটা খুবই সিরিয়াসলি করা হত এবং এইটায় ছাত্ররা উপকৃত হত। নোট পড়ার কোনো ব্যাপার ছিল না। এইটা একেবারেই এলাউড ছিল না। আমাদের সময় 'নোট' সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। কোনো ছাত্র নোট পইড়া পরীক্ষা দিবার লাগছে,

সে যে কোনো ধরনের ছাত্র হোক না কেন, আমাদের ধারণা ছিল না। টেকস্ট বুক পড়া লাইব্রেরি ইউজ করার হ্যাবিট ছিল। এই হিসেবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওয়াজ সাকসেসফুল।

আমি বললাম : স্টাফ, মানে টিচিং স্টাফ তো এখনকার চেয়ে তখন ভালো ছিল। নয় কি?

আমার এ মন্তব্যকে অধ্যাপক রাজ্জাক স্বীকার করলেন না। তিনি বললেন : ভালোর ক্ষেত্রে আমি যদি বর্তমানকে সেদিনের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে আমি মনে করি না যে, বর্তমান আগের চেয়ে খারাপ। এভারেজ অব দি ফ্যাকাল্টি ইজ হাইয়ার নাউ। খুব ভালো শিক্ষক তখন দুএকজন নামকরা ছিলেন প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেই। তবে এভারেজ এখন অনেক হাইয়ার। সেটা এই সেন্সে যে পি.এইচ.ডি করা শিক্ষক তখন সংখ্যায় কম ছিলেন : ডিপার্টমেন্টে দুএকজন করে। আর এখন উইল হ্যাভ হোল্ ডিপার্টমেন্ট যেখানে সকলেরই পিএইচডি। এটা তখন ছিল না।

আমি আবার বললাম : আমরা তো মনে করি তখনকার পি.এইচ ডি এখনকার চেয়ে ভালো ছিল, তখনকার ফার্স্ট ক্লাস এখনকার চেয়ে ভালো।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ওটা চিরকালের কথা। আপনাদের ছেলেরাও মনে করবে তাদের পিতাদের সময়টা ভালো ছিল, তাদের নিজেদের কালে স্ট্যান্ডার্ড কমে গেছে। ওটা কিছু নয়। এটা হিউম্যান ন্যাচার। ইফ দেয়ার ইজ ওয়াটারিং ডাউন, সেটা ওভাবে নয়। এখন সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এই অধিক সংখ্যার এভারেজ পুওর হতে পারে। তবে আজকের উচ্চতর মানের সঙ্গে যদি সেদিনকার উচ্চতর মানের তুলনা করি তবে আজকের উচ্চতর মান ভালো বৈ খারাপ নয়। ধরুন তখনকার মোট পনেরশ' ছেলের সঙ্গে আজকের ইউনিভার্সিটির দশ হাজার ছাত্রের মধ্যে পরেনশকে। তাহলে আজকের পনেরশ' সেদিনকার পনেরশ' চেয়ে ভালো বই খারাপ হবে না। দি ফার্স্ট ১৫০০ অব টুডে আর ইনকমপেয়ারেব্লি বেটার দ্যান ১৫০০ অব দোজ ডেজ। এবং শিক্ষকদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা কওয়া চলে। যেটা সাফার করেছে, সেটা হচ্ছে সেন্স অব রেসপনসিবিলিটি।

আমি জানি অধ্যাপক রাজ্জাক বর্তমানেও নিজের খেয়ালে ঢাকা ইউনিভার্সিটির পুরানো শিক্ষকদের ফাইল স্টাডি করছেন। পুরনো জিনিস মাত্রেই তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তার কথা উল্লেখ করে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম :

স্যার, আপনি তো পুরনো শিক্ষকদের 'বায়োডাটা' স্টাডি করছেন। তাতে আমাদের বর্তমানের শিক্ষক এবং সেদিনকার শিক্ষক এদের মধ্যে তুলনাটিতে কী দেখতে পাচ্ছেন? তখনকার শিক্ষকদের এ্যাকাডেমিক কোয়ালিটি, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং এখানকার শিক্ষকদের শিক্ষা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার কি কোনো পার্থক্য আছে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ডিফারেন্স আছে, অনেক পার্থক্য, এটা ঠিক। যেমন ধরুন পুরনো একটা কলেজের শিক্ষকদের কথা বলি। কুমিল্লার শ্রীকাইল কলেজ। সেদিন তাদের এক বার্ষিকীতে পুরনো শিক্ষকদের একটি পরিচয় দেখলাম। সেখানে কলেজের প্রথম বছরের শিক্ষকদের লিস্টে দেখা যায় পি. আর. এস. আছে, পি এইচ. ডি. আছে। বাকি সবও অল এলং ফার্স্ট ক্লাস। দিস উই ডু নট হ্যাভ নাউ। কিন্তু অন্যদিকে আজকের ঢাকা ইউনিভার্সিটির ৭০০-৭৫০ শিক্ষকদের মধ্যে তিনশ' থেকে চারশ' অবশ্যই উত্তম। কিন্তু বাকি যারা, তাদের ক্ষেত্রে কথাটা বলা অসুবিধাজনক। এক্ষেত্রে নতুন ডিপার্টমেন্টগুলোই সাফার করেছে সবচেয়ে বেশি। কমার্স অ্যান্ড এলায়েড ডিপার্টমেন্টস, সোসিওলজি—এইসব ডিপার্টমেন্টেরই ঘাটতি বেশি। অন্য ডিপার্টমেন্টগুলোতে এমন নয়।

তবে আমি এটা মনে করি না যে টোটাল পিকচার টুডে কম্প্যোয়ার্স আনফেভারেবলি। যেটা একেবারেই কিছু করা যাচ্ছে না এবং ক্যামনে হবে, আই ডু নট নো, যে ঐ সেন্স অব রেসপনসিবিলিটি নেই। ঐ যে একটা সেন্স অব শেম সেকালে দেখেছি ফর নট হ্যাভিং টেকেন-এ ক্লাস, নট হ্যাভিং ডান এনি ডিউটি : দিস সিমস টু হ্যাভ ভ্যানিসড। বাট দিস ইজ নট পিকুলিয়ার টু দি ইউনিভার্সিটি। এটা তো কেবল ইউনিভার্সিটিরই বৈশিষ্ট্য নয়। এই যে লুজেনিং অব বাউন্ডস, শৃঙ্খল মুক্তির স্বাধীনতা—শিকল বলেন, বন্ধন বলেন, তার থেকে মুক্তির ভাব : দিস কামস ফার্স্ট ইন দি সোসাইটি এট লার্জ। অবশ্য বলা চলে ইট শোস মোর মার্কডলি ইন দি ইউনিভার্সিটি : বিশ্ববিদ্যালয়ে চোখে বেশি ঠেকে। বাট টু এক্সপেক্ট দ্যাট দি ইউনিভার্সিটি উইল কন্টিনিউ টু মেইনটেইন এ স্ট্যান্ডার্ড অব প্রবিটি, ইনটেগ্রিটি আউট অব অল রিলেশন টু সিমিলার ভ্যালুস অবটেইনিং ইন দি রেস্ট অব দি সোসাইটি, এই ধরনের এক্সপেক্টেশন ইজ নট রিয়ালিস্টিক। দি ইউনিভার্সিটি উইল মিয়ারলি শো ইন মোর মার্কসড ফর্ম সেইম কাইন্ড অব ভ্যালু হুইচ অবটেইনস ইন দি সোসাইটি। এইটা ভবিষ্যতে যাবে না। আমার ধারণা, সেকেন্ডারি স্কুলিং ভালো না হলে এটা হবে না। সেকেন্ডারি স্কুলিং ভালো হতে বহু সময় লাগবে। ইন দি মিনহোয়াইল, যা হবার হবে।

১৯৭৫-এর ঘটনার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের দণ্ডদান ইত্যাদির কথাও কথা প্রসঙ্গে এসে যায়। অধ্যাপক রাজ্জাক বলেন, যে যে কাজের উপযুক্ত নয়, আপনি তাদের সেই কাজ দিবেন, তাদের সেই দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তারপরের তারা, তাদের স্বভাব অনুযায়ী কাজ করলে তাদের দণ্ড দিবেন—এ বিধানের যথার্থতা কি? আজ আপনারা যারা দণ্ডদাতা তারা বলছেন অমুক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই পদের উপযুক্ত নয়, সে দুর্নীতি করেছে, সে অপরাধ করেছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট ব্যক্তি তো গতকালও তার চরিত্র নিয়ে বিশিষ্ট ছিল। তখন তাঁকে বিশিষ্ট কাজের জন্য উপযুক্ত করলেন আপনাদের কোন বিবেচনায়। ... 'শাস্তি দিবার আনন্দে আপনারা শাস্তি দিতে চান, শাস্তি দেন, ভালো কথা।

কিন্তু এ শাস্তি কোনো কাজ দিবে না।' আলাপ করতে করতে অধ্যাপক রাজ্জাক নিজের ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন : মৌলবী অমুক আপনার শিক্ষার বিধাতা। অথচ তাঁর না আছে শিক্ষা সম্পর্কে সামগ্রিক কোনো ধারণা, না স্থিরভাবে রচনা করতে পারেন কোনো পরিকল্পনা তাহলে হোয়াট অন আর্থ ডু ইউ এক্সপেক্ট আউট অব দেম। এঁদের কাছ থেকে আপনি কী প্রত্যাশা করেন?

আমরা একটু ফোড়ন কাটলাম : স্যার মৌলবী বলতে তো আপনি এ. কে. ফজলুল হককেও মৌলবী ফজলুল হক বলেন। তাহলে তাঁর সম্পর্কে আপনার এসটিমেট কী?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : মৌলবী ফজলুল হকের আর যে দোষ থাক, অজ্ঞানতার দোষ ছিল না। উনি জ্ঞানপাপী ছিলেন। উনি যা করেছেন তার বিচার অন্য কনসিডারেশন দ্বারা করতে হবে। উনি মনে করতেন যে সেন্টার অব আর্থ ওয়াজ মৌলবী আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং মৌলবী আবুল কাসেমের ভালো হলেই সমগ্রর ভালো হবে। এই ওনার কথা। স্বজনপ্রীতি বলেন আর যা-ই বলেন, এটা তার একেবারে ওয়েলরিজনড : একেবারে যুক্তিসঙ্গত। হক সাহেব সম্পর্কে অধ্যাপক রাজ্জাকের এমন উক্তিতে যেমন কিছুটা সরস সমালোচনা, তেমনি সশ্রদ্ধ প্রশংসার ভারও প্রকাশ পাচ্ছিল।

এই আলোচনার দিনই আবার কথা উঠেছিলো ইউনিভার্সিটির গোড়ার দিকের অধ্যাপকের সম্পর্কে : তখন কারা ছিলেন, তাদের কীভাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল? অধ্যাপক রাজ্জাক বলেছিলেন : প্রথমদিকের প্রফেসরদের ইনভাইট করে আনা হয়েছিল। প্রথম এ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো হয়েছিল ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট হওয়ার পরে বিফোর দি ভ্যারিয়াস অবগানস ওয়েয়ার ক্রিয়েটেড। প্রথমে ইউনিভার্সিটির জন্য একটা এডভাইসরি কমিটি করা হয়েছিল স্যার আশুতোষ ও অন্যদের নিয়ে। স্যার আশুতোষ অবশ্য কোনোদিন ঢাকায় আসেন নাই। এই এডভাইসরি কমিটি এ্যাপয়েন্টমেন্টের নামগুলো ঠিক করে দিতেন। তারপর চ্যান্সেলর তাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতেন পেন্ডিং দি ক্রিয়েশন অব দি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এন্ড কনফারমেশন বাট ইট। এভাবে প্রথম দিককার পঞ্চাশ কি একশ'জন টিচার ছিল। এদের মধ্যে নরেশ সেন, রমেশ মজুমদার, এফ. রহমান—এঁরা ছিলেন। এছাড়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ছিলেন। সবাইকে প্রথমদিকে তিন বছর কিংবা এক বছর করে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিত। পরে বিবেচনা করত পারমানেন্ট কন্ট্রাক্ট দিবে কি না। মায়না ইত্যাদির ব্যাপারেও প্রথমে যা দিয়েছিল, পরে তা বদলে কমিয়ে দেয়। হরপ্রসাদ বাবুর পরে এস.কে. দে (সুশীল দে) যখন আসেন তখন তিনি রিডার হয়ে এসেছিলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তার প্রথম এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল রিডার ইন ইংলিশ হিসেবে। এইখান থেকে উনি বিলেত গেলেনএবং ডিলিট করে এলেন। সংস্কৃত পোয়েটিক্স-এর ওপর। ফিরে আসার পরে তাঁকে সংস্কৃত অর্থাৎ

সংস্কৃত এবং বাংলার রিডার করা হল। হরপ্রসাদ বাবুর যে সময়ে তিন বছর শেষ হয়ে গেল তখন সুশীল দে ওয়াজ এ লিটসএ্যাংসাস টু দি দ্যাট হি বিকামস প্রফেসর।

ইউনিভার্সিটিতে পদ প্রাপ্তির যে চিরন্তন কৌশল ও প্রক্রিয়া : তার ইঙ্গিত করে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এ ক্ষেত্রে এই মহারথীদের মোড অব অপারেশন আজকালকার থেকে খুব যে ডিফারেন্ট ছিল, এমন নয়। বিষয়বস্তু একই,তবে অপারেশনটা একটু মোর সারটল ছিল। সুশীল দে তখন ডিন। ডিন হিসেবে তিনি একটি ছোট্ট নোট দিলেন শাস্ত্রীকে। প্রফেসর শাস্ত্রী কতোদিন ডিউটি লিভ নিয়েছেন গত সেসনে? এটা দেখে হরপ্রসাদ বাবু তাড়াতাড়ি লিখলেন, তিনি আর এক্সটেনশন চান না। সেদিনকার এ কাহিনী বলে ব্যাপারটার কৌতুকের দিকটায় অধ্যাপক রাজ্জাক হেলে উঠলেন।

তারপরে আর এক কাহিনী বললেন : নগেন ঘোষ ল'র ডিন ছিলেন। সে অবশ্য আরো পরে। নগেন ঘোষকে বয়স্ক অবস্থায় আনা হয়। আসবার সময়ে তাঁকে মৌখিকভাবে কথা দেওয়া হয়েছিল যে তাঁকে বয়সের এক্সটেনশন দেওয়া হবে : আরো পাঁচ বছর বা তিন বছর। যেদিন চাকরি শেষ হবে তার ছয় মাস আগে তাকে জানানো হবে। এটা তখনকার প্রাকটিস ছিল। আগে থেকে নোটিশ দেওয়া হত, যে অমুক তারিখে আপনার চাকরির মেয়াদ শেষ হবে। শেষ হলে ভি.সি. চিঠি দিত : উড ইউ লাইক টু বি কনসিডারড ফর এ্যান এক্সটেনশন? চিঠিতে আরো বলা হত : আপনি যদি এক্সটেনশন চান তাহলে বিষয়টিকে আমি এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে দেব এবং ইউ উইল হ্যাভ টু আন্ডারগো এ মেডিক্যাল এক্সামিনেশন : আপনার স্বাস্থ্যগত যোগ্যতার একটি সার্টিফিকেট দিতে হবে। নগেন ঘোষকেও ভি.সি. এই চিঠি দিয়েছিলেন। তবে তার একাডেমিক কাউন্সিল-এর কথাটা ছিল না। নগেন ঘোষ জবাবে জানালেন, তাঁর সঙ্গে কথা ছিল যে তাকে এক্সটেনশন দেওয়া হবে এবং তিনি একটি এক্সটেনশন আশা করেন। নগেন ঘোষকে এরপরে জানানো হল দি ম্যাটার উইল হ্যাভ টু বি পুট বিফোর দি এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল। একথা জেনে তিনি জবাব পাঠালেন : ইফ ইট বি এ সাবজেক্ট অব ডিসকাসশন বাই দি এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, আই উড নট ওয়ান্ট দি এক্সটেনশন : এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের এটি বিবেচ্য বিষয় হলে আমার এক্সটেনশনের প্রয়োজন নেই।

নরেশ সেনকেও তাই করা হয়েছিল। নরেশ সেন ওয়াজ দি ওনলি টিচার যাঁর মাইনে একচোটে আঠারশ' টাকা ধার্য হয়েছিল। পরে মায়নার হার কমানা হয়। অন্য প্রফেসরদের পরবর্তী পর্যায়ে সাড়ে এগারশ' কি বারশতে ঠিক করা হয়। নরেশ সেন, আড়াইশ' টাকার একটা এ্যালাউন্স ছিল। মায়না কমানোতে নরেশ সেন লিখেছিলেন, দিনকাল যখন এতই খারাপ, তখন আমি আমার এ টাকা চাই না। দিস মে বি ইউসড ফর স্কলারশিপ টু জগন্নাথ হল স্টুডেন্টস। কিন্তু দেখা

গেল ইউনিভার্সিটি তাঁর প্রস্তাবের প্রথম অংশটা ঠিকই গ্রহণ করেছে, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি নয়।

আমি প্রশ্ন করলাম। নরেশ সেন তো ল'র প্রফেসর ছিলেন?

: হ্যাঁ, তাই আগের দিনে ঝগড়াঝাটি ইউনিভার্সিটিতে ছিল না যে, তার নয়। তবে দেখা যায় পয়সাকড়ির প্রতি আসক্তিটা একটু কম ছিল, অন্যদের তুলনায়। ফলে অন্যরা এঁদের কাছে একটু বিব্রত, একটু অকওয়ার্ড ফিল করত।

নরেশ সেন বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক। অধ্যাপক রাজ্জাক নরেশ সেন সম্পর্কে আর একটি গল্প বললেন।

ইউনিভার্সিটির প্রথমে কোনো স্ট্যাটুটরি বা আইনগত গ্রান্ট ছিল না। নরেশ বাবুর মনে হয়েছিল, সরকার ইউনিভার্সিটি তুলে দিতে পারে। ফলে ঢাকায় বছর তিনেক থাকার পরে তিনি ইউনিভার্সিটিকে বললেন : এই বয়সে আমি তো অন্যকিছু করতে পারবো না, তাই তোমরা যদি আমাকে এক বছরের ছুটি দাও তাহলে আমি কোলকাতার বারে চেষ্টা করে দেখতে পারি : তাই মে ট্রাই মাই লাক। এই কথা বলে তিনি ছুটি নিয়ে কোলকাতা চলে যান। ছুটি নিয়ে যাবার কিছুদিন পরে ইউনিভার্সিটির সেসনের শুরুতে স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটা ছোট্ট খবর বেরোয় যে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিস প্রফেসর অব ল' হ্যাজ লেফট দি ইউনিভার্সিটি এ্যান্ড ইজ প্র্যাক্টিসিং এ্যাট দি বার। এ খবর দেখে ভি.সি হারটগ টুক অবজেকশন। তিনি বললেন : দিস ইজ এ রিফ্লেকশন অন দি ইউনিভার্সিটি, এইটা নিয়ে নরেশ সেন আর হারটগের মধ্যে পত্র লেখালেখি চলে : দেয়ার এনসিউড এ্যান এ্যাকরিমোনিয়াস করসপন্ডেন্স। ভি.সি. নরেশ সেনের কাছে কৈফিয়ত চাইলো। নরেশ সেন পদত্যাগ করে দিলেন। শেষের দিকে নরেশ সেন আবার লিখেছিলেন যে,হি উড লাইক টু উইথড্র হিজ রেজিগনেশন। কিন্তু ইউনিভার্সিটি আর রাজি হল না তাঁকে ফিরিয়ে নিতে। বাট আন্ডাএটডলি নরেশ সেনওয়াজ এক্সেপশনাল ইন রিনাউন এ্যান্ড এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন।

এদিনকার আলাপে রাজ্জাক অধ্যাপক সত্যেন বসুকে আবার স্মরণ করলেন। তিনি যে আউটস্টান্ডিং ছিলেন, সেকথা বললেন। আইনেস্টাইন, হাইসেনবার্গ, ম্যাকস-ওয়েল : এঁদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁকে প্রথমে প্রফেসর করা হয় না। ডি. এম. বোসকে করা হয়েছিল। এ সমস্ত উল্লেখ করে রাজ্জাক সাহেব বললেন : একটা জিনিস আমি মনেকরি, যাঁরা আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়কে সংস্কার করার চেষ্টা করবেন ...

আমি সহাস্যে একটু বাধা দিয়ে বললাম, স্যার আমি ছোট মানুষ, অত বড় কাজের কথা আমি কল্পনা করছিনে।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : না, আমি বলছি যাঁরা আজকাল ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে কথা বলেন, যাঁরা ভি.সি. ইত্যাদি হন তাঁদের একটু অতীত সম্পর্কে

জেনে নেওয়া ভালো। তাছাড়া ইউনিভার্সিটির কোন ফাংশনটা কী সে সম্পর্কে পরিচিত হওয়া ভালো।

ধরুন একজন শিক্ষকের কথা। জানা দরকার একজন শিক্ষকের 'ফাইল' ক্রমান্বয়ে যে মোটা হয়েছে তা কীসের ভিত্তিতে হয়েছে। এই ফাইলে কী লেখা হয়? আমি তো এই ফাইল ঘাটতে যেয়ে দেখেছি, এমন প্যুরইল ব্যাপার, ছেলেমানুষি কারবার যে, ফাইলের ৪০ পৃষ্ঠার ৩৫ পৃষ্ঠাই হবে অন লিভ : ছুটির ব্যাপার : একদিনের ছুটি, দুদিনের ছুটি, তিনদিনের ছুটি। এগুলো লিখে সময় এবং অর্থ ব্যয় করার কী তাৎপর্য। এখন ইউনিভার্সিটির যে টাকা ২০-২৫% টাকাই ব্যয়িত হয় ইউনিভার্সিটির এ্যাডমিনস্ট্রেশন। ইউনিভার্সিটি নাউ কনসিস্টস অব ১৭০০-১৮০০ ক্লাস ফোর এমপ্লইজ, পিয়ন, চাপরাসি ইত্যাদি এবং ৩০০-৪০০ ক্লাস থ্রি এমপ্লইজ।

অধ্যাপক রাজ্জাকের এ আলোচনা অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস নিয়ে নয়। তার আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের প্রশাসনিক সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সে বিষয়ে তাঁর মতামত। তবু আমরা এ আলাপে বাধা দিলাম না। কারণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সমস্যা সম্পর্কেও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করেছেন। সেদিক থেকে তাঁর মতামত মূল্যবান। তাছাড়া তাঁর এ আলাপের আত্যন্তিকতার আকর্ষণটিও আমাদের বেশ নিবিষ্ট করে রাখছিলো।

অধ্যাপক রাজ্জাক বলছিলেন : এই এন্টায়ার এক্সাসাইড ইজ আননেসেসারি। আমাদের ৫০০-৬০০ কেরানী। এদের ছাত্রদের সঙ্গে কনটাক্টটা কী দেখুন : সংযোগটা কী। ছাত্রদের তারিখ মতো মায়না দিতে হবে। তারিখ মতো মায়না না দিলে জরিমানা দিতে হবে। তার তারিখ নির্ধারণ তারিখ বর্ধনে, নাম কাটা, নাম তোলা, এ্যাডমিশন, রি-এ্যাডমিশন ইত্যাদি, ইত্যাদি। এর জন্য বিপুল ব্যবস্থা। এই রেজিস্ট্রার, ঐ রেজিস্ট্রার। এরা স্কলারশিপদেন। স্কলারশিপ নিতে হলে অমুক তারিখে আসতে হবে, না এলে অমুক হবে, তমুক হবে ইত্যাদি। এর কোনোটারই দরকার আছে বলে মনে করি না। এগুলো তো বুক ট্রান্সাকশন : খাতা লেখা : ছাত্রদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া, সিটরেন্ট আদায় করা ইত্যাদি। এর প্রত্যেকের জন্যই আপনি স্টাফ রাখছেন, কর্মচারী লাগাচ্ছেন।

রাজ্জাক সাহেব বললেন : আপনি যদি এর বদলে বলতেন যে, এনি স্টুডেন্ট এ্যাডমিটেড টু দি ইউনিভার্সিটি, তাকে বাৎসরিক ২০০ কিংবা ৩০০ কিংবা যে পরিমাণই নির্দিষ্ট করেন সে পরিমাণ টাকা তাকে দিতে হবে। এ ব্যাপারে ছাত্রের সঙ্গে ইউনিভার্সিটির আর কোনো ট্রান্সাকশন নাই। এই টাকাটা সে ব্যাঙ্কে জমা দিবে। এর দেখাশোনার কাজ ব্যাঙ্ক করবে। তাহলে সব ব্যাপার যেমন নিশ্চিত, তেমনি কি সহজ হয়ে যায় না?

অধ্যাপক রাজ্জাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাভারি কর্মচারীদের কাজ, সংখ্যার র‍্যাশনালাইজেশন বা যুক্তিসঙ্গত বিন্যাসের সমস্যাটি তুলে ধরছিলেন। সমস্যাটি

গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমার মনে হচ্ছিল এই যুক্তিসঙ্গত সমাধান যে আমাদের দেশের কোনো ক্ষেত্রেই গৃহীত হয় না, এবং হচ্ছে না, তার কারণ সমগ্র সমাজব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস যুক্তিসঙ্গত সমাজ কাঠামোতেই সম্ভব। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অসঙ্গতির পরিমাণই বৃদ্ধি পাচ্ছে—তার কারণ অসঙ্গতিই এর ভিত্তিভূমি। কিন্তু সেকথা তুলে অধ্যাপক রাজ্জাকের আলাপের ধারাটিকে আমি বন্ধ করতে চাইলাম না।

অধ্যাপক রাজ্জাক বলে চললেন : ফার্স্ট আই গট ইন্টারস্টেড ইন দি ম্যাটার ইন ১৯৬৫ অর ১৯৬৭। তখন আমি গোটা বিদেশের গোটাকুড়ি ইউনিভার্সিটিকে চিঠি লিখেছিলাম যে তোমাদের এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্ডিচারটা কী? এর মধ্যে চার পাঁচটা ইউনিভার্সিটি এক্সপেন্ডিচার? তাদের একটা বাজেটের পাশে দাগ দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে : ডু ইউ মিন দিস? এর জন্য আবার এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্ডিচার কী হতে পারে, তা তারা বুঝতে পারে না। ধরুন, আমাদের মাস্টারদের মায়না দেবার কথা। ১২ মাসের মায়না দিতে ১২ বার কেরানী সাহেবরা বিল তৈরি করবেন, তার এটা ওটা কত্তো রকমের কাজ। কেন, এ না করে, বছরে তিনবার আপনার বেতনের টাকা ইউনিভার্সিটি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিতে পারে। হতে পারে এই তিন মাস কিংবা চার মাসের মধ্যে একজন শিক্ষক মরে যেতে পারে, তাতে ইউনিভার্সিটি তার কাছে কিছু টাকা ফেরত পেতে পারে। এটা হতে পারে। কিন্তু এটার চান্স কতখানি। আর একটা লোক যদি মরেই যায়, তাহলে সে আপনার দুমাসের মায়না বেশি নিয়ে মরলে এমন কি মারাত্মক ক্ষতি ইউনিভার্সিটির হবে; অথচ এটার জন্য আপনাদের একটা ব্রাঞ্চের সমস্ত স্টাফ নিয়োজিত।

অধ্যাপক রাজ্জাক একটু থামলেন। কী যেন স্মরণ করলেন। তারপরে বললেন, একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল-এর কথা বলি : ইউ.সি. নাগ ইংরেজির লেকচারার। রংপুর থেকে একটা সময় এসেছে, তাকে রংপুরে জজকোর্টে সাক্ষ্য দিতে যেতে হবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াল ছুটির। সে অবশ্য ছুটি পেতে এন্টাইট্ল্ড। কিন্তু এই ছুটির মায়নাটা কে দিবে—এ হচ্ছে তাঁর ফাইলের একটা বড় প্রশ্ন। একটা করেসপন্ডেন্স শুরু হল। নোটশিটে কেরানী সাহেব নোট করল। সে তার ঊর্ধ্বতনকে দিল। ... আস্তে আস্তে ফাইলটা রেজিস্ট্রারের কাছে আসল। রেজিস্ট্রার পাঠাল ভি.সি.র কাছে। শেষ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটির লিগ্যাল এ্যাডভাইজারের সঙ্গে পরামর্শ করা হল। সেই পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হল, সিভিল কোর্টে সাক্ষ্য দিলে বাদী-বিবাদী খরচ বহন করবে। সুতরাং ইউনিভার্সিটির ঠিক করল, এ টাকা সে দিবে না। এ টাকা দিবে মামলার পক্ষে; এটা পার্টি দিবে। এরপরে আমরা, মানে বিশ্ববিদ্যালয়, জজের কাছে এই মর্মে চিঠি লিখলাম যে, এই ছুটি সময়ের অর্থাৎ ফুল্লি দুই কিংবা তিনদিনের মায়না জজ সাহেবকে দিতে হবে। কারণ জজ সাহেব তো সমন পাঠিয়েছেন। জজ সাহেব জবাব দিলেন, ঠিক

আছে ছুটির মায়না সরকার দিবে। এ্যারেঞ্জমেন্ট টু দ্যাট এফেক্ট হ্যাভ বিন মেড। ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ফাইলের এই হচ্ছে ইতিবৃত্ত।

রাজ্জাক সাহেব বললেন : এখানেই শেষ নয়। আমি এই ফাইল নিয়ে চেষ্টা করেছিলাম হিসাব বের করতে পারি কী না, 'ছুটির মায়না কে দেবে' এই প্রশ্নের সমাধানে ভি.সি. থেকে শুরু করে সবার কাজের সময়ের কতোটা ব্যয় করতে হয়েছে এবং তাদের পদমর্যাদার উচ্চতা-নিম্নতা অনুসারে এই মোট সময়ের আর্থিক মূল্য কত খরচ হয়েছে। একটা এ্যাকাউন্ট আমি আন্দাজ করেছি, এবং তার পরিমাণ যত হয়। সে পরিমাণ দিয়ে এই পরিমাণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ; সোজা এ্যাবসার্ড ছাড়া আর কিছু নয়। সে যাক। এই অবস্থায় এই হবে। এই হচ্ছে। ইউ.সি. নাগের টাকা তো জজ সাহেব স্যাংশন করলেন। তিন চার মাস পরে জজ সাহেব টাকাও পাঠিয়েছেন মানি-অর্ডার করে। সে টাকার পরিমাণও এমন কিছু নয়। তবে টাকাটা পাঠাবার সময়ে জজ সাহেব স্বাভাকিভাবে 'মানি-অর্ডারের' কমিশনটা কেটে রেখেছেন। ছআনা কিংবা আট আনা হবে। কিন্তু তখন আবার প্রশ্ন দাঁড়াল। এই ছ'আনা প্রাপক কেন দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ অতঃপরএর ওপর আর এক কিস্তি পত্রালাপ শুরু করল। এ কাহিনীকে রাজ্জাক সাহেব শেষ বললেন : অবশ্য বুক-ব্যালান্স অর্থাৎ খাতায় পত্রে ঠিকঠাক করতে গেলে এই সব খুঁটিনাটির প্রশ্ন দেখা দিতে পারে কিন্তু আমি বলি, এর একটা সীমা থাকা দরকার।

আমরা প্রশ্ন করলাম : কিন্তু স্যার, আপনি এখানে কী করতে পারেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আগে দেড়হাজার দুহাজার ছাত্রের সময়ে এই খুঁটিনাটি হিসাব হয়ত ম্যানেজ করা যেত। তার বাড়াবাড়ির একটা এ্যামুজেমেন্টের দিক ছিল। কিন্তুআজ চিন্তা করে এর বিকল্প তো একটা কিছু বের করতে হবে। এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির সরাসরি ব্যবস্থাপনার পনের-বিশ হাজার ছাত্র। 'এখন তো এটা একটা সর্বনাশের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেছে। 'আমি ;৬৭-৬৮তে দেখেছি ক্লাস ফোর এমপ্লয়িজ সাড়ে সাতশ'। আজ '৭৫-৭৬-এ তো ১৫০০। বিদেশে অন্য কোথাও এমন ব্যবস্থা নেই। বিদেশের কোনো ইউনিভার্সিটিতে এতো সংখ্যা নাই। দিস ইজ আনইমেজিনেব্‌ল।

এরপরে অধ্যাপক রাজ্জাক এ ব্যাপারে আর একটা দিকের উল্লেখ করলেন।

সংখ্যাগত যেমন এই অবস্থা, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কোনো ইউনিভার্সিটির হেড কিংবা ভি.সি. রেজিস্ট্রার ইত্যাদি—এদের সঙ্গে এই কর্মচারীদের মায়নার যে অনুপাতগত ব্যবধান বিস্ময়কর। ১৯২০-এ একজন প্রফেসরের মায়না আমরা এক হাজার টাকায় লিমিট করলাম। '৫২-৫৩ পর্যন্ত এই ছিল। তখন একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মায়না ৮ টাকা। এ্যান্ড কন্টিনিউড এ্যাট দ্যাট। সবচেয়ে রিমারকেবল হল, ইতিহাসের এই সময়ে অন্য সব পর্যায়ের কর্মচারীদের মায়না নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাদের বিভিন্ন স্তরের হার পরিবর্তিত

ও বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু এদের এই আট টাকা মায়নার কথা কোনোদিন বিচার্য বিষয় হয় নাই। দিস ইজ ফ্যান্টাস্টিক। ইউনিভার্সিটিতে আমরা তো সবাই সমাজের সাব, ক্রিম অব দি সোসাইটি। এই 'ক্রিমরা সব' নিজেদের দেনা-পাওনার কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু এই বিশ বছর পঁচিশ বছরে, ইউনিভার্সিটিতে যে এক শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে যাদের মায়না সেই আট টাকাতে অপরিবর্তিত রয়েছে, তা আমাদের কারোর বিচেনার সামনে কখনো ওঠে নাই। এদের মধ্যে বহু আছে, ২-২৫-৩০ বছর ধরে ইউনিভার্সিটিতে কাজ করছে। কিন্তু আজো তারা দিন-চুক্তিতে নিযুক্ত হয়। তারা দিনমজুর। তাদের চাকরিগত কোনো 'রাইট' নাই। তারা 'মাস্টার রোলের কর্মচারী।'

একটু থেমে অধ্যাপক রাজ্জাক আবার বললেন : একটা কেস আমাকে একেবারে আশ্চর্য করেছে। মুসলিম হল, মানে সলিমুল্লাহ হলের একটি মেয়ে মালী। আমি যখন '৩১ সালে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই, তখন এই মেয়েটিকে হলের মালী হিসেবে দেখি। আর '৬৫ কি '৭০ সালেও তাকে ইউনিভার্সিটির কার্জন হলে দেখলাম, কাজ করছে, বৃদ্ধা হয়েছে—কিন্তু সেই মাস্টার রোলে, দিনমজুর।

আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য বললাম : মালীর কাজ করতো?

রাজ্জাক সাহেব বললেন : হ্যাঁ মালীর কাজ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কাজ যাই হোক, এই ব্যবস্থাটাকে আপনি কী বলবেন। এ্যাজ এ রেজাল্ট দে হ্যাভ রিএক্টেড। তাদের কাজের নমুনা দেখুন। মুজাফফর যখন ভি.সি. আমি তখন এদের কাজকর্মের, এদের মানে, প্রশাসনের বিভিন্ন সেকশনের কাজের কিছু তল্লাশি নিয়েছিলাম। আমি প্রেস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে দেখেছি, এদের কাজের যে মায়না আমরা দিই, সে পরিমাণ টাকার কাজ আমাদের নেই। আমরা যদি এ কাজ ইউনিভার্সিটির এই কর্মচারীদের বদলে বাইরে থেকে করাতাম তাহলে এর চেয়ে কম টাকায় কাজ হত। আমাদের ইউনিভার্সিটির প্রেসে ৪০-৫০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আছে। আমার প্রস্তাব ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রেসকে 'টার্ম জব' হিসেবে লিজ দিয়ে দিক, ম্যানেজমেন্টের ভার অন্যদের থাকবে। তাদের সঙ্গে আমাদের শর্ত থাকবে, আমাদের অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ তারা আগে করবে। আমাদের কাজের বাইরে যে কাজ হবে, তার মুনাফার অর্ধেক ইউনিভার্সিটি পাবে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জন্যও একই ব্যবস্থা করা যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বছরে ১৪-১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়। অথচ কাজের পরিমাণের দিক থেকে বছরে ১৪-১৫ লক্ষ টাকার কাজ হয় না। কারণ ইউনিভার্সিটির যে দালানকোঠা এগুলো তো ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট নিজে বানায় নাই। এসব বিল্ডিং তো কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে কন্ট্রাক্টর দিয়া বানানো।

আমরা সঙ্গী ফজলে রাব্বি প্রশ্ন করলেন : তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের কাজ কী?

রাজ্জাক সাহেব বললেন : সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে এই বিভাগেও শত শত কর্মচারী। তারা কাজ করে মাইনর রিপোয়ারের কাজ। তারা বিল্ডিংয়ের চুনকাম করে। তাও যেটা তিন বছরে একবার করার কথা তা সাত বছরে হয়ত একবার হয়। পানির ব্রেক ডাউন হলে তার সাপ্লাইটা ঠিক করা—এইসব এদের কাজ। এই বিভাগে যারা কাজ করেন, তাদের সকলেই আমি তাদের কম বয়সে দেখেছি। আমি একদিন ঠাট্টা করে বললাম : বাবারা, এগুলো যদি তোমাদের হাত থেকে নিয়ে যাই, আর তোমাদের পেনশন দিয়ে দিই তাতে আমার,মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতিটা কি? ... আমি তো বলি বর্তমানেও ইউনিভার্সিটিকে তিনটা এরিয়াতে ভাগ করা হলে : কার্জন হল, মেডিকেল কলেজ-নীলক্ষেত আর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ও আর্টস বিল্ডিং এ্যারিয়া। আমার প্রস্তাব হত, সবগুলোর ক্ষেত্রে না হলেও প্রথমে কার্জনহল এলাকার কাজ বাইরের কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হোক। এই ফার্মই কন্সট্রাকশন, মেইনটেনান্স ইত্যাদি সব করবে। শুধু ছোটখাট কাজ এবং জরুরি অবস্থার জন্য ইউনিভার্সিটি নিজের কিছু কর্মচারী রাখুক। এক্ষেত্রে সরকারি দৃষ্টান্তও আছে। সরকারের আইন আছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের ভিত্তিতেই মাত্র সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, এ্যাসিস্ট্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদির নিয়োগ হবে। কাজের পরিমাণের দিক থেকে ইউনিভার্সিটিতে একজন সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারও রাখতে পারে না। রাখতে পারে কেবল ওভারশিয়ার। সেখানে আমাদের দুজন সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে। এইভাবে ইউনিভার্সিটি ক্রমান্বয়ে একবিরাট শ্বেতহস্তীতে পরিণত হচ্ছে ... ।

এ প্রসঙ্গের মধ্যে আমরা আর বেশি জড়িত হতে চাইলাম না। আমরা আবার অধ্যাপক রাজ্জাককে ঢাকা ইউনিভার্সিটির মধ্যে নিয়ে যেতে চাইলাম। আমরা জানতে চাইলাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হল যখন তৈরি হল তখন মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যাই বা কতো এবং হলে থাকতো বা কী পরিমাণ ছাত্র।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : সলিমুল্লাহ হলের ক্যাপাসিটি ২৯৬ জন আবাসিক ছাত্রের। সলিমুল্লাহ হলের গঠনে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। এর দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিমের কামরাগুলো ছিল তিন সিটের। গোড়াতে হলেও ৩৪৪ জন ছিল রেসিডেন্ট। এর ডবল ছিল এ্যাটাডচ, বাইরে। ইউনিভার্সিটিতে মুসলিম ছাত্র তখনো মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। ৩৫০ জন মুসলমান ছেলে, ৭০০-৭৫০ হিন্দু ছেলে। দিস কাউনিউড টিল '৪৪-৪৫। '৪৫- সালে আমি বিদেশ যাই। হিন্দু ছেলেদের ব্যাপারে দেখা যেত যে তারা অবস্থাপন্ন হলেও এ্যাটাচড থাকত। কারণ ঢাকাতে তাদের বাড়িঘরও আত্মীয়স্বজন ছিল। আর মুসলমান ছেলেরা অবস্থাপন্ন হলে রেসিডেন্ট হত। ১৯৩১ সালে মুসলিম হলের সব ছেলের মধ্যে দুজনের বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, এর বেশি নয়। এই হাইয়েস্ট অবস্থা।

আমি একটি প্রশ্ন করলাম : তবু ছাত্র যারা পড়তে আসতো তারা অবস্থাপন্ন তো ছিল। না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কেমন করে পড়তে আসত?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হ্যাঁ,অবস্থাপন্ন তবু হিন্দুদের সঙ্গে তাদের তফাৎ ছিল। মুসলমান ছাত্রদের ইকোনমিক পজিশনটা এভাবে দেখা যায় : এদের বারআনার গারজেনদের ক্যাশ ইনকাম নয়, তাদের আয় নগদ টাকার নয়। এরা সম্পূর্ণ গৃহস্থ। ধান-চাল বিক্রি করার পরে টাকা হাতে আসে। এটাই ছিল মুসলমান শিক্ষিতদের ফার্স্ট জেনারেশনের গারজেন এবং তাদের আর্থিক অবস্থা : ৯৮% ভাগেরই এই অবস্থা। এই বলে সহাস্যে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এখন অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে—তবু এখনো আপনাদের গায়ের গন্ধ শুঁকেই আমি বুঝতে পারি—আপনারা কোন জেনারেশনের : প্রথম না দ্বিতীয়: আই ক্যান অলমোস্ট স্মেল হুইচ ম্যান বিলংস টু হুইচ জেনারেশন।

কথা বলতে বলতে অধ্যাপক রাজ্জাকের কিছু সিনিয়র আতাউর রহমান খানের কথা ওঠে। রাজ্জাক সাহেব বললেন : আতাউর রহমান খানের ছাত্রাবস্থায় একটা সেলিব্রেটড্ প্রশ্ন ছিল তাঁর সহপাঠীদের কাছে : বাড়িতে দোয়াত-কলম ঢুকেছে কবে : আতাউর রহমান খান খুব স্মার্ট ছিলেন। বেশ ভালো ছাত্র ছিলেন। সাহিত্য করতেন। এখন একটু বকুনে, গ্যারুলাস হয়েছেন। আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকি তখন তাঁর তিন চার বছর বোধহয় হয়ে গেছে। আমরা জুনিয়র। আমরা খুব সমীহ করতাম। তখন একবছরের ডিফারেন্স হলেই জুনিয়ররা সিনিয়রদের সমীহ করত। মানতো খুব বেশি। একজন সিনিয়র ছাত্র ঘরে ঢুকলে তার সামনে বসে থাকা? দ্যাট ওয়াজ আনপারডনেবল। ক্ষমার অযোগ্য বেআদবি। ১৯৩৪-এর কথা মনে আছে। একবার দেয়ার ওয়াজ এ টেরিল হিউ এ্যান্ড ক্রাই। ইলেকশনের সময়। হল ইলেকশন। ইলেকশনে যারা দাঁড়িয়েছে তারা দল বেঁধে রুমে রুমে যেয়ে প্রচার করছে। ইলেকশনে তো সিনিয়ররাই দাঁড়াতো। এরকম সিনিয়রদের একদল একটা রুমে যায়। কিন্তু সে রুমের জুনিয়র রেসিডেন্ট স্টুডেন্ট হ্যাড নট স্টুড-আপ। একটি জুনিয়র ছাত্র। ছাত্রটি ভালো। আমার রুমমেট। কিন্তু সে অতদূর আদব জানতো না। সে দাঁড়াল না। ফলে আমার ওপরই সিনিয়রদের চার্জ পড়লো। 'এরকম আদবলেহাজ শূন্য ছাত্র তুমি কোত্থেকে লইয়া আইছ। সিনিয়দের সামনে দাঁড়ায় না—এধরনের ছেলে কোত্থেকে আইছে!'

আমরা বললাম : স্যার, আমরা তো আপনার ছাত্র। তবু আপনি সেই সেকাল থেকে আমাদের 'আপনি' বলে আসছেন, কখনো তুমি বলেন না, এ আদব আপনি কোত্থেকে পেলেন?

রাজ্জাক সাহেব হেসে উঠে জবাব দিলেন : 'আপনি' বলার রেওয়াজ সেই তখন থেকে। 'আপনি' 'আসসালামুআলাইকুম' এগুলো একেবারে বাঁধা ছিল। এমনকি স্কুলে, আমাদের মুসলিম হাইতে সবাই সবাইকে 'আপনি' কইত। আসলে অবাঙালিদের মধ্যে দেখবেন সেখানে বাবা তার ছেলেকে তুমি বলে না, বলে, 'আপ', আপনি।

পুরনো দিনের কথা উল্লেখ করে আবার বললেন : তখন মুসলমান ছাত্রদের যে বিষয়টা রিমার্কেবল, মানে উল্লেখ করা দরকার সে এই যে এদের বেশির ভাগ জায়গির থাকত। এবং তাদের জায়গির রাখতো ঢাকা টাউনের গরিব স্থানীয় বাসিন্দারাই। তাই ঢাকা শহরের স্থানীয় অশিক্ষিত গরিবদের কন্ট্রিবিউশন টু দি ফার্দারেন্স অব হাইয়ার এডুকেশন ইজ গ্রেট।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : ঢাকার লোকাল স্টুডেন্টস, মানে ঢাকার স্থানীয় মুসলমান ছাত্ররাও কি জায়গির থাকত?

: ঢাকার লোকাল স্টুডেন্ট ছিলই বা ক'জন? তাদের জায়গির থাকার প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন ছিল ঢাকার বাইরের ছাত্রদের। স্থানীয়দের মধ্যে অবস্থা ভালো ছিল কাদের সরদারের। কাদের সরদার ছাত্রদের জায়গির রাখতেন। হাফিজুর রহমান সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন—এঁরাও জায়গির থেকে পড়েছেন। ডাকার গরিবরাই জায়গির রাখত। কিন্তু তারা 'ছাত্র-মাস্টার ছাব'দের খুব ইজ্জত করত, খুব খাতির দেখাত। নিজেরা খেতে পাক আর না পাক, জায়গির-ছাত্রেরা সময় অনুযায়ী ঠিক রেডি থাকত। গ্রাম এলাকায় এখনো গৃহস্থ পরিবার ছাত্র জায়গির রাখে। গ্রামে যেমন গৃহস্থ খেতে যাওয়ার আগে খোঁজ করে বাইরে বাড়িতে ফকির মিসকিন কেউ আছে নাকি, তেমনি লেখাপড়া করে, থাকার জায়গা নেই, খাওয়ার জায়গা নেই এমন ছাত্রকে জায়গির রাখা গ্রামে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ এখনো কর্তব্য বলে মনে করে। ঢাকা টাউনের মুসলমানরা মুসলিম হলের ছেলেদের আলাদা সম্মান করত। শ্যামা-হক মন্ত্রিত্বের সময়ে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে মুসলিম হলের ছাত্ররা হক সাহেবের মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে যেয়ে মার খেয়েছিলো। নওয়াব হাবিবুল্লাহর কথাতেই হলের ছেলেরা মার খেয়েছিলো। কিন্তু এর ফল হবিবুল্লাহর জন্য ভালো হয় নাই। ঢাকার মহল্লার লোকদের কাছে হি লস্ট প্রেস্টিজ।

এ ঘটনার কথা আমারও মনে আছে। আমি তখনই আই. এ পড়ি। ১৯৪২ সালে।থাকি ঢাকা কলেজ হস্টেলে, এখন যেটা ফজলুল হক হল, সেখানে। হক সাহেব মুসলিম লীগের বিরুদ্ধতা করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে বেঙ্গলে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। ঢাকার নওযাব হবিবুল্লাহ সে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির মুসলিম ছাত্ররা তখন প্রধানত লীগপন্থী। তখন পাকিস্তান আন্দোলনের জোর। 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার' সদস্য হবিবুল্লাহ কোলকাতা থেকে ঢাকা আসবেন। তাকে সংবর্ধনা দেওয়া, না দেওয়া নিয়ে ঢাকা শহরে বিরোধ দেখা দিল। হলের ছাত্ররা সব তখন হক-বিরাধী। ঢাকা শহরের মহল্লার নওয়াবের প্রভাবে। ছাত্ররা গেল ফুলবাড়িয়া স্টেশনে কালো পতাকা দেখাতে। সেখানে স্থানীয় মহল্লা সরদারদের জোর। স্টেশনে তাই হলের ছাত্ররা মার খেয়েছিলো।

এর প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে যেয়ে অধ্যাপক রাজ্জাক আরো বললেন : আমি তখন মাস্টার। থাকি দেওয়ান বাজারে। তখন অনেক সরদারের সঙ্গে আমার

আলাপ ছিল। কিন্তু এই ছাত্র মারার ব্যাপারে তাদের মুখে সমর্থনসূচক কথা শুনি নাই। ঐ আলাপের মধ্যে তারা যাইতে চাইতো না। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মুসলমান ছাত্ররা পড়তেই পারত না, যদি ঢাকা শহরেরর গরিব লোকদের তারা কো-অপারেশন না পাইত।

অধ্যাপক রাজ্জাককে আমি প্রশ্ন করলাম : আহসান মঞ্জিলের সাথে শিক্ষিতদের কীরূপ সম্পর্ক ছিল?

রাজ্জাক সাহেব বললেন : ন্যাসেন্ট্ মিড্ল ক্লাসের একটা অংশ আহসান মঞ্জিলের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইট নেভার ওয়াজ এ ওয়ার্কিং রিলেশন। ঢাকায় ইউনিভার্সিটি যখন তৈরি হয়েছে তখন নওয়াব পরিবার ক্ষয়ের চরমে পৌঁছে গেছে। এদের কোনো ক্ষমতা ছিল না মুসলমান সমাজকে ইমপেটাস দিবার। এটা ত্রিশ বছর আগে হলে দে কুড হ্যাভ প্লেইড এ রোল।

এসময়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বিশেষ করে সলিমুল্লাহ হলের প্রতিষ্ঠায় ঢাকার নওয়াবদের কোনো আর্থিক বা জমির দান ছিল কি না, এ প্রশ্ন আবার উঠেছিলো। রাজ্জাক সাহেব জোরের সঙ্গে বললেন, ইউনিভার্সিটির কোনো প্রতিষ্ঠানে ঢাকার নওয়াব পরিবারের কোনো দান ছিল না।

অধ্যাপক রাজ্জাক এ প্রসঙ্গে বললেন : ১৮৬৫ সালের ইন্ডিয়া ডাইরেক্টরিতে জমিদার ও ব্যবসায়ীদের নাম দেখা যায়। তখন ডাইরেক্টরিতে এই দুটো শ্রেণীর নাম থাকতো। কিন্তু এই ডাইরেক্টরিতে নওয়াব পরিবারের যা নাম পাওয়া যায় তা জমিদার হিসেবে নয়, ব্যবসায়ী হিসেবে।

ফজলে রাব্বি প্রশ্ন করলেন : কীসের ব্যবসায়ী?

: নানা জিনিসের ব্যবসায়ী। 'লিভস ফ্রম ঢাকা' বলে একটা ডায়রিতে এদের কিছু কথা পাওয়া যায়।

জমিদারি প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : শুধু ঢাকায় না, ঢাকা জেলাতেই খুব কম জমিদার ছিল। বেঙ্গলের যারা বড় বড় জমিদার তারা কেউ ঢাকা জেলার নয়। কারণ মোগল আমলের জমিদারি এ্যারাইজ করত, যেখানে মোগল গভর্নর, সুবেদার এরা সরাসরি শাসন করতে পারত না সেখানে। ঢাকা তো রাজধানী ছিল। কাজেই ঢাকা বা ঢাকার কাছাকাছি 'জমিদার' সৃষ্টি হওয়ার অবস্থা ছিল না। রাজশাহী, ময়মনসিংহ এমনকি বাখরগঞ্জে জমিদার ছিল। কিন্তু ঢাকায় নয়।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাজ্জাক ইতিহাসে আরো পিছয়ে যেয়ে বললেন : জমিদার বলতে এই যে আমরা বুঝি, জমির মালিক, এটা ইংরেজের ব্যাপার—১৭৯৩-এর ব্যাপার। এর আগে এরকম জমিদারি ব্যাপার ছিল না। বাংলাদেশ মোগল হেজিমোনিতে ঢুকলো সপ্তদশ শতকে। এর আগে নয়। ১৫৯০-এর জাহাঙ্গীর বাংলাদেশ দখল করে। এর আগে বাংলাদেশ মোগল শাসনব্যবস্থার বাইরে ছিল। কাজেই ১৫৯০ অর্থাৎ ষোল শতকের শেষে মোগলদের বাংলা জয়। আবার ১৭০৭-এর আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটে। কাজেই

বাংলাদেশ মোগল রাজত্ব শতখানেক বছরের ব্যাপার। এর বেশি নয়। এরপরেই মোগল রাজ্যে মারাঠাদের অনুপ্রবেশ এবং উপদ্রব শুরু হয়। সাথে সাথে বিভিন্ন জায়গায় মোগল সুবেদারগণ নিজেদের স্বাধীন বলতে শুরু করলো : মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র এই দেখা যায় : অযোধ্যায় সুজাউদ্দৌলা, দাক্ষিণাত্যে নিজামুল মুলক, বাংলাদেশে মুর্শিদ কুলী খাঁ। দিস ওয়াজ এ পিরিয়ড অব আনসেট্‌লমেন্ট অস্থিরতার সময়।

ফজলে রাব্বি প্রশ্ন করেছিলেন : রাজশাহীর নাটোরের জমিদার, এরা কীভাবে হয়েছিলেন।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ঐ যে বললাম, দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উইকেন্ড। এরা সব স্বাধীন অস্তিত্ব বোধ করতে লাগল। দিনাজপুরের রাজা, নাটোরের রাজা এর সব এভাবেই নিজেদের শক্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছে। এ্যাজ ডিসটারবেন্সেস বিগ্যান টু মাল্টিপ্লাই দি পিপল বিগ্যান টু ফিল এ লিটল মোর পাওয়ারফুল দ্যান সে ওয়েয়ার। কিন্তু ১৭৯৩-তে যে জমিদারি তৈরি করা হল উইথ প্রপ্রাইটরি রাইট ওভার এণ্টায়ার এরিয়া, জমির মালিক হিসেবে জমিদার-এর কোনো সাদৃশ্য পূর্বের ব্যবস্থার সঙ্গে ছিল না।

এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক রাজ্জাক 'ফতওয়া-এ-আলমগীর'-এর উল্লেখ করলেন। বললেন, সেদিন একটি ছেলে এসেছিল, আবু ইউসুফের 'খারাজ'-এর ওপর কাজ করতে চাইলো। আমি বললাম, এম. ফিল. করতে চাও 'ফতওয়া-এ-আলমগীর'-এর জমির সেকশনটির ওপর কাজ কর : ইউ উইল গেট সাম আইডিয়া, প্রপার্টি করতে এই দেশে কি আছিলো?

আমি বললাম : 'ফতওয়া'-এ-আলমগীর'-এর কি কোনো ইংরেজি অনুবাদ নেই?

রাজ্জাক সাহেব বললেন : না কোনো ইংরেজি অনুবাদ নাই। সেইজন্যই তো আমি এত জোর করছি যে এটার ওপর আপনারা কাজ করেন। প্রথমে এর আরবি অনুবাদ হয়েছিল। তারপর আওরঙ্গজেবের এক মেয়ে এটার ফার্সি করায়। ইসলামিক দুনিয়ায় এটারই স্বীকৃতি।

এই দিনের আলোচনা এখানেই শেষ হয়েছিল।

স্যার, আমি আপনার ছাত্র

২০-৭-৭৬

শিক্ষকের কী পুরস্কার? শিক্ষক যা ছিলেন তাই থাকেন। যেখানে ছিলেন সেখানে থাকেন। তাঁর ছাত্ররা তাঁকে ছাড়িয়ে যায়। তারা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। তারপর জীবনের সড়কে অতর্কিতে আপাতভাবে অপরিচিত কোনো বয়স্ক কিংবা যুবক, কোনো মানী কিংবা গুণী শিক্ষকের সামনে এসে নতমস্তকে দাঁড়ায় আর ডাক দেয় স্যার সম্বোধনে এবং বলে আপনি আমায় চিনতে পারলেন না স্যার? আমি

আপনার ছাত্র ছিলাম, তখন শিক্ষক পুরষ্কৃত বোধ করেন, নিজেকে ধন্য মনে করেন।

এ তারিখে রাজ্জাক সাহেবের কাছে বেয়ে বসতে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের যে আলাপ উঠেছিলো তা নয়। রাজ্জাক সাহেব নিজেই তার শিক্ষকতার পুরনো দিনের কথা মনে করছিলেন। নিজের শিক্ষকতার কথা উঠলেই তিনি বলেন : আমি ছেলেদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা কোনোদিন আমাকে বিব্রত করে নি, কোনোদিন তাদের স্বভাবসুলভ দুষ্টামি দ্বারা আমাকে Tease করে নি। This remember with infinite gratiude. তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আজকে একটি ঘটনার কথা বললেন।

: ১৯৫১ সালের দিকে কোলকাতায় গেছি। আলীপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাই আসি। একদিন ফিরে আসছি। হঠাৎ রাস্তায় এক ব্যক্তি এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম : স্যার, আমাকে চিনলেন না? আমি তো বিমূঢ়, নির্বাক। আমাকে আর কিছু বলতে না দিয়েই তিনি বললেন : স্যার, আমি কানাই ... তারপরে যে পরিচয় দিলেন তাতে দেখা গেল, ঐ যে বিখ্যাত বইয়ের দোকান 'ফার্মা কে. এল. মুখার্জী, উনি তারই মালিক কানাই লাল মুখার্জী। ... এবার যখন বাংলাদেশ হওয়ার পরে '৭৪ সালে আবার গেলাম কোলকাতায় তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হল। গেলাম তাঁর দোকান। তাঁকে দেখলাম না। দেখলাম একজন কর্মচারী বসে আছেন? আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের এই কে. এল মুখার্জী ইনি কি ইস্ট বেঙ্গলের? আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন : 'হ্যাঁ মশাই, বাঙাল-টাঙালই হবে বোধহয়। আমি আর বেশি আলাপ জমাতে পারলাম না। আমি যে বাসায় থাকি তার টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে বললাম, ওঁকে আমার এই নম্বরটা দিবেন। দিনের বেলা আর কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। হঠাৎ রাত সাড়ে দশটা এগারটায় আমার টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোনের ওপার থেকে সেই কানাই বলছেন : স্যার, এই ঘটিগুলোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে? আপনার টেলিফোনের নম্বরটা এইমাত্র আমাকে দিয়েছে ...।

আর একবারের আর এক ঘটনা বললেন।

'৫৯ এও দিল্লি থেকে ফেরার পথে কোলকাতায় আটকা পড়ে যাই। আমার কাগজপত্রে কি গণ্ডগোল। সেই গণ্ডগোল মেটাতে বাচ্চু মিয়া (আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ) আমাকে ওখানকার টেস্ট ব্যাঙ্কে নিয়ে গেলেন। বসে আছি। কিছুটা অসহায় বোধ করছি। চিনি না কাউকে হঠাৎ এক অফিসার এসে বললেন : স্যার, আমাকে চিনলেন না? স্যার, আপনার কাছে পড়েছি। তারপর বললেন : আপনি বসুন। আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে লোক পাঠিয়ে আপনার কাগজপত্র সব ঠিক করিয়ে দিচ্ছি।

তারপর অধ্যাপক রাজ্জাক ঢাকার পুরনো লোকদের কথা বললেন, ঢাকায় যারা একসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করেছেন, আজ হয়ত ভারতের বিভিন্ন

স্থানে ছড়িয়ে আছেন। বললেন : এদের বলা যায়, ঢাকাইয়া। এদের দুজন কোনো জায়গায় যদি একত্র হল তা তারা আর সবকিছু মুহূর্তে ভুলে যায়। তখন ঢাকাই বিশ্ব হয়ে দাঁড়ায়। তখন তাদের একমাত্র আলাপ : 'আহা সেই যে ঢাকায় ছিলাম, কী সুন্দর জায়গা, কতো আলো বাতাস"। ঢাকার স্মৃতি তাদের মনের পটে চির উজ্জ্বল। এবার মানে '৭৪ সালে ওখানে বি.এম. গাঙ্গুলিকে পেলাম। আমাদের শিক্ষক। ১৯৩২-৩৩-এ ইকনমিকস পড়াতেন। পরে কোন ইউনিভার্সিটি ভি.সি. হয়েছিলেন। ইন্ডিয়াতে। দেখা হওয়া মাত্র জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন, ঢাকার কোন রাস্তা কেমন আছে! সেই যে তিনি মেডিকেলের ওপাশে বকশীবাজারের মোড়ে মন্দিরওয়ালা বাড়িটাতে ছিলেন সেটার এখন অবস্থা কী? অক্ষয় ঘোষাল, বি.এম. গাঙ্গুলি, অমিয় দাশগুপ্ত—এঁরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিরই প্রথম দিকের ছাত্র। অমিয় দাশ গুপ্ত দ্বিতীয় ব্যাচের, '২৪ সালের। ইকনমিকস এর। এখন তিনি ইন্ডিয়াতে নেহরু ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক। অনার্স এবং এম.এ. দুটোতেই উনি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন।

অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্তের কথা রাজ্জাক সাহেব আরো বললেন।

অমিয় দাশগুপ্ত এম.এ. পরীক্ষ দিয়েছেন। রেজাল্ট এখনো বেরোয় নি। এমন সময়ে ডিপার্টমেন্টে লেকচারার নেবার কথা উঠলো। ডিপার্টমেন্টের হেড তখন জে.সি. সিংহ। তিনি রিকমেন্ড করলেন। কোলকাতার এক লোককে। কিন্তু ভি.সি. হারটগ হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি বললেন : বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে ডিপার্টমেন্টের। ডিপার্টমেন্ট থেকে ছাত্র বেরিয়েছে। তাহলে তাদের কেন নেওয়া হবে না। অমিয় বাবুর কথা উঠলো। হারটগ বললেন, If he gets firstclass in his M. A. will be appointed. এভাবে অমিয় বাবু লেকচারার হলেন। তখন অনার্স এম.এ. দুটোতেই ফার্স্ট ক্লাস না হলে মাস্টার হওয়ার কথা তো চিন্তা করা যাইতো না। অমিয় দাশগুপ্ত দ্বিতীয় ব্যাচের। এর আগে হাফিজুর রহমান অনার্স-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে চলে যান।

আমি প্রশ্ন করলাম : অমিয় বাবু কি সিনিয়র লেকচারার হিসেবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আদৌ না লেকচারার ক্লাস টু মাইনে মাসিক ১২৫ থেকে ২০০ টাকা। এভাবে তিনি ১৯২৪ থেকে ১০৪০ সাল পর্যন্ত রইলেন। এর মধ্যে পি.এইচ.ডি করলেন কিন্তু ক্লাস ওয়ান হলেন না। ক্লাস ওয়ান-এর মাইনে ছিল ২৫০-৪০০ টাকা। ১৯৪০ কিংবা ১৯৪১ সালে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট তাঁকে Advisor to Ministry of Agriculture করে একবার নিয়েও গেছিল, ৯৫০ টাকা মায়নাতে। কিন্তু অমিয় বাবু সেখানে যেয়ে থাকলেন না। সে চাকরি ছেড়ে আবার ডিপার্টমেন্টে ফিরে এলেন সেই লেকচারার পোস্টে। অবশ্য বোধহয় '৪১ সালের শেষের দিকে তাঁকে ক্লাস ওয়ান করা হয়েছিল, ১৬ বছর পরে।

অধ্যাপক রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপে আমার সাথে ছিলেন ফজলে রাব্বি। অমিয় বাবুর এ কাহিনীতে তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন : আশ্চর্য তো! সাড়ে নয়শো টাকার চাকরিতে থাকলেন না। ফিরে এলেন চারশ' টাকার মাস্টারিতে।

অধ্যাপক রাজ্জাক সশ্রদ্ধভাবে বললেন : তাই। অমিয় বাবুর তা সইলো না। ফিরে এসে বললেন, ওসব চাকরি আমার পোষায় না। দশটা পাঁচটা করা আমার দ্বারা হবে না। তার মিনিস্ট্রির হেড জাঁদরেল আইসিএস এসে বললো : দাশগুপ্ত, what are you doing! কিন্তু অমিয় বাবু তবু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফিরে এলেন। অমিয় বাবুর মতো আরো যারা ছিলেন ক্লাস টু কিংবা ক্লাস ওয়ান লেকচারার তারা সবাই দেশ বিভাগের পরে যখন ঢাকা ছেড়ে যান তখন তাঁরা অনায়াসে প্রফেসর হয়েই গেছেন। অনেকেই ইচ্ছা করলে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে বাইরে যেতে পারতেন। কিন্তু যান নাই।

ফজলে রাব্বি ব্যাখ্যা হিসেবে বললেন : স্যার, তখন চারশ' টাকায় চলত।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : চলার ব্যাপার নয়। বাইরে অন্য চাকরির আকর্ষণ তো কম ছিল না। তখন আমাদের ক্লাস টু মাস্টারের সর্বোচ্চ মাইনে ২০০ টাকা। আর তখন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পেত সাত আটশ! এরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারতেন। কিন্তু সেই প্রপেনসিটিটা ছিল না। তখনকার হিন্দু শিক্ষকদের এই বৈশিষ্ট্য ছিল। মুসলমান ছাত্ররা সরকারি চাকরি পেলে চলে যেত।

আমি বললাম : আপনাকেই আমরা ব্যতিক্রম হিসেবে দেখছি। আপনি সেই '৩৬-'৩৭ সাল থেকে তো শিক্ষক হিসেবেই রইলেন।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এটা আমি একটু সচেতনভাবেই করেছি। প্রথমবার যখন এম.এ. পরীক্ষা দিই তখন ভাইভার আগে বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ভাইভা দেব কি না। আগে ভাইভা না দিলে ডিগ্রি দিত না। আমি বললাম বাবাকে, যদি ভাইভা দিতে কন, দিতে পারি। একটা সেকেন্ড ক্লাস পাব। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সামনের বছর ভাইভা দিলে ফার্স্ট ক্লাস পাইতে পারি। আর তারপর ইউনিভার্সিটিতে চাকরি পাইলে ২০০ টাকার বেশি মায়না হইব না। সংসারে এর বেশি তাহলে তো আমি সাহায্য করতে পারুম না। এখন আপনি যা বলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাবা কী বললেন?

বাবা বললেন? আমি তো সারা জীবন পুলিশী চাকরি করলাম। তুমি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট না হইতে চাইলে, It will not break my heart তুমি যদি মাস্টারিতে যাইতে যাও, আমার দিক থেকে আপত্তি নাই। তবু আমি বাবাকে আবার বললাম, আমার দিক থেকে পারিবারিক সাহায্যের পরিমাণ তাহলে বেশি কিছু হবে না, এটাও পরিষ্কার থাকা ভালো।

আমি বললাম, এ কারণেই সেবার ভাইভা দিলেন না?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এরপরের বার ভাইভা দিই।

সঙ্গী ফজলে রাব্বি আলাপে বেশ আমোদ পাচ্ছিলেন। অধ্যাপক রাজ্জাককে একটু প্রভোক করার জন্য বললেন, স্যার আপকি নাকি বক্তৃতা দিতে পারতেন না।

: একেবারেই না।

: তাহলে মাস্টার হওয়ার চিন্তা করলেন কোন সাহসে।

অধ্যাপক রাজ্জাক স্মিতমুখে স্বীকার করলেন : এই সাহস করাটা ঠিক হয় নাই। আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এইটাইতো ডিফারেন্স। আজকালকার এরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে। কিন্তু আমার কোনো ধারণাই ছিল না, কোন পৃথিবীতে আমি প্রবেশ করতে যাচ্ছি এই পাস করার পরে। এক বছরে আগে ভেবেছি, মাস্টার হইতে পারলে খুব খুশি হইমু। কিন্তু মুখে কারুর কাছে মনের এই ইচ্ছার কথা কমু, এটা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এখন তো ছেলেমেয়েরা কত আগ থেকে চিন্তা করে, ভবিষ্যতে তারা কে কী হবে। তার জন্য নিজেকে তৈরি করে। ... আমাদের সঙ্গে এক ছেলে তার ভবিষ্যৎ ইচ্ছার কথা বন্ধুদের কাছে ব্যক্ত করেছিল। আর তা নিয়ে চারটা বছরই অন্যরা তাকে ঠাট্টা করতো। তবে ভবিষ্যৎ নিয়া চিন্তা না করাটা আমাদের কোন গুণের ব্যাপার ছিল না : It was very unrealistic attitude to ward life, to put it very mildly.

এ কদিনের আলাপে অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদেরকে বেশ একটু গুরুত্বের সঙ্গে নিতে আরম্ভ করলেন। আমরাও তাই তাঁকে খুলেই বললাম : স্যার, আমাদের এই রোজ গল্প করার একটি উদ্দেশ্যে আছে। আপনাকে দিয়ে কিছু তো আর লেখাতে পারব না। তবু আপনার কাছ থেকে শুনে শুনে সেই সেকালের জীবনকে আমরা কিছু ধরে রাখতে চাই।

একথা বলাতে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : পরিশ্রম করতে চান করবার পারেন। দেখেন, যা দাঁড়ায় তা লিখে বা টাইপ করে দিতে পারেন কি না। দিলে আমি একটু দেখে দিতে পারব।

তারপরে বললেন : আমার নিজের লেখার ব্যাপার নয়। তবে এই আত্মজীবনী নিয়া আমি কয়েকজনকেই কইছি।

আমরা ব্যাপারটিকে আগ্রহ বোধ করলাম : কাদের কথা বলছেন স্যার?

: মৌলবী তমিজউদ্দিনকে বলেছিলাম। শেষবার উনি যখন ইলেকশন করলেন তখনকার কথা বলছি। তখন তিনি থাকেন নুরুল হুদার বাড়িতে। তিনি অবশ্য বয়সে আমার মুরুব্বি। তবে একধরনের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমার কিউরিয়াস ধরনের খাতির ছিল। কেমন করে এঁদের সঙ্গে এতটা সম্পর্ক হইল তা আমি বলতে পারিনা। খুব সম্ভব তাদের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে। তমিজউদ্দিন সাহেবের তিন মেয়ে। এদের কনিষ্ঠা হল রাজু : রাজিয়া খান, এখন ইউনিভার্সিটির ইংরেজির মাস্টার। কিন্তু তখন রাজিয়ার বড় বোন, ভগ্নীপতি, বাবা কিংবা শ্বশুর কারুর কথা শুনতো না। অথচ এদের কেমন করে ধারণা হয়েছিল

রাজিয়া আমার কথা শুনে। নুরুল আমিন সাহেবের ছেলের সঙ্গে তখন রাজিয়ার বিয়ে হয়েছে। নুরুল আমিন সাহেব তো রাশভারী মানুষ। কিন্তু একদিন আমাকে বললেন : ভাই আপনাকে একটা কথা বলতাম।

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম, কী কথা!

এই আমার বউমার কথা। শুনি ওর বাপ বলে, আমার ছেলেও বলে, আপনার কথাই নাকি ও একটু আধটু শুনে। আপনিই একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখেন না, একটা সিরয়াস কাজ কিছু করাতে পারেন কি না।

নূরুল আমিন সাহেব যে এইরকম আমাকে অনুরোধ করবেন, এমন আমি ভাবতে পারি নাই।

তমিজউদ্দিন সাহেব একদিন একথা বললেন। বললেন, 'পাকিস্তান অবজারভার'-এ কি করে না করে বুঝি না। ওকে দেখুন না ইউনিভার্সিটিতে একটা মাস্টারি দিতে পারেন কি না। আমাদের কথা তো একেবারেই শুনে না।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাজ্জাক রাজিয়া খান কেমন করে ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগে যোগ দিলেন তার কথা বললেন। এটা অধ্যাপক রাজ্জাকের চরিত্রের একটি দিক। কোন ছাত্রছাত্রীকে তার ভাল লাগলে তাঁকে ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারিতে টেনে আনার অদম্য আগ্রহ। এ কাজ গায়ে পড়ে এগিয়ে গিয়ে তদ্বির-অদারক যাই দরকার হোক না কেন, তা করতে তার কোনো সঙ্কোচ বা দ্বিধা হয়না। এ কারণে রাজিয়া খানের কাহিনীটা শুনতেও আমার আগ্রহ হচ্ছিল।

অধ্যাপক রাজ্জাক বরলেন : রাজিয়া তখন বিলেত থেকে ফিরে এসেছে। অনার্সে ওর ফার্স্ট ক্লাস আছে। তারপরে বার্মিংহাম থেকে আর একটা ডিগ্রি এনেছে। তবু সাজ্জাদ হোসেন ওর ওপর ভয়ানক খাপ্পা। She had somehow succeedd in offending him। সাজ্জাদকে আমি অবশ্য স্নেহ করতাম। তবে কতকগুলো ব্যাপার আছিল যেখানে তাকে কথা শোনানো যাইত না। যাইহোক, আমি রাজিয়াকে বললাম, তুমি একটা দরখাস্ত করো। এই দেখ আমার কাছে দরখাস্তের ফর্ম আছে, এগুলো পূরণ কইরা দাও। আমার কথাতে সে তো প্রথমে খেপে গেল। না আমি মাস্টারি-টাস্টারি করুম না। আমি দেখলাম সহজে শোনানো যাবে না। তখন বললাম, ঠিক আছে। পূরণ করা লাগবে না। ফর্মটা বাড়িতে নিয়ে যাও। কাল সই করার জায়গায় সই কইরা দিও। তারপরে বাকিগুলো না হয় আমিই করমু। যাই হোক, দেখা গেল তার পরদিন ফর্মটা পূরণ করেই রাজিয়া আমাকে দিয়ে গেল।

তমিজউদ্দিন সাহেবের কথা বলতে গিয়েই রাজিয়া খানের কথা উঠেছিলো। এবারে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এই সময়েই তমিজউদ্দিন সাহেব আত্মজীবনীমূলক একটা কিছু লিখছিলেন, ইংরেজিতে একদিন আমাকে ডেকে বললেন : আপনি একটু দেখে দেন। আমি একটু দেইখ্যা বললাম, ইংরেজিতে লিখবেন না। আর নিজের মেমোরি যতই বলুক না কেন, মেমোরির ওপর নির্ভর

করবেন না। আপনি ১৯২০ সাল থেকে তো পাবলিক লাইফে আছেন। Mitra's Annual Register আছে। আমি লাইব্রেরি থেকে দুটো ভল্যুম আপনাকে এনে দেব। ঐ সময়কার কিছু স্মরণ করলে একটু রেকর্ড চেক করে নিবেন। প্রথমে আমার কথায় তো খুব আপত্তি। 'না, অমিল হবে কেন, যা আমার চোখের সামনে ভাসছে ... ইত্যাদি। কিন্তু দিন দশেক পরে যখন দেখা তখন প্রথমেই বললেন : ভাই আশ্চর্য ব্যাপার। আপনার কথাই ঠিক। যেগুলো কিরাকসম কেটে বলতে পারতাম যে এগুলো এইভাবে ঘটেছে, কাগজেপত্রে এখন দেখি যে না ব্যাপারটা সে রকম ছিল না।

অধ্যাপক রাজ্জাক বলতে লাগলেন। আমি তাকে তখন বললাম, খুব সিসটেমেটিক্যালি লিখতে যাবেন না।বাল্য থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত 'ইয়ার বাই ইয়ার'—তা হবে না। যে ঘটনা মানে খুব দাগ কেটেছে, এখনো মনে আছে সেটাকেই লিখুন। লিখে রেখে দিন। অন্য ঘটনা মনে হলে তাও লিখুন। তারপরে সবগুলো মিলিয়ে দেখুন কোনো 'ক্রোনোলজি' বা সময়ক্রম বার করা যায় কি না। তবে Chronological order টা indispensable না। সেটা অপরিহার্য কিছু না। এই সময়েই আয়ুব খান আবার ইলেকশান দেয়, আর তমিজউদ্দিন সাহেবও ইলেকশান করেন, এ্যাসেম্বলির আবার স্পীকারও হন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : কিন্তুতার সেই আত্মজীবনীর খসড়া কোথায়?

: আমার কাছে কয়েকদিন ছিল, যা লিখেছিলেন। তারপরে কতদূর কি করেছিলেন জানি না। কিন্তু সে লেখার প্রব্লেম হল, যা লিখেছেন তা বাংলায় লিখেন নাই, ইংরেজিতে লিখেছেন। দ্বিতীয়ত আমার কাছে খুব ভালো লাগে নাই। তবু It is worthlooking into : এটা হয়ত মিসেস হুদার কাছে এখন আছে। ওঁরা বলেছিলেন যে, They will do something.

এই প্রসঙ্গে ফজলে রাব্বি বললেন : রাজিয়া খান সম্প্রতি 'প্রতিক্রিয়া নামে একখানা বই লিখেছেন, তাতে তাঁর বাবার জীবনীর আভাস আছে বলে মনে হয়।

তারপরে অধ্যাপক রাজ্জাক সোহরাওয়ার্দীসাহেবের 'আত্মজীবনীর' উল্লেখ করলেন। এ উল্লেখে আমরা রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলাম। একথা বলতে গিয়ে বললেন, '৬৭-'৬৮ সালে বিলেতে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ছেলে রাশেদ এবং তার নাতনী মানে মিসেস সোলেমানের মেয়ে আমাকে এর আভাস দেয়। এই পরিবারের সঙ্গেও আমার বেশ পরিচয় ছিল। ওরা বললো যে শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটা autobiographical sketch রেখে গেছেন। আমি এটা দেখে যেন বলি এর কী করা যায়। এটা পাবলিশ করা যায় কি না। ওদের একথা শুনে আমি বললাম : দেখ, আমি এটা পইড়া দেখতে পারি। কিন্তু যদি আমি মনে করি যে পাবলিশ করার যোগ্য না তাহলে আমি তোমাদের মন রাইখ্যা কথা কইতে পারুম না। আর মতামতের কারণেরও কথাও তোমরা জিজ্ঞেস করবা না। I shall be quite serious : আমার যতদূর সাধ্যে কুলায় আমি দেখব। তবে তোমরা কেউ

ছেলে, কেউ নাতনী। তোমাদের সঙ্গে তাঁর জীবন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইনে। আমি তাদের একথা বললাম, কারণ শহীদ সাহেব সম্পর্কে আমার বেশ কিছু রিজারভেশন আছে। ওরা আমার কথাতে রাজি হয়ে লেখাটা আমাকে দেখতে দিয়েছিল। তার পরিমাণ অবশ্য বেশি নয় : ৭০-৮০ পৃষ্ঠার মতো।

আমি বললাম : পরিমাণ যাই হোক, স্যার এত আমাদের কাছে নতুন খবর। শহীদ সাহেব যে আত্মজীবনীমূলক আদৌ কিছু লিখেছেন, এত আমরা কেউই জানতাম না।

অধ্যাপক রাজ্জাক তারপরে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর লেখা আত্মজীবনীর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন : আমার নিজের ধারণা Is was a long political plea to ayub khan, why political government should be restored and he should be given leadership of it. তবে এটা আত্মজীবনীর ফর্মেই তিনি লিখেছিলেন। এর মধ্যে কিছু Reference আছে '৪৬-৪৭ এর ঘটনার। কিছু uncharitable মন্তব্য আছে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে যা প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। লেখাটির উদ্দেশ্যে ছিল তখনকার রাজনীতি পরিস্থিতি কী এবং তাতে করণীয় কি একথা বলা। আমি রাশেদ এবং নাতনীকে বললাম : দেখ, if published, this will not add to his reputation. ওরাও তাই এ নিয়ে কিছু করে নাই।

আমরা প্রশ্ন করলাম : কোথাও কি এটা ব্যবহৃত হয়েছে?

: না, আমি কোথাও দেখি নাই।

: কোথায় আছে জিনিসটা?

: আছে ছেলে রাশেদ কিংবা মিসেস সোলেমানের মেয়ের কাছে। শুনেছিলাম মিসেস একরামুল্লাহ, মানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বোন, এটা পাবলিশ করতে চেয়েছিলো। মিসেস একরামুল্লাহ্‌র এসব ব্যাপারে খুব যে বিবেচনা আছে এমন আমি মনে করিনে। তার মেয়ে সালমা আমাকে একথা বলাতে আমি বলেছিলাম : তোমার মা তো বুঝে না, এতে তার ভাইয়ের গৌরব কিছু বাড়বে না। ...

ফজলুল রহমানের নির্বাচন

২৪.০৭.৭৬

আজকের আলোচনার গোড়ার দিকে '৩৭-৩৮ সালের নির্বাচনের কথা উঠেছিলো। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন কোন পক্ষে ছিলেন বা না ছিলেন। আমরা ইতিহাসে সেই দিকটাতে যেতে চাইলাম না। তবে অধ্যাপক রাজ্জাক যখন বললেন : নির্বাচনের অভিজ্ঞতা আমারও কিছু হয়েছিলো তখন আমরা উল্লেখটিতে আগ্রহবোধ করলাম।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমার ইলেকশনের এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিলো ইউনিভার্সিটিতে ফজলুর রহমান সাহেবের ইলেকশন নিয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : ফজলুর রহমান সাহেব বেঙ্গল অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়েছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হ্যাঁ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি 'কনস্টিটিউয়েন্সি ইউনিভার্সিটি নির্বাচন কেন্দ্র' থেকে, '৩৭ সালে।

: আপনি তাঁর পক্ষে কাজ করেছিলেন?

: 'হ্যাঁ, কিছু করেছিলাম। ইউনিভার্সিটির রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের ব্যালট। ব্যালট ডাকে দিতে হবে। এখন, কোনো ভোটার কী আগ্রহে তার ব্যালট নিতে ঠিকমতো ডাকে পাঠাবে তার নিশ্চয়তা কি? ক্যানডিডেটকেই এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাতে হয়। আমি ফজলুল রহমান সাহেবের পক্ষে চাঁদপুর সাব-ডিভিশন থেকে অর্থাৎ ওখানে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট যারা ছিল তাদের কাছ থেকে ব্যালট কালেক্ট করে আনতে গেছিলাম। সে অভিজ্ঞতার কথা আমার এখনও মনে আছে।

সে এক অদ্ভুত 'এক্সপেরিয়েন্স'। চাঁদপুরে রূপসা নামক এক জায়গা। সেখানে ২-৩ টা ব্যালট আছে। ফজলুল রহমান সাহেবের তো পয়সা-টাকা তেমন ছিল না। সবাই ছিল তার ভলান্টারি ওয়ার্কার। নানাজনে তাকে সাহায্য করেছিল। আমি তখন শিক্ষক হইছি। সঙ্কোচের জন্য ফজলুল রহমান সাহেব আমাকে কিছু কইতে পারছিলেন না। একদিন সমস্যার কথা কইতেছেন, এই ভোটগুলো কেমন কইরা আনা যাইবো, কে আনবো ইত্যাদি। তখন আমিই ভলান্টিয়ার করলাম। বললাম : আমি আইন্যা দিনু। আমার কথাতে ফজলুল রহমান সাহেব ওয়াজ ভেরি হ্যাপি। আপনি যাবেন অত দূরে? আমি বললাম, 'আপনার না হয় কিছু খেদমত কইরা দিলাম।'

ফজলে রাব্বি বললেন : স্যার, আপনি তখন শিক্ষক হয়ে গেছেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : "হ্যাঁ, মাস্টারি লইছি—এই কয়েক মাস হয়ত তখন হইবো। যাহোক আমি চাঁদপুর রওনা দিলাম। আচকান—পায়জামা পোশাক। পুরনো ওভারকোটও একটা পায়ে আছে। বোধহয় শীতের সময় আছিলো। স্টিমারে গেলাম চাঁদপুর। চাঁদপুরে ফজলুর রহমান সাহেবের এক পরিচিত লোক ছিলেন, পুলিশের লোক। ফজলুর রহমান সাহেব বোধহয় খবর পাঠাইছিলেন। দেখি যে, তিনি স্টেশনে এসেছেন। তিনি স্টিমার থেকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন রাত্রের জন্য। শুনলাম রূপসা এখান থেকে ৮-৯ মাইল দূরে। যাওয়ার কোনো কম্যুনিকেশন নাই। 'যাইতে হইব হাইট্যা। 'আমি বললাম, 'ঠিক আছে কাইল সকালে যাওয়া যাইবো।' পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ক্যামনে যাইবেন। আমি বললাম, 'হাইট্যা যামু।' আমি তখন বেশ হাঁটতে পারি। উনি তো প্রথমে বিশ্বাস করেননা। উনি বললেন : যাবেন, আসবেন, এতে কুড়ি মাইলের কম হবে না। আমি বললাম—রাত্রে ওখানে থাকবো না। যাইয়া, আবার ফির‍্যা আসুম। ... পরদিন ভোরে আচকান-পায়জামা পরিহিত আমি চললাম। রূপসা যাওয়ার রাস্তা একটাই। রূপসা একটা হাট কিংবা বাজার।

ওখানে আছেন এক সাব-রেজিস্ট্রার। তার একটা ব্যালট। আর তিনি চারপাশ থেকে আরো ২-৩ টা সপ্তাহ করে রাখবেন। এই ৩টা ব্যালট আমি নিয়ে আসবো। সকালে রওনা দিলাম। জারনিটায় আমার বেশ মজা লাগছিল। এখনো মনে আছে। ২৫ গজও যাইতে পারতাম না, লোকে ডাক দিয়া থামাইতো। রাস্তার দুই পাশে মাঠে লোক কাজ করছে। তারা ঐ মাঠ থেকেই ডাক দেয় : কোথায় যাইতেছি? নাম কী? কী উদ্দেশ্যে যাইতেছি? খেত থেকে ডাক দিয়ে রাস্তায় থামায়। তারপরে কাছে এসে এইসব বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করে। আমার তো মহাবিব্রত অবস্থা। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নাই। এখনো মনে আছে, টুপির মতো কিছু একটা আছে। সারাটা পথ এমনি।

আমাদের বেশ মজা লাগছিলো চল্লিশ বছর আগেকার কোনো ঘটনার কথা বলছেন।

: এগারোটা, সাড়ে এগারোটার সময় যেয়ে হাজির হলাম। হাঁটতে পারতাম ভালো। ঐ একটা জিনিসই পারতাম ইন দি লাইন অব ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। পৌঁছে দেখলাম সাব-রেজিস্টার সাহেব জানেন যে কেউ একজন তাঁর কাছে বেয়ে তাঁর ব্যালট নিয়ে আসবে। তাছাড়া তিনি চিনলেও আমাকে। ইউনিভার্সিটির পাসকরা ছাত্র। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বললেন, রাত্রে থাকতে হবে। আমি তাতে রাজি হলাম না। হাট বসেছিলো। হাট আর তেমন দেখা হল না। আড়াইটা-তিনটার দিকে আবার রওনা দিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে চাঁদপুরের সেই পুলিশ অফিসার মোহাম্মদ আলী সাহেবের বাসায় এসে উঠলাম। তিনি তো দেখে অবাক। তাই স্টিল রিমেম্বার দি সারপ্রাইজ। তিনি মনেই করেন নাই আমি যে ঐদিন আমি ফির‍্যা আসমু। তার পরদিন আবার স্টিমারে ফিরলাম। স্টিমারের খাওয়া-দাওয়াটা তখন ভালোই ছিল। তাও মনে আছে।

ফজলে রাব্বি জিজ্ঞেস করলেন : যে সাব-রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়েছিলেন তিনি কি এম. এ. পাস?

: বোধহয় এম. এ.পাস। এম.এ. পাস সাব-রেজিস্ট্রার তখন ছিল, কারণ তখন চাকরি পাওয়া বড় কঠিন ছিল। ১২৫ টাকার চাকরি পাওয়া সোজা ছিল না।

আমার নিজের বড় ভাই সাহেবও ১৯২৯-৩০ এর দিকে সাব-রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন। সেকথা মনে করে আমি বললাম : একথা ঠিক স্যার। আমার বড় ভাইও সাব-রেজিস্ট্রার হন এম.এ. পড়তে পড়তে। এম.এ. শেষ করেন নি।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : তখন তো মন্দার সময়। '৩১-'৩২ থেকে যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত ইট ওয়াজ এ ভেরি ডিপ্রেস্‌ড পিরিয়ড। কেউ তখন সাব-ডেপুটি হলে তো প্রায় উলুধ্বনি দেওয়ার মতো ব্যাপার হত। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলে তো কথাই নাই।

আমার প্রশ্ন করলাম : ফজলুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কনটেস্ট করেছিলেন কে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : পঙ্কজ ঘোষ। ইলেকশনটা মজার হয়েছিল। কারণ নির্বাচনটা ছিল যুক্ত নির্বাচন। আর জিততে চাইলে আপনাকে আগে তো ভোটার করতে হবে। রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েটেরা ভোটার। কিন্তু কোনো গ্রাজুয়েট তো নিজের আগ্রহে পয়সা খরচ করে রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট হত না।তাই ১৯৩৬-৩৭-এ কুল্লে মুসলমান রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট ছিল খুব বেশি হলে সাড়ে চারশ'। অথচ হিন্দু রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট হাজার দুই হবে; হাজার দুই কেন, তিন চার হাজার হবে। হিন্দুদের কেউ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, কোনো মুসলমান উইল বি ম্যাড এনাফ টু কনটেস্ট। এরা মানে, ফজলুর রহমান সাহেবরা তাদের ম্যানেজমেন্টটা খুব সিক্রেট রাখলো। স্যার-এ.এফ রহমান তখন ভাইস চ্যান্সেলর। ফজলুররহমান স্যার এফ. রহমানকে যখন প্রথম বললেন, হি ওয়ান্টস টু কনটেস্ট, তখন উনি বললেন : পাগল হয়েছো! আমি এখান থেকে রিটারন্ড হই নাই একবারও। স্যার এফ. রহমানের একথা ঠিক। দ্বিতীয়বারে হি ওয়াজ ডিফিটেড বাই মহারাজা শশিকান্ত আচার্য। কিন্তু ফজলুর রহমান শুনলেন না। স্যার এফ. রহমান বললেন : আচ্ছা, তুমি যদি পার করো। তখন ফজলুর রহমান তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়া আরম্ভ করলেন। ফজলুর রহমানের বন্ধু ছিলেন আবদুল মতিন, সৈয়দ জান চৌধুরী ...। এদের কাউকে আপনারা চিনবেন না। আবদুল মতিন কয়েকদিন ওকালতি করেছিলেন। রিটায়ার করেন এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের কনট্রোলার হয়ে, এখন যে গর্ভনমেন্ট সেক্রেটারি মোকাম্মেল, তার শ্বশুর। সৈয়দ জান চৌধুরী ফুড ডিপার্টমেন্টে কী একটা চাকরি করতেন। এরা গ্রেট অর্গানাইজার ছিলেন। শেখ মোহাম্মদ পাটওয়ারীও ছিলেন। এ্যাগ্রিকালচারে কী একটা চাকরি করতেন। এই রকম ৫-৬ জন। টোটালি ডেডিকেটেড বন্ধু ফজলুর রহমান সাহেবের। এই তাঁর সম্বল। এঁরা খুব সারেপটিশাসলি 'রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট' করার ফর্ম ইত্যাদি এনে মোটের ওপর চারশ' মুসলমান গ্রাজুয়েটকে রেজিস্ট্রার করার ব্যবস্থা করে। লাস্ট ডে অব রেজিস্ট্রেশন, দুটার সময়ে ইউনিভার্সিটি এ্যাকাউন্টস অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। আগে পর্যন্ত কাউকে জানতে দেয় নাই। এরা তিন-চার কোণায় ফর্ম ইত্যাদি বগলদাবা করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রফুল্ল চক্রবর্তী করে আমার সাথে একজন পড়তো। পঙ্কজ ঘোষের লোক। তার ইলেকশনের অর্গানইজার। তারা ফজলুর রহমানের লোকদের ঠাট্টা করলো : কি তোমরা ইলেকশন করবা নাকি। এরা কিছু জওয়াব দিল না। হঠাৎ সময় শেষ হওয়ার মিনিট দশেক আগে পঙ্কজ বাবুর লোকেরা বুঝলো, এরা তো সব গ্রাজুয়েটের নাম রেজিস্ট্রার করতে আসছে! তখন তাদের টনক নড়লো। তারা দৌড়ে গেল ঢাকা হলে। ঢাকা হল খন হিন্দু ছাত্রদের প্রধান হল। সেখানে তাদের এগারশ' গ্রাজুয়েটের ফর্ম তৈরি। দশ টাকা করে ফি দিতে হবে। এসবই আছে। কিন্তু এদের রেজিস্ট্রার করার দরকার হবে এটা পঙ্কজ বাবুর লোকেরাও চিন্তাও করতে পারে নাই। কারণ মুসলমান গ্রাজুয়েটদের

কেই-বা রেজিস্ট্রার করবে। আর তাই বা হিন্দু গ্রাজুয়েট ভোটার আছে তাতেই হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের চিন্তা। শেষ মুহূর্তে চেতনা হল যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কিন্তু ঐ দশ মিনিটের মধ্যে ঢাকা হল থেকে দৌড়ে যেয়ে তাদের ফর্মগুলো আর আনতে পারলো না। দুটো বাজতেই গেট বন্ধ হয়ে গেল। ফজলুর রহমানের লোকজন তাদের গ্রাজুয়েটদের নাম রেজিস্ট্রার করে ফেললো। পঙ্কজ ঘোষের পক্ষ থেকে যারা রেজিস্ট্রার্ড হয়েছিল ফজলুল রহমান সাহেবের চাইতে সংখ্যায়-৫-৬ টি বেশি ছিল।

ফজলে রাব্বি বললেন : তাহলে অন্যদলও রেজিস্টার করেছিল?

: হ্যাঁ, কিছু তো করেছিল। কিন্তু আরো যে দরকার হবে, সেটা তারা বুঝতে পারে নাই। আর যখন টের পাইলো, তখন শেষ মুহূর্ত। দৌড়ে দিয়ে আর কুলাতে পারলো না। এর চার পাঁচটা ভোটের তফাৎ ছিল রেজিস্ট্রেশনের সময়ে। কিন্তু ফজলুর রহমান সাহেব জিতে গেলেন। মুসলমানরা তো সবসময়ই গোত্রস্বভাবের একটু বেশি। তাই ফজলুর রহমান সাহেবের কোনো ভোট নষ্ট হয় নাই, একমাত্র রেজা-এ-করিমের ভোট ছাড়া। সব মুসলমানই ফজলুর রহমানের পক্ষে ভোট দিল। একটা ব্যালটও নষ্ট হল না। ফজলুর রহমানকেদেখতে পারতো না, এমন অনেক মানুষ ছিল। কিন্তু ভোটের বেলায় ফজলুর রহমানকে বাদ দিয়া পঙ্কজ ঘোষকে ভোট দিবে, এমন চিন্তা তারা করতে পারতো না। ফজলুর রহমান কিন্তু কিছু হিন্দুও ভোটারও পেয়েছিলেন।

আমরা একটু আশ্চর্য হলাম : আচ্ছা!

: হ্যাঁ, কিছু হিন্দু ভোটও পেয়েছিলেন। ঢাকা বোর্ডের একজন সেক্রেটারি ছিলেন। রঘু রায়। একে যেন কী ব্যাপারে, তার সেক্রেটারিশিপ রাখা কিংবা অন্য কোনো ব্যাপারে ফজলুর রহমান সাহেব হ্যান্ড অবলাইজড। তাই কৃতজ্ঞতা থেকে রঘু রায় হিন্দু মুসলমান হিসেবে বিচার করতে রাজি হলেন না। তাছাড়া জে.এন. দাসগুপ্ত, ছিলেন ল'ব ডিন। তারও কোনো উপকার করেছিলেন বোধহয়। তিনিও ফজলুর রহমানকে ভোট দিয়েছিলেন।

আমাদের আলাপে এদিন আর একটি আলোচনা উঠেছিলো, অধ্যাপক রাজ্জাকের কেস করা নিয়ে। তিনি ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে একাধিক মোকদ্দমা করেছিলেন। ১৯৫০-এর দশক থেকেই অধ্যাপক রাজ্জাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সক্রিয় অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, বিভাগীয় প্রধান কিংবা ভাইস চ্যান্সেলর—এদের সঙ্গে মতামতের পার্থক্য ঘটেছে, সে পার্থক্য কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে হুমকির রূপ নিয়েছে। কখনো অধ্যাপক রাজ্জাক শিক্ষকদের মৌলিক অধিকারের পক্ষে আইনগত লড়াইয়ের চেষ্টা করেছেন। সেগুলো কাহিনী হিসেবে

প্রচারিত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মহলে। আমি সে সমস্ত কেসের কথা জিজ্ঞেস করাতে বললেন : আমরা প্রায় ছাত্র থাকতে একটা কেস করেছিলাম সমিমুল্লাহ হলের ইউনিয়ন ইলেকশনের ব্যাপারে। আর সবগুলো পরের ব্যাপার। আমার সব মামলাতেই পঙ্কজ ঘোষ আমার পক্ষে প্লিড করেছেন বা আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিলো ঐ ইউনিয়নের মামলার সময়ে ...

: পঙ্কজ ঘোষ কি গভর্নমেন্ট উকিল ছিলেন?

: হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট প্লিডার ছিলেন। আর ইউনিভার্সিটি একজিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বারও ছিলেন। ই.সি'র মেম্বার হিসেবে হি কুড নট লিগালি ডিফেন্ড দি স্টুডেন্টস, তবে বুদ্ধি-পরামর্শ দিতেন। পঙ্কজ ঘোষ ১৯৫৪ সালে জেনকিনস সাহেব যখন আমর ওপর নানা উপদ্রব শুরু করলেন তখনও আমার ল ইয়ার ছিলেন। সেই সময়ের একটা কথা মনে আছে। আমি যে, ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করব, তা আমার বক্তব্য কী, এটা লিখে দিতে বলেছিলেন পঙ্কজ ঘোষ।

আমরা সুনির্দিষ্ট হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম : স্যার, কী নিয়ে মোকদ্দমা ছিল?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমার ওপর তো বহুবার ইউনিভার্সিটি নোটিশ দিয়েছে, শো-কজ করেছে, কেন আমাকে ডিসমিস করা হবে না তার কারণ দর্শাবার জন্য। এই মোকদ্দমার মূল ব্যাপার ছিল নিউম্যানের সঙ্গে গোলমাল নিয়ে।

: এটা কখন ঘটেছিলো?

: এটা বোধহয় এ্যাজ লেইট এ্যাজ ১৯৪৫-৫৫। যাহোক পঙ্কজ বাবু বলাতে আমি আমার অভিযোগের বৃত্তান্ত দিয়ে একটা কাগজ লিখে নিয়ে গেছি। পঙ্কজ ঘোষের ছেলেদের সঙ্গে আমার আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিলেতে আমরা এক সঙ্গে ছিলাম।

পঙ্কজ ঘোষের কথা আমিও আমার ছাত্রাবস্থায় শুনেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম : পঙ্কজ বাবু কি '৫৪ পর্যন্ত ঢাকাতে ছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হ্যাঁ, ফিফটিফোর পর্যন্ত ঢাকাতে ছিলেন। তার এক আধ বছর পরে বোধহয় কোলকাতা চলে যান। ... আমার লেখা কাগজটা পড়ে তিনি বলে ফেললেন : এগুলো কী লেখেন আপনারা? তাঁর এমন মন্তব্য শুনে আই ফেল্ট ভেরি অকওয়ার্ড। তখন আমার প্রায় কুড়ি বছর চাকরি হয়েছে, আর তিনি সোজা অমনভাবে বলে ফেললেন। ঐ কথা বলার পরে বললেন : আপনি লেখেন, আমি কই। বলে আমাকে ডিকটেশন দিতে শুরু করলেন। হি গেভ মি এ ড্রাফট, একেবারে এক টানে, উইদাউট পজ। তখন বুঝলাম, ধমক দেবার অধিকার আছে। এটা শেষ করে নিজেই বললেন : আপনি রাগ করবেন না, আমার কথায়। আপনাকে আমি ওভাবে ট্রিট করি নাই। আমার ছেলে আপনার কথা আমাকে লিখেছে।

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : তখন পাকিস্তান তো হয়ে গেছে। কিন্তু এই পঙ্কজ বাবুর সে খেয়াল নেই। সে খুব রিস্কি চিঠি লিখতো পাকিস্তানের ওপর কমেন্ট করে তার ছেলের কাছে বিলেতে। ছেলে সে সব চিঠির কথা আমাকে বলতো। আমি ছেলেকে বলতাম, তোমার বাবাকে সাবধান করে দিও, এভাবে যেন চিঠির মধ্যে এসব কথা না বলেন। এগুলোর রিস্ক আছে। আমি বলতাম, তোমার বাবা এতদিন ওকালতি করেছেন, এটা তিনি বুঝতে পারেন না যে, এসব কথা কনফিডেশাল থাকার কোনো গ্যারান্টি নাই। যে কোনো সময়ে তার করেসপন্ডেন্স সরকারি লোক খুলতে পারে। তখন তো এসবের বিরুদ্ধে কোনো ডিফেন্স থাকবে না। সে ছেলে নিশ্চয়ই বাবাকে আমার এসব কথা জানাতো। তাঁর দুই ছেলেকে জানতাম। ছোট ছেলের নাম রজত। বড়টির কী যেন নাম। লন্ডনে তখন পিএইচডি করছে। ছেলের কথা উল্লেখ করে পঙ্কজ বাবু বললেন : আপনি আমার শুভানুধ্যায়ী। আমার ছেলে অনেক সময়েই আপনার কথা আমাকে লিখেছে। সে কথা মনে করে আপনাকে নিজের লোক ভেবে আনরেস্ট্রইন্ড হয়ে কথা বলেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। ... পঙ্কজ ঘোষ একেবারে ডেসপরেট চিঠি লিখতো। পাকিস্তান টিকবে কি টিকবে না, এই সব বিপজ্জনক কথা।

ফজলে রাব্বি প্রশ্ন করলেন : আপনি কয়টা মামলা করেছেন ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমি নিজে করেছি দুইটা। সে দুইটা রিসেন্ট। আমার প্রথমটা ঠিক ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে নয়। গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বলা চলে। গভর্নমেন্ট নতুন ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট করলো যে মাস্টাররা রাজনীতি করতে পারবে না। পলিটিক্যাল পার্টির মেম্বার হতে পারবে না।

আমরা প্রশ্ন করলাম, এটা কবেকার ব্যাপার?

: আমি মোকদ্দমা করলাম তো আয়ুবের আমলে। ... আমি বলেছিলাম, দিস ডাস নট এ্যাপ্লাই টু মি। এই মোকদ্দমা জিতেছিলাম।

ফজলে রাব্বি জিজ্ঞেস করলেন : হাইকোর্টে?

: হ্যাঁ, হাইকোর্টে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : আরগুমেন্ট কী ছিল স্যার?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আরগুমেন্ট ছিল যে আমার চাকরি কনট্রাকচুয়াল। আমার কন্ট্রাক্ট-এ একথা ছিল না। সুতরাং এনি লেইটার এডিশন অব এনি কন্ডিশন ইজ নট এ্যাপ্লিকেবল টু মি। পরবর্তীকালে কোনো নতুন শর্ত যোগ করা হলে আমার উপরে তা প্রযুক্ত হতে পারে না। ওটা ক্লিয়ার ছিল। পরের কেসটা হল ১৯৬৬'র দিকে। ওসমান গনি সাহেব তখন ভি.সি.। আমাকে ইউনিভার্সিটি 'শো-কজ' করেছিল : হোয়াই আই শুড নট বি ডিসমিসড। দুটো কেসই ওসমান গনি সাহেবের সময়ে। তবে প্রথমটা ওয়াজ ডাইরেক্টেড এগেইনস্ট

গভর্নমেন্টেস অর্ডার। এই প্রথমটা আমাকে দিয়ে জোর করে করায় ডা. মুর্তজা। আমি মুখে মুখে বলেছিলাম যে নতুন আইন আমার ওপর এ্যপ্লাই করতে পারে না। কিন্তু আমার তো আর এত এনার্জি নেই যে আমি দৌড়াদৌড়ি করে মোকদ্দমা করবো। এটা করলো ডা. মুর্তজা। আর উকিল দিল ড. আলিম আল রাজীকে। আলিম আল রাজীর দুটা পি.এইচ. ডি আছে। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপারে তো খুব ওস্তাদ না। কয়েকদিন হাঁটাহাঁটির পরে কামাল (ড. কামাল হোসেন) একদিন বললো : স্যার, আমি তো অনেক জুনিয়র। কিন্তু আপনার কেসটাতে আলিম আল রাজী সাহেব তো অত মন দিতে পারবেন না। আমি তার জুনিয়র হিসেবে কাজ করতে রাজি আছি। তবে মোকদ্দমা যদি করেনই তবে ভালো করে করা ভালো। আমি বললাম : বেশ, যা ভালো হয় করো। কামালের তো অপরিসীম পরিশ্রম করার ক্ষমতা। প্রথম যেদিন প্লেইন্টটা ড্রাফট করে সেদিন সন্ধের পরে আমরা গেলাম আলিম আল রাজীর বাড়িতে। রাত তিনটার সময়ে কামাল ড্রাফট তৈরি শেষ করলো। আলিম আল রাজী বেশিক্ষণ আর জেগে থাকতে পারে নি। নটার পরেই তিনি ঘুমিয়েছেন। কয়েকদিন পরে কামাল আবার বললো : স্যার, ড্রাফট তো আমি করলাম কিন্তু জুনিয়র। আরগুমেন্ট তো আমি করতে পারবো না, কারণ বারের তো একটা কার্টেসি আছে। তবে যদি আর কোনো উকিল হয় তবে ভালো হয়। আমি বললাম : আর কোন উকিল পাবা? কামাল বললো : ব্রোহী আছেন। আমি বললাম : ব্রোহীকে আমি জানব ক্যামন কইরা। আই ডোন্ট নো হিম। তাছাড়া পার এ্যাপিয়েন্সেই তো তার ফিস হইব বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা! আমার কেস সে করবে কেন? কামাল বললো : ওটা আপনার চিন্তা করতে হবে না। আমি ব্রোহীর সঙ্গে কথা বলবো। এটা তো আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মোকদ্দমা না। ইট ইজ এ কোশ্চেন অব প্রিন্সিপ্ল এ্যট ইস্যু।এটা তিনি করবেন গ্লাডলি, আমার ধারণা। আর ব্রোহী যদি থাকেন তাহলে আলিম আল রাজী সাহেবেরও কোনো অসুবিধা হবে না। পরের দিন কামাল বললো : চলুন যাই, ব্রোহীর সঙ্গে দেখা করি। গতকাল আমি তার সঙ্গে আলাপ করেছি।

আমরা প্রশ্ন করলাম : ব্রোহী তখন ঢাকায়?

: হ্যাঁ, ঢাকায় আসছিলেন কোনো ব্যাপারে। কামাল ব্রোহীর জুনিয়র হিসেবে কী একটা মোকদ্দমা করছিল। সেই কানেকশন-এই বোধহয় এসেছিল। কামাল বললো : ব্রোহী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমি গেলাম। ব্রোহী আলাপে খুব প্লেজ্যান্ট লোক। তিন চার ঘণ্টা আলাপ করলেন। আমি বললাম : তুমি বড় ব্যারিস্টার। তোমার ফিস দেবার সাধ্য আমার নাই,এটা জান তো? আমার কথা শুনে ব্রোহী হেসে বললেন : মামলাটা তো তোমারও সম্পত্তি ঘটিত নয়। ইট অলসো কনসার্নস মি, এ্যজ অরডিনারি সিটিজেন। দিস ইজ এ রাইট অব এ টিচার। যদি পয়সা দেবার দরকার হয়ত আমাদেরই উচিত তোমাকে পয়সা দেওয়া। কারণ তুমি কেসটা ফাইট করছো। কিন্তু সে পয়সা তো আমি তোমাকে

দিচ্ছি না। কাজেই তোমার বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। ... তারপরে ব্রোহী মোকদ্দমা করলেন। এটাতেও সাত্তার সাহেব জজ ছিলেন। প্রথমে মাহবুব মুর্শেদ সাহেবের বিচার করার কথা ছিল শেষ পর্যন্ত জজ হলেন সাত্তার সাহেব।

এরপরে একটু থেমে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এখানে মামলা মোকদ্দমা আর বিচারের একটা অসুবিধা—সকলেই তো সকলের চেনাশোনা : ফলে অনেকখানেই বিষয়ের বদলে ব্যক্তি সামনে এসে পড়ে। কিন্তু তার আর কী করা, সেদিক থেকে দেখলে জজই পাওয়া যাবে না, যিনি সব চিনপরিচয়ের উপরে। সাত্তার সাহেবকে আমি ভালোভাবে চিনি। ১৯৫৬ সালের কনস্টিটিউশন করার সময়ে আমি করাচিতে যে দুই মাস, আড়াই মাস ছিলাম, তখন সাত্তার সাহেব ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির মেম্বার। আসলে মোহন মিয়া আর সাত্তার সাহেব—দুজনই মনেপ্রাণে কাজ করেছেন বাকিরা সব—

অধ্যাপক রাজ্জাক বাক্যটি আর শেষ করলেন না। অবশ্য এটি তার একটি বাকভঙ্গিও বটে। তিনি যাকে অকাট্য মনে করেন তাকে আর পুরো উচ্চারণেরও অনেক সময় আবশ্যকতা বোধ করেন না।

ফজলে রাব্বি আমার নাম উল্লেখ করে বললেন : সরদার সাহেবও তো তখন ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির মেম্বার। তারপর আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন : আপনি তখন কোথায়?

আমি বললাম : আমি জেলে। আমাকে গ্রেফতার করেছিলো।

অধ্যাপক রাজ্জাকেরও দেখলাম সে কথা মনে আছে। বললেন : হ্যাঁ, সরদারকে ধরে নিয়ে যায়। সরদার আর মাহমুদ আলী দুজনকে ধরেছিলো, করাচিতে।

আমাকে অবশ্য পাকিস্তান সরকার করাচিতে গ্রেফতার করে নি। করেছিলো করাচি যাওয়ার জন্য তেজগাঁ বিমানবন্দরের বিমানে আরোহণ করার পরে বিমান থেকে। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে। সেটা দেশের বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। সে প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনায় না যেয়ে আমি প্রশ্ন করলাম অধ্যাপক রাজ্জাককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কেস সম্পর্কে : কেসে জিতলেন কীভাবে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : জিতলাম খুব ন্যারো গ্রাউন্ডে। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে সরকার যেভাবে এ্যামেন্ড করেছিল তার ড্রাফটিং ওয়াজ ভেরি পুওর। সংশোধনীর একটা কথা ছিল : অল কন্ট্রাক্টস উইল রিমেইন আনচেইঞ্জড। কোনো চুক্তির পরিবর্তন হবে না। চুক্তি বলতে সরকার খুব সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক চুক্তি ইত্যাদি বুঝাতে চেয়েছিলো। একজন শিক্ষকের চাকরিও যে আগে চুক্তির ভিত্তিতে হত, দিস হ্যাড নট এনটারড দেয়ার হেড। সুতরাং ব্রোহী সাহেব বড় বড় যে আরগুমেন্ট দিলেন মৌলিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে সাত্তার সাহেব সেগুলো ইগনোর করে বললেন : ইট ইজ নট নেসেসারি টু

গো ইনটু দোজ আরগুমেন্টস। তিনি বললেন, কেবল এই ভিত্তিতেই সংশোধনী আমার ওপর এপ্লিক্যাবল নয়, কারণ দি ল্যাংগুয়েজ ইন হুইচ দি এ্যামেন্ডমেন্ট হ্যাস বিন এনাকটেড এক্সক্লুডস অল কন্ট্রাকটস ফ্রম ইটস এ্যাপ্লিক্যাবলিটি। উনি আর বিষয়ের গুণাগুণের ভেতরে যেতে রাজি হইলেন না। কিন্তু সে এ্যামেন্ডমেন্ট তখনি যে এজন্য রদ হয়ে গেল, তা নয়। কারণ দেখা গেল, চুক্তির চাকরি তখন কেবল আমারই ছিল। বাকি সব এ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে সাবসিকুয়েন্ট টু মি, আমার পরবর্তীকালের চাকরি।

এই প্রসঙ্গে বিচারপতি হামুদর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন যেভাবে পরিবর্তন করেছিলেন ভি.সি. থাকাকালে তার আলোচনাও উঠলো। অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হামুদর রহমানের তৈরি আইনের ল্যাংগুয়েজ আনফরচুনেট। কিন্তু শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তার দিক থেকে পূর্বের চেয়ে অধিক সুনির্দিষ্ট ছিল। আগে যেখানে 'নৈতিক বিচ্যুতি' নামক অনির্দিষ্ট এবং ইচ্ছানুযায়ী ব্যাখ্যাযোগ্য অভিযোগে একজন শিক্ষকের চাকরি যেতে পারতো, সেখানে হামুদর রহমান প্রণীত আইনে একজন শিক্ষককে চাকরি থেকে অপসারণ করা কর্তৃপক্ষের জন্য অনেক বেশি কষ্টসাধ্য করা হয়। প্রসিডিউর বা নিয়মনীতির যেকোনো বরখেলাপই কর্তৃপক্ষের নোটিশকে অকেজো করে দিতে পারত। এভরি সিঙ্গল পয়েন্ট অব প্রসিডিউর এই আইনে ডিটেইল্ড লেখা আছে : নোটিশ দিতে হবে, জবাবদানের সময় দিতে হবে, উপযুক্ত সময় দিতে হবে ইত্যাদি। তারপরে অধ্যাপক রাজ্জাক ইউনিভার্সিটি তার বিরুদ্ধে যে আর একটা নোটিশ জারি করেছিল তার উল্লেখ করে বললেন : ওরা আমার এগেইনস্ট-এ যে নোটিশ দিয়েছিল তার প্রসিডিউরটা খুব নিখুঁত ছিল না।

আমরা এ বিষয়ে একটু ভালোকরে জানার জন্য জিজ্ঞেস করলাম : আপনার বিরুদ্ধে কী নোটিশ দিয়েছিল?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ইউনিভার্সিটি আমাকে নোটিশ দিল, শো-কজ হোয়াট ইউ শুড নট বি রিমুভড। তাদের সে নোটিশ ব্রোহীকে দেখাতে ব্রোহী তার একটা জবাব ড্রাফট করে দিয়েছিলেন। সে জবাব যখন ইউনিভার্সিটিকে দিলাম, ইউনিভার্সিটি তখন তাদের নোটিশ রিফ্রেইম করে আবার শো-কজ করলো : হোয়াট ইউ শুব নট বি ডিসমিসড। এবার আর 'রিমুভ' বা অপসারণ নয়, এবার একেবারে 'ডিসমিস', বরখাস্ত। কারণ ব্রোহী সাহেবের ড্রাফট এই কথাটিই তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, রিমুভ করলে আমার প্রসিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিতে হবে, আর ডিসমিস করলে সেটাও আর দেওয়া লাগবে না। ব্রোহী সাহেবের তৈরি যুক্তিতে তারা এতো ইসপ্রেসড হয়েছিল যে তারা আমার দণ্ড আরো বৃদ্ধি করলো। তখন অর্থাৎ যেদিন আমাকে বলা হল আইদার টু এ্যাপিয়ার অব টু ফেইস একসপার্টি ডিসিশন, সেদিন আমি হাইকোর্টে রিট করলাম।

অধ্যাপক রাজ্জাকের বলার ভঙ্গিতে ব্যাপারটি আমাদের কাছে খুব চমকপ্রদ লাগছিলো। কিন্তু এর পেছনের জটিলতা সহজে উদ্ধার করা যাবে না মনে করে আমরা তার বিরুদ্ধে তৎকালীন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের অভিযোগের মূল কারণটা কী তা জানতে চাইলাম।

অধ্যাপক রাজ্জাক তার জবাবে বললেন : ভেতরের কারণ, ওসমান গনি সাহেবের সময়ে মাহমুদকে নিয়ে (অর্থনীতির অধ্যাপক ড. মাহমুদ) প্রচণ্ড গোলমাল হয়। সেই গোলমালের কিছুদিন পূর্বে ওসমান গনির সঙ্গে আমার বেশ একটা লম্বা কথাবার্তা হয়।

ওসমান গনি সাহেবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ করে বললেন : ওসমান গনি এবং আমি একসঙ্গে পড়েছি ম্যাট্রিকের পর থেকে ৬-৭ বছর। আমার সঙ্গে তাই পরিচয়, বন্ধুত্ব যাই কন, অনেকখানি আছে। ওসমান গনি আগে আমার আর একটা কৈফিয়ত তলব করেছিল, পরীক্ষার খাতা কেন দেখবো না, সেই জন্য।

সেই কৈফিয়তের কথা একটু বিস্তারিতভাবে বলতে যেয়ে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমি ওসমান গনিকে একটি চিঠি পাঠিয়ে বলেছিলাম, কৈফিয়ত তলব করেছেন, ভালো কথা। লিখিত জওয়াবেও দেওয়া চলে। তবে ইট উইল নট রিড ভেরি নাইস। তার চেয়ে বরঞ্চ আই উইল লাইক টু সি ইউ এবং মুখে আই শ্যাল এক্সপ্লেইন দি ম্যাটার, কেন আমি পরীক্ষার খাতা দেখতে রাজি না। তারপরে ইফ ইউ ওয়ান্ট, আই শ্যাল পুট ইন রাইটিং। এই উড বেটার ইয়ার মি। তিনি তার জবাবে আমাকে তার সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের একটা তারিখ ও সময় দিয়েছিলেন। বাট ইট আনফর্চুনেটলি সো হ্যাপেন্ড যে, বড় দিনের ছুটির সময়ে ওটা যখন আমার বাসার আসে তখন আমি বাসায় না, ঢাকার বাইরে। বাসার কেউ খেয়াল করে নাই। কেউ কিছু বলে নাই। ফলে আমি জানতাম না যে হি হ্যাড গ্রান্টেড মি এ্যান ইন্টারভিউ এ্যান্ড আস্কড মি টু এ্যাপিয়ার। তারপরে জানুয়ারি মাসে আর এক চিঠি। তখন আমি ঐ কথাই লিখে পাঠাই যে, এগুলো কাগজে-কলমে না লেখাই ভালো। হি এগেইন গ্রান্ডেড মি এ্যান ইন্টারভিউ। আমি তখন যাই। আমাকে দেখে অবশ্যই তার রাগ হয়েছিল। হি ওয়াজ অবভিয়াসলি ভেরি এ্যাংরি। ইংরেজিতে বাক্যলাপ শুরু করে বললেন : ইউ হ্যাড সট এ্যান ইন্টারভিউ এ্যান্ড দি ভিসি হ্যাড গ্রান্টেড ইট। এ্যান্ড দেন ইউ ডিড নট কেয়ার টু টার্ন-আপ। আমি জবাবে হেসে বললাম, তাতে কী হয়েছে। এখন তো আইছি, আবার কী যেন বললেন। তখন আমি বললাম : ওগুলো থাক। কাজের কথা কী আছে, সেটাই কন। 'ক্যান আগে আহি নাই, সেইটা শুইন্যা লাভ কি। এহন তো আইছি।'

অধ্যাপক রাজ্জাকও সেদিন ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের সঙ্গে নিশ্চয়ই ইংরেজিতেই আলাপ করেছিলেন। ইংরেজির আলাপেও তিনি স্বচ্ছন্দ এবং

সুরসিক। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সেই পুরনো দিনের কাহিনীর বেলায় অধ্যাপক রাজ্জাক তার আলাপের কথা ঢাকাইয়া সুরে বাংলা করে বলছিলেন।

সঙ্গী ফজলে রাব্বি বললেন : আপনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তো ঘনিষ্ঠ ছিল। সম্বোধনে কি আপনারা 'তুমি' না 'আপনি' ব্যবহার করতেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু 'তুমি' সম্বোধনের রেওয়াজ তো মুসলিম হলের ছাত্রদের মধ্যে কম ছিল। ওসমান গনির সঙ্গে আমি সাত বছর এক সঙ্গে পড়েছি। তিনিও এম. এস.সি.তে এক বছর ডেফার করেছিলেন, আমিও এম.এ.তে এক বছর ডেফার করেছিলাম। আমাদের খুব সম্ভব প্লেসও এক : তার সায়েন্সে,আমার আর্টসে, কলেজে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : কী প্লেস ছিল স্যার, আপনাদের?

: সেভেনথ-সপ্তম খুব সম্ভব, আমরা দুজনই ইন্টারমিডিয়েট-এ। যা হোক। আই এক্সপ্লেইড টু হিম। আমি তাকে ব্যাপারটা বললাম। ব্যাপারটা ছিল, আমি যখন পলিটিক্যাল সায়েন্সে, তখন সে এক অর্ডার দেয় যে, আই এ্যাম নট টু বি এ্যান এক্সামিনার। আমি বললাম : দ্যাখেন, পলিটিক্যাল সায়েন্সে ইউ হ্যাড ইস্যুড এ্যান অর্ডার দ্যাট আই এ্যাম নট টু বি এ্যান এক্সামিনার।

এরূপ আদেশের উল্লেখে আমরা বেশ চমকিত হলাম। আমি কারণটা জিজ্ঞেস করার জন্য বললাম : কেন স্যার?

: তখন গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী (জি ডাব্লিউ চৌধুরী) বিভাগের হেড। সে যেন কী একটা নালিশ-টালিশ করেছিলো আমার বিরুদ্ধে। আমি ওসমান গনিকে বললাম, কিন্তু আই ডিড নিট টেক আপ দি ম্যাটার দেন। কারণ আমি পরীক্ষক না হলে আর একজন পরীক্ষক হয়, খাতা দেখে। তাতে তার কিছু আর্থিক উপকার হয়। আমি না হলে যে হবে সেও আমার পরিচিত লোক এবং কলিগ। কাজেই এটাকে আমার ইস্যু করা চলে না। ... আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমাকে অযোগ্য বিবেচনা করেছেন। এখন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্সে আমি এক্সামিনার হইতে চাই না, সেই জন্য শাস্তি দিবেন। এটা কি? হাউ অন আর্থ ডু দি থিংস গো টুগেদার? আমার একথা শুনে ওসমান গনি বললেন : আমি কী করবো, আপনার বিরুদ্ধে গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী রিপোর্ট করেছে যে, আপনার গাফিলতির জন্য রেজাল্ট বেরুতে দেরি হয়েছে। আমি বললাম, গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী রিপোর্ট করলো এ্যান্ড ইউ টু এ্যাকশন। ইউ ডিড নট কনসিডার ইট নেসেসারি টু রেফার টু মি। আমার কিছু কইবার আছে কি না ...

ভাইস চ্যান্সেলর ওসমান গনি সাহেবের সঙ্গে অধ্যাপক রাজ্জাকের সেদিনের সে সংলাপের কথা অধ্যাপক রাজ্জাক বেশ বিস্তারিতভাবে বললেন।

: তাছাড়া ইউনিভার্সিটি হ্যাজ নো রাইট টু কম্পেল এনি ওয়ান টু বিকাম এ্যান এক্সামিনার পরীক্ষকের চিঠিতে একটা কথা থাকে যে পরীক্ষক যদি রাজি না থাকেন তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চিঠিতে বলা থাকে : ইফ ইউ

এ্যাগরি। দিস মিনস আই হ্যাভ এ রাইট নট টু এ্যাগরি। কিন্তু আমি সে কথা বলছি না। আই ওয়ান্টেড টু হ্যাভ এ্যান অকেজন টু অস্ক যে, আমার বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ কেমন করে করেন? আমার কথা শুনে ওসমান গনি বললেন : এই দেখুন তো ব্যাপার। আমি জি, ডাব্লিউ. চৌধুরীকে বিশ্বাস করেছিলাম। আপনার বিরুদ্ধে সে আরো রিপোর্ট করেছে, কিন্তু আমি কোনোদিন হিয়ারিং দেই নাই। আমি বললাম: সে তো খুব ভালো কথা। এতদিন আমাকে বিপদে ফেলেন নাই। বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তা তো আমি জানতাম না। এখন জানলাম। এখন আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তখন হঠাৎ তিনি বলে ফেললেন : আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি যে মানুষের কাছে আপনি আমার নিন্দা করেন। তাঁর কথা শুনে আমি হেসে বললাম : নিন্দাটা কোনোদিন আপনার সামনে করেছি? তিনি বললেন : না। আমি বললাম, যে নিন্দা আমি আপনার সামনে করার সাহস করি না, সেই নিন্দার কথা আপনি কানে নেন কেন? আমার যদি কিছু কইবার থাকে, গুড, ব্যাড অর ইনডিফারেন্ট, সেটা আপনার সামনে বলারও আমার সাহস থাকতে হবে। সে সাহস যদি আমার না থাকে। তাহলে আমার সেই নিন্দার কোনো মূল্য আছে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমি আলাপের মধ্যে এক সময় বললাম, আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া-ঝাটি কেন করব। আপনার কাছ থেকে এই বুড়ো বয়সে আমার চাইবার কিছু আছে নাকি। ... যাই হোক এই সমস্ত বলার পরে দেখি চুপ করে আছেন। তখন আমি বললাম, গেট ইট আউট অর ইউর হেড যে, আই হ্যাভ এনি গ্রিভ্যান্স এগেইনস্ট ইউ। একথা ঠিক আপনি যেভাবে, যে পন্থায় ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে আসেন সে পথে না আসলে আমি খুশি হতাম। সোজা পথে আপনি দুএক বছরে ভি.সি হতেনই। যে সারকামস্ট্যান্সে আপনি ভি.সি. হইলেন সেটা অডরিফারাস ... আমার কথা শুনে ওসমান গনি চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন : দেখুন আমারে বিশ্বাস করুন, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করি নাই। আমি বললাম : আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও আমি কিছু মনে করবো না। কারণ যেদিন আই শ্যাল নট বি এবল টু লুক আফটার মাইসেলফ, সেদিন অন্যের বিরুদ্ধেও আমার কোনো অভিযোগ থাকবে না। ... এভাবে সে ঘটনা চুকে বুকে গেল। তারপরে বেশ কিছুদিন শান্তিতে ছিলাম। তারপর হঠাৎ মাহমুদের এই গোলমালটা। গোলমালটা যেদিন হয় সেদিন আমি একেবারে শয্যাগত। হঠাৎ গলা বসে যায়। ১২-১৪ দিন কথা বলতে পারি নাই। যেদিন ওকে মারে সেদিন আমি কোনো কথাই বলতে পারি না।

ড. মাহমুদের ব্যাপারটা কোর্টে ওঠে। ড. মাহমুদের ব্যাপারটা বলতে যেয়ে অধ্যাপক রাজ্জাক আবার বললেন : মাহমুদ তো তোমার প্রিয় ছাত্র! আমি তাকে একদিন বলেছিলাম, তোমার যেরূপ আচার আচরণ, তুমি আমার সঙ্গে কথাবার্তা কইও না ... আসলে বছর তিনেক যাবৎই মাহমুদের সঙ্গে আমার কোনো

কথাবার্তা নাই। এই গোলমালের সময়ে উই ওয়েয়ার নট ওন টকিং টার্মস। একদিন মুজাফফর হঠাৎ আমার বাসায় এসে উপস্থিত : স্যার, আপনি ব্রোহীকে চেনেন। মাহমুদের কেসটায় ব্রোহীকে আপনি একটু বলে দেন, প্লিড করার জন্য।

আমি বললাম : ভালো কথা। তারপর দেখি সে একট টেলিগ্রাম বার করেছে পকেট থেকে। তারপরে বললো : এই টেলিগ্রামটা আমরা ব্রোহীকে পাঠাতে চাই। আমি বললাম, টেলিগ্রামটা কি? দেখি তাতে লেখা আছে, ইউ আর এমপ্লয়েড। অমুকের স্যুট-এ। অত তারিখে কেস উঠবে ইত্যাদি। আমি টেলিগ্রামটা পইড়্যা মুজাফফরের মুখের দিকে চাইলাম। আমি বললাম এই টেলিগ্রামটা পাঠাবার চান নাকি? মুজাফফল বললো, হ্যাঁ স্যার। আমি বললাম, ব্রোহী কে, আপনাদের ধারণা? আপনারা না তার কাছে একটা ফেবার চাইতে আছেন। মুজাফফর আমার কথা শুনে একটু আমতা আমতা করল। আমি বললাম : এই ভাষায় তো একটা আট আনার মোক্তারকেও লেখা যায় না।

ফজলে রাব্বি বললেন : স্যার, ড্রাফটটা কে করেছিলো?

: ওরা কে করেছে আমি জানি না। ওদের মধ্যেই একজন করেছিল। ... আমি মুজাফফরকে বললাম, দেখ মাহমুদের সঙ্গে তো আমি কথাবার্তা কই না। ব্যাট ইট ডাজ নট ম্যাটার। এই টেলিগ্রাম তোমাদের পাঠাতে হবে না। আমি করাচি যাইতে পারি। আমি তাকে পারসোনালি রিকোয়েস্ট করবো যে, তুমি যদি আস, আমরা খুশি হব। মুজাফফর বললো : করাচি যাওয়ার কত পয়সা। আমি বললাম : সে পয়সা তোমাদের দেবার দরকার নাই। শ'পাঁচেক টাকা লাগবে। সে শ'পাঁচেক টাকাতো মাহমুদের জন্য আমার চাঁদা দেওয়াও উচিত। মুজাফফর আমার কথা শুনে বললো আচ্ছা দেখি। ... ওদের এই বুদ্ধি-পরামর্শে কে কে আছিল, আমি জানিও না। তিন-চারদিন পর আমারে আইয়া কয় না, স্যার, ওসব হাঙ্গামা পোষাইব না। টেলিগ্রামটা আমরা পাঠাইয়া দিছি। আমি বললাম : এক্সাক্টলি ইন দি ল্যাংগুয়েজ দ্যাট ইউ রোট? সে বললো : হ্যাঁ।

কথাটা শুনে অধ্যাপক রাজ্জাকের সঙ্গে আমরা ও হেসে উঠলাম। অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : মুজাফফরের সেই জওয়াব শুইন্যা আমি উপরের দিকে চাইয়া কইলাম, আমি যে না করলাম। মুজাফফর বললো : না, ওগুলো কিছু না। আমি বললাম : ঠিক আছে, তোমরা যদি আমারে এ্যালাউ কর তাহলে আমি একটা পারসনাল চিঠি লিখবার চাই ব্রোহীকে—

: কী লিখবেন?

আমি বললাম, কী আর লিখুম, মাফ চামু আর কমু যে, আমরা মাস্টাররা টাকা-পয়সার খুব হিসাব করি। টেলিগ্রামে পয়সা বেশি যাইবো বইল্যা এইভাবে লিখছি। আসলে হোয়াট উই আর আস্কিং, ইজ এ ফেভার ফ্রম ইউ ... মুজাফফর আর তার সঙ্গীরা বললো : আপনি যা ইচ্ছা কারণ লিখতে পরেন। এনি ওয়ে দে কাইন্ডলি পারমিটেড মি টু রাইট। তারপরে আমি ব্রোহীকে একটা চিঠি লিখি।

ব্রোহী ওদের টেলিগ্রাম ঠিকই পাইছে। সে তার ভাষা-টাষার দিকে নজরই দেয় নাই। ব্রোহী এক হিসেবে খুব উঁচু দরের মানুষ। পরে আমার সঙ্গে ব্রোহীর যখন দেখা তখন আমারে কয় : আবার চিঠি কেন লিখেছেন। আমি তো টেলিগ্রাম পেয়েছি। তার অন্য কোনো দিকে খেয়াল নাই।

এই কাহিনী আরো বিস্তারিতভাবে বলতে যেয়ে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : মজার ব্যাপার এই যে এই সময়ে ড. ওসমান গনি এই কেসের জন্যই তাঁর এক ব্যারিস্টার রফিকুর রহমানকে করাচিতে পাঠান ব্রোহীর কাছে, ব্রোহী যেন ইউনিভার্সিটির পক্ষে, মানে মাহমুদের বিপক্ষে আরগু করেন। যেদিন আমাদের টেলিগ্রাম গেছে, তারপরের দিন ড. গনির লোক ব্রোহীকে এ্যাপরোচ করেছে। ব্রোহীকে ড. ওসমান গনির লোক এই কেসের কথা উল্লেখ করতেই সে বললো : ইয়েস, ইয়েস, আমি তো একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি, রাজ্জাকের কাছ থেকে। তো তোমরা কি এক পক্ষ? ড. গনির লোক বললো : না উল্টা পক্ষের। তখন ব্রোহী বললো : ইন দ্যাট কেস আই এ্যাম নট টেকিং ইওর ব্রিফ। আই এ্যাম টেকিং রাজ্জাক ব্রিফ। ড. গনির লোক ফেরত এসে ড. গনিকে বলেছে। তখন ড. গনি ন্যাচারাললি আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কারণ এর আগের আলোচনাতে তার ধারণা হয়েছিল যে আমি তাঁকে কথা দিয়েছি আমি তার বিরুদ্ধে কিছু করব না। এখন উঠেছিলো অধ্যাপক রাজ্জাকের ওপর নোটিশ জারির কথা নিয়ে। আমরা সেজন্য জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বিরুদ্ধে মোকদ্দমাটা করলো কে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এর শুরু হয়েছিল ড. আজিজ থেকে। সে আমার দ্বারা তার ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স ডিপার্টমেন্টের কতকগুলো ক্লাস নেয়ার জন্য রুটিন করে আমাকে চিঠি দিয়েছিল। আমি তার লিখিত চিঠির কোনো জবাব দেই নাই। মুখে বলেছিলাম : তার ডিপার্টমেন্টের কোনো ক্লাস-ট্লাস আমি নিতে পারব না। আসলে আমি তার ডিপার্টমেন্টে পাঁচ ঘণ্টা ক্লাস নিতেছিলাম। এই নতুন রুটিন ছিল তার বাড়তি। ড. আজিজের ডিপার্টমেন্টে আমি যে ক্লাস এতোদিন নিয়েছি, সে ছিল আমার পলিটিক্যাল সায়েন্সের বাইরে। এজন্য পারিশ্রমিকের রেওয়াজ থাকলেও আমি কোনো বাড়তি পারিশ্রমিক এজন্য নিই নাই। এবার নতুন ক্লাসের ব্যাপারে আমি মুখে রাগ করে বলেছিলাম, আমি আর ক্লাস দিতে পারুম না।

অধ্যপক রাজ্জাক তারপর ড. আজিজ সম্পর্কে একটা মন্তব্য করতে চাইলেন। একটু থেমে বললেন : তাঁর সম্পর্কে কী বলবো। কেবল বলা যায়—'কঠিন মানুষ!' তাঁর ধারণা হল, কী হ্যাজ এ রাইট টু ডিমান্ড ক্লাস ফ্রম মি। তাই সে লিখিত চিঠি দিল। আমি তার লিখিত জবাব কিছু দিই নাই। এই যে জবাব দিলাম না, দিস ওয়াজ থট টু বি মাই ডেরিলিকশন অব ডিউটি। এইটার ওপর তারা কৈফিয়ত চাইলো : হোয়াট আই শুড নট বি রিমুভড এ্যান্ড ডিসমিসড!

ড. আবদুল আজিজ, ড. মফিজুল্লাহ কবির—এঁরা সবাই অধ্যাপক রাজ্জাকের ছাত্র। এঁদের সম্পর্কে আলাপে অধ্যাপক রাজ্জাক যেমন এদের গুণের কথা উল্লেখ করেন, তেমনি এদের দুর্বলতা ইত্যাদি ব্যাপারেও সকৌতুক মন্তব্য করতে ভালোবাসেন। ড. অজিজ আর ড. মফিজুল্লাহ কবিরের প্রসঙ্গে বলতে যেয়ে বললেন : ১৯৫৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে অ্যালসফ চলে যায়। আজিজ তখন লেকচারার। ভি.সি. মফিজুল্লাহ করিবকে ডিপার্টমেন্টের চার্জ দিল। কিন্তু এ দুজনার আর বনিবনা হয় না। কথাবার্তা হয় না। ডিপার্টমেন্টের কোনো মিটিং করা যায় না। আমি তখন প্ল্যানিং বোর্ডের মেম্বার। অনেক সময়ে আমার বোর্ডের কাজ রেখে এদের ঝগড়া মেটাতে আসতে হয়েছে। এখন, ড. আজিজকে ডিপার্টমেন্টের চার্জ দিতে হলে তাকে রিডার অন্তত করা দরকার। রিডার করার প্রশ্ন উঠলে দেখা গেল এক্সপার্টরা তার নাম রিকমেন্ড করে না। রিডারশিপের বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। এবার যে সিলেকশন কমিটি করা হল তাতে ড. মাহমুদ হোসেন এক্সপার্ট। আমি যখন করাচি গেলাম অন্য একটা কাজে তখন ড. মাহমুদ হোসেনের কাছে যেয়ে বললাম ; এইতো অবস্থা! আজিজও আপনার ছাত্র। মফিজুল্লাহ কবিরও আপনার ছাত্র। এখন মেহেরবানি করে দেখুন, আজিজকে কিছু করতে পারেন কি না। ড. মাহমুদ হোসেন কোনো কথা শুনতে চান না। আমি যেদিন মাহমুদ হোসেনের বাসায় সেদিন মুনীরও ওখানে বসা। মুনীর আমেরিকা থেকে ফিরেছে। আমি মাহমুদ হোসেনকে ভালো কইর‍্যা বুঝাইয়া কইলাম : আজিজ খুব ভালো। লিডেন (Leiden) থেকে একটা পি.এইচ. ডি পাইছে। মাহমুদ হোসেনের একটা কিউরিয়াস সেন্স অব হিউমার ছিল। আমি পি.এইচ.ডি বলাতে মাহমুদ হোসেন বলে উঠলেন : ইয়েস, পি.এইচ.ডি ইজ এ ভেরি গুড ডিগ্রি। ইট ইজ এ্যজ গুড এ্যজ এ্যন এম এ ফ্রম লন্ডন। এই বলে হেসে ফেলে বললেন : ইউ ফরগেট আমারও একটা কন্টিনেন্টাল ডিগ্রি আছে? আই নো দি ভ্যালু অব দিজ থিংস। তখন আমি আর কী কমু? আমি তবু বললাম : মফিজুল্লাহ কবিরও বলছে যে একটা রিডার কইরা দিলে যে অবস্থা চলছে, তার একটা সুরাহা হয়। মাহমুদ হোসেন বললেন : মফিজুল্লাহ কবির বলেছে নাকি। তার যদি বলে থাকে তবে আমি কোনো আপত্তি করবো না। এই কাহিনী বলে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এই তো মৌলবী আবদুল আজিজ।

কারোর দক্ষতা বা গুণাগুণ সম্পর্কে অধাপক রাজ্জাক হিউমার করতে চাইলে দেখছি বলে ওঠেন : এই তো মৌলবী ...।

আমি বললাম : স্যার, হামদুর রহমান কি আপনাকে একবার ডেকেছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হামুদর রহমান না, জেনকিনস।

আমরা যে শুনেছিলাম, হামুদর রহমানও একবার ডেকেছিলেন।

: হামুদর রহমানও একবার ডেকেছিলেন, স্টেটস-এ যাওয়ার আগে। কিন্তু মজা হইছিল জেনকিনস-এর সঙ্গে। কিন্তু সেটা আইজ না, বলে এদিনকার আলোচনা বন্ধ করে দিলেন।

পরের দিন জেনকিনস-এর কথা তুললাম। জেনকিনস সাহেব ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে পদার্থবিদ্যার প্রফেসর ছিলেন। তখন তিনি ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের সদস্য। পরে আবার এসেছিলেন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে। সে প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করলাম অধ্যাপক রাজ্জাককে : স্যার, জেনকিনস দ্বিতীয়বার কবে এলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : জেনকিনস এসেছিলেন সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন ভাইস চ্যান্সেলর পদ থেকে রিটায়ার করার পরে।

: কোন সালে?

অধাপক রাজ্জাক বললেন : এটা '৫৩-৫৪ তে হবে। ভাষা আন্দোলনের পরে। কারণ আমার মনে আছে, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি দিবসে, মানে 'মারটায়ারস ডে'তে শ্রদ্ধা জানানোর জন যে মিটিং হয়েছিল তাতে জেনকিনস প্রিসাইড করেছিলেন।

জেনকিসন-এর নাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে দেখা যায় সেই গোড়ার দিকে, ১০২১-২২-এ। তিনি আবার এলেন ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে ১৯৫৩-৫৪-তে। নিশ্চয়ই তখন অনেক বয়স হয়েছিল। এজন্যই আমি প্রশ্ন করলাম অধ্যাপক রাজ্জাককে : জেনকিনস সাহেবের তখন নিশ্চয়ই অনেক বয়স?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হ্যাঁ। তবু হি ওয়াজ এ্যাবসোল্যুটলি এ্যাক্টিভ। তারপর বললেন : হি হ্যাড অলমোস্ট গ্রানডিয়জ আইডিয়াজ অব ভাইস চ্যান্সেলরশিপ। ভাইস চ্যান্সেরশিপ সম্পর্কে তার একটা শাহী ভাব ছিল। এবং এখানে ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক যারা ছিলেন তাঁদের ওপরে সেগুলো তিনি বেশ সহজেই চাপিয়ে দিচ্ছিলেন। হিওয়াজ গেটিং এওয়ে উইথ দিজ আইডিয়াজ। দেখলাম যে তিনি ভি.সি হয়ে আসার পরে একজন একজন করে সকল শিক্ষককেই ডাকলেন পরিচিত এবং আলাপ আলোচনার জন্য। প্রত্যেকেরই করণীয়—অকরণীয় সম্পর্কে হি ওয়াজ অলনোস্ট লেইং ডাউন লজ। সেইভাবে আমারও ডাক পড়লো। আমি অবশ্য তাঁর এই কায়দা-কানুন সম্পর্কে আগেই শুনেছিলাম। এ্যান্ড আই ডিড নট ভেরি মাচ লাইক ইট? ভি.সি. অবশ্যই একজন 'গ্রেট ম্যান।' তবে ইউনিভার্সিটি টিচারদের কে কি করবে তা ইনডিভিজুয়াল টিচারদের নিজেদের ব্যাপার। তা কেউ একজন উপর থেকে ঠিক করে দেবে, এটা আমি পছন্দ করি নাই।

জেনকিনস সাহেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের আলাপটিও অধ্যাপক রাজ্জাক বেশ বিস্তারিতভাবে বললেন। এ আলাপও স্বাভাবিকভাবে ইংরেজিতে সম্পন্ন

হয়েছিল। বর্ণনাটি অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদের কাছে বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে দিচ্ছিলেন। তার আলাপে একদিকে যেমন ভি.সি. হিসেবে জেনকিনস সাহেবের একটি মুরব্বিয়ানা ছিল তেমনি তার জবাবে অধ্যাপক রাজ্জাকের তির্যক ভঙ্গিও প্রকাশ পাচ্ছিল।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমার সঙ্গে সাক্ষাত জেনকিনস সাহেব প্রথমে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার নাম কী, ধর্ম কী ইত্যাদি। তার কিছু পরে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কখনো বিদেশ গেছ নাকি? আমি সংক্ষেপে বললাম : হ্যাঁ, গেছি। তারপরে প্রশ্ন হল : কী করে আসছো, কতো বছর ছিলা? আমি বললাম : পাঁচ ছ'বছর।

: কি কইরা আসছো?

: ডিগ্রিকরবার গেছিলাম, ডিগ্রি হয় নাই।

: কেন হয় নাই?

আমি বললাম, এটা তো খুব সাধারণ কথা। এই ডিগ্রি করতে পুরা দুবছর লাগে না। আমার ছ'বছর পরেও ডিগ্রিটা হয় নাই। ইট মিয়ারলি মিনস, আই ওয়াজ নট গুড এনাফ ফর ইট। আমার কথা শুনে জেনকিনস বললেন : ওহ্! এই কথার মাঝখানে আমি জেনকিনসকে একবার বললাম : এই যে আপনি আমাকে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতে আছেন, ইট-সিমস্-এর জবাবগুলো আপনার সামনে লেখাই আছে। অধ্যাপক রাজ্জাক ব্যাপারটা আমাদের বুঝিয়ে বললেন : আমি দেখলাম ভি.সি. র সামনে একটা কাগজ লেখা আছে। সেটা দেখে দেখে সে আমাকে প্রশ্ন করছে। আমি তাই তাঁকে বললাম : আমি কোন সালে চাকরিতে ঢুকেছি, বিলেত গেছি কবে, করেছি না করেছি সবই তো আপনার সামনে আছে। তারপরেও আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আর ইউ ট্রাইয়িং টু ফাউন্ড আউট যে আমার জবাবগুলো ঠিক না বেঠিক হয়! আমার একথায় জেনকিনস ওয়াজ এ লিটন টেকেন এ্যাবাক। একটু হকচকিয়ে গেলেন। পরে বললেন, : ওহ্ নো, নো। আমি বললাম, তাহলে এগুলো জিজ্ঞেস করার তো কোনো সার্থকতা নাই। অন্যকিছু যদি জিজ্ঞেস করার থাকে তাহলে তাই জিজ্ঞেস করুন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার যে ডিগ্রি হয় নাই, আর ইউ কন্টেমপ্লেটিং টু কমপ্লিট ইট?

আমি বললাম : না।

: আর কিছু কাজ করতে আছ নাকি?

আমি বললাম, না, তাও কিছু করতে আছি না। তখন তিনি বললেন, দেখ, ইজ দ্যাট ভেরি ফেয়ার, আইদার টু ইউরসেল্‌ফ অব টু দি ইউনিভার্সিটি। এটা তোমার জন্য কিংবা ইউনিভার্সিটির জন্য কি ভালো? আমি বললাম : হোয়েদার ইট ইজ ফেরার টু মি. একথাটা আপনি আলোচনা নাই করলেন। দিস আই শ্যাল থিঙ্ক ফর মাইসেল্‌ফ। সো ফার এজ দি ইউনিভার্সিটি ইজ কনসার্নড, অই ডোন্ট

থিঙ্ক আই এ্যাম এ্যাট অল আনফেয়ার টু দি ইউনিভার্সিটি। আমি ১৯৩৬ সালে একটা কোয়ালিফিকেশনের ভিত্তিতে মাস্টারিতে নিযুক্ত হয়েছিলাম। ইউনিভার্সিটি সেদিন আমার সেই কোয়ালিফিকেশনটাকে যথেষ্ট বিবেচনা করেছিল। সিন্স দেন আমার এমন কিছু অবনতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। কোনো উন্নতিও আমার হয় নাই। আমার পদের কোনো উন্নতি ঘটে নাই। এখন আমি মনে করি ১৯৩৬ সালে যে চাকরি করতাম, দিস ইজ নট এনাফ ফর মি. আবার প্রোমোশন দরকার তাহলে আই শুড কাম ব্যাক উইথ এ্যাডিশনাল কোয়ালিফিকেশন। যে পর্যন্ত আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই সন্তুষ্ট, তখন আমার কোয়ালিফিকেশন নিয়া আর উচ্চবাচ্য কইরা লাভ কি? ইট ডাজ নট ইন্টাররেস্ট মি মাচ। এই নিয়ে আর কিছুক্ষণ মামুলি কথাবার্তা চললো। এই প্রথম জেনিকনস সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এবং আলাপ। হঠাৎ কিছুদিন পরে। আমার বছরটা মনে নাই। হয়তবা ১৯৫৫ হবে। মস্তবড় লম্বা সিল করা একটা চিঠি। খুলে দেখি, ভি.সি. ওয়ান্টস মি টু সি হিম ইমিডিয়েটলি। '৫৪ কি '৫৫-এর ডিসেম্বর। আমি চিঠি পেয়ে গেলাম। দেখলাম, জেনকিনস খুব গম্ভীর। যেতেই বললেন : তোমার এগেইনস্টে খুব সিরিয়াস কমপ্লেন। আমি বললাম, কী কমপ্লেন? জেনকিনস বললেন : একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু ...। আমি বললাম, শুনলে নিশ্চয়ই আই শ্যাল বি ইকয়েলি ইমপ্রেসড উইথ দি সিরিয়াসনেস অব ইট। এখনো তো আমি শুনলামনা ব্যাপারটা কী, চার্জটা কী? তখন জেনকিনস বললেন : তোমার হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট, ড. নিউম্যান হ্যাজ রিপোর্টেড এগেইনস্ট ইউ অন টু কাউন্টস। প্রথম কাউন্ট ... বলে জেনকিনস মাম্বলড, হি ডিড নট কুয়াইয়েট সে হোয়াট ইট ওয়াজ। আসলে নিউম্যান হ্যাড রিটেন টু সে, দ্যাট আই হ্যাড-ওয়ান্ডেড টু হুইপ হিম।

অধ্যাপক রাজ্জাকের এমন কথায় আমরাও হকচকিয়ে গেলাম। ভালো করে বোঝার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করলাম : আপনার বিরুদ্ধে কী লিখেছিলেন হিউম্যান?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আই হ্যাড ওয়ান্টেড টু হুইপ হিম। কথাটা জেনকিনস মুখে স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারছিলো না। ইট ওয়াজ সো ফ্যানটাস্টিক। যাই হোক একটা কোনো রকমে বলে তারপরে বললেন : এ্যান্ড সেকেন্ড ইজ, ইউ হ্যাভ কল্ড হিম এ লায়ার। তুমি তাকে মিথ্যেবাদী বলেছ। আমি বললাম, ইয়েস আই হ্যাভ কল্ড হিম এ লায়ার। জেনকিনস আমার কথা শুনে বললেন : ইউ এ্যাডমিট, ইউ হ্যাভ কল্ড হিম এ লায়ার। তুমি স্বীকার করছ তুমি তাকে মিথ্যেবাদী বলেছ? আমি বললাম, ইট উড বি ফুলিশ অব মি টু সো দ্যাট আই হ্যাভ নট। তাকে মিথ্যেবাদী বলি নাই, বলাটাই আমার বোকামি হবে। কারণ অনেক মানুষের সামনেই আমি তাকে মিথ্যেবাদী বলেছি। হ্যাঁ, আমি এটা বলেছি। আমার এ জবাব শুনে জেনকিনস আবার বললেন : ওহ্, ইউ এ্যাডমিট ইউ হ্যাভ কল্ড মিঃ নিউম্যান এ লায়ার! আমি বললাম, ইয়েস আই কল্ড হিম এ লায়ার। জেনকিনস বললেন, ইন দ্যাট কেস আই শুড সাসপেন্ড ইউ

ইমেডিয়েটলি। আমি বললাম : তা করছ্ না কেন? হোয়াট ডোন্ট ইউ। ইফ ইউ আর এ্যাবসোল্যুটলি ক্লিয়ার দ্যাট বাই কলিং মিঃ নিউম্যান এ লায়ার, আই হ্যাভ মেরিটেড সাসপেনশন, ইউ আর দেয়ার। আপনি করতে পারেন। আমার একথা শুনে জেনকিনস একটু থেমে বললেন, অফকোর্স দেয়ার আর আদার কনসিডারেশনস ... আমি বললাম ইফ ইউ থিঙ্ক দেয়ার আর আদার কনসিডারেশনস হুইচ ডু নট পারমিট ইউ টু সাসপেন্ড মি ইমিডিয়েটলি, লেট আস গো ইন টু দোজ আদার কনসিডারেশনস। সেই আদার কনসিডারেশনসগুলো কী? জেনকিনস তখন আমতা আমতা করে বললেন : দ্যাখো ... তাঁকে বললাম, ইট ইজ এ্যাবসোল্যুটলি ট্রু দ্যাট আই হ্যাভ কল্ড ড. নিউম্যান এ লায়ার। আই হ্যাভ কল্ড হিম এ লায়ার, বিকজ হি ইজ এ লায়ার। এর মধ্যে আর কোনো অস্পষ্টতা নাই। তখন জেনকিনস একেবারে সব ঘুরিয়ে বললেন : দ্যাখো রাজ্জাক, ইউ মে নট থিঙ্ক দ্যাট আই এ্যাম ওয়াইজার দ্যান ইউ, কিন্তু এটা তো তুমি আমাকে নিশ্চয়ই কনসিড্ করবা যে আই এ্যাম ওলডার দ্যান ইউ। এ্যান্ড আই হ্যাভ এ সাজেশন টু মেইক। যদি তুমি নিউম্যানকে মিথ্যাবাদী বলে থাকো, যে অবস্থাতেই বলো না কেন, তুমি যখন ফ্যাকাল্টির একজন মেম্বার, তখন তোমার প্রথম কর্তব্য হইল টু এ্যাপোলজাইস টু হিম আনকন্ডিশনালি। এান্ড আই শ্যাল নট হিয়ার এনি আরগুমেন্ট এবাউট ইট ফ্রম ইউ। এ সম্পর্কে তোমার আর কোনো কথা আমি শুনব না। তুমি আমাকে এখানে বলবে যে, ইউ আর রেডি এ্যাপোলজাইস টু হিম। তারপরে অন্য কথা হবে। এইভাবে তিনি বেশ গুছিয়ে জোরের সঙ্গে কথাটা বললেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাভ ইউ ফিনিশড হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড টু সে, তোমার যা বলার ছিল তা শেষ হয়েছে?

জেনকিনস বললেন, ইয়েস। এখন তুমি আমাকে বল ... আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, না, আমি তোমার প্রস্তাবের মেরিট সম্পর্কে কিছু বলছিনা। বাট দেয়ার ইজ জাস্ট এ লিটল কোয়েশ্চেন অব ফ্যাক্ট আই এ্যাম ইন্টারেস্টেড টু হিয়ার এবাউট। জেনকিনস বললেন : হোয়াট ইজ দ্যাট? আই উড নট ডিসকাস দি মেরিট অব দি সাজেশন। আমি বললাম, না তা নয়। আমি তোমার প্রস্তাব ঠিক বুঝতে পেরেছি। অন্য একটা ব্যাপার। জেনকিনস বললেন : কী? আমি তখন বললাম : দেখ, দিস ইনসিডেন্ট টুক প্লেস সাম এইট অর নাইন ডেজ এগো। ইউ আর মেকিং দি সাজেশন অন দি নাইনথ ডে। আট ন'দিন অগে এই ঘটনা ঘটেছে। আজ নবম দিনে তুমি আমাকে এই প্রস্তাব দিচ্ছ। কিন্তু এই ইনসিডেন্টের পরে ঐ দিনই উই স্যাট টুগেদার ইন এ মিটিং অব দি ডিপার্টমেন্টেস কমিটি অব কোর্সেস। কুয়ায়েট এ ফিউ টিচার্স অব দি ডিপার্মেন্ট এ্যান্ড সাম ফ্রম আউটসাইড দি ইউনিভার্সিটি ওয়েয়ার প্রেসেন্ট। দে ওয়েয়ার নট, এনি অব দেম, উইটনেস টু দি ইনসিডেন্ট যার শেষ অবস্থায় আই কল্ড মিঃ নিউম্যান এ লায়ার। এ ঘটনায় এরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তবু এই মিটিংয়ের শেষেই আমি নিউম্যানকে

বলি, দেখ দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা আগে দেয়ার ওয়াজ সাম এ্যামাউন্ট অব আনপ্লেস্যান্টনেস বিটুইন ইউ এ্যান্ড আই। হোয়াটেভার মে হ্যাভ বিন দি মেরিট অব দি ইনসিডেন্ট, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করি, আই শুড হ্যাভ টক্ড টু ইউ ইন মি ম্যানার দ্যাট আই ডিড। তোমার সঙ্গে আমার ওভাবে কথা বলা উচিত হয় নাই। আমি আশা করেছিলাম নিউম্যানও ব্যাপারটাতে দুঃখ প্রকাশ করবে। বাট মিঃ নিউম্যান ডিড নট। আমি জেনকিনসকে বললাম কাজেই আই হ্যাড এক্সপ্রেসড মাই রিগ্রেট অলমোস্ট এ্যাট দি টাইম অব দি ইনসিডেন্ট। আমার একথা শুনে জেনকিনস ওয়াজ কমপ্লিটলি টেকেন এ্যাবাক। আমার একথায় জেনকিনস একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন : ডু ইউ রিয়েলি মিন টু সে দ্যাট ইউ সেইড, ইউ ওয়েয়ার সরি। তুমি দুঃখিত, একথা তাকে বলেছ? বাট হি হ্যাজ নট মেনশন্ড ইট ইন হিজ লেটার। আমি বললাম : আই নেভার এক্সপেকটেড হিম টু মেনশন ইট। বাট দিস ইজ এ ফ্যাক্ট এ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ এ ডজন অব পিপল দেয়ার এবাউট হু ওয়ান্টেড টু নো হোয়াট হ্যাপেন্ড। আরো লোক ছিল, তারা ব্যাপারটা কি জানতে চেয়েছিলো। অমি তাদের বলেছি, তা শোনার দরকার নাই। দেয়ার ওয়াজ সাম এ্যামাউন্ট অব আনপ্লেস্যান্টনেস এ্যান্ড আই এ্যাম সরি অভার ইট। আই শুড নট হ্যাভ লস্ট মাই টেম্পার। একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। আমি দুঃখিত। আমার মেজাজ নষ্ট করা উচিত হয় নাই। তখন জেনকিনস একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি যদি দুঃখ প্রকাশ করে থাকো তাহলে সে কথাটা আমার কাছে লিখে দিতে তোমার আপত্তি আছে? একথা শুনে আমি হেসে বললাম, ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডিকটেট্ দি ওয়ার্ডস ইন হুইচ ইট শুড বি রিটেন। কাগজে-কলমে লিখতে আমার আপত্তি হবে কেন। আমি তো দুঃখ প্রকাশ করেছি। ইট মে বি. দি ল্যাংগয়েজ উড বি ইনফিনিটলি ইমপ্রুভ্ড ইফ ইউ ডু দি ডিকটেটিং। হতে পারে তুমি ডিকটেশন দিলে ভাষাটা খুবই উন্নত ধরনের হবে। তখন জেনকিনস বললেন না, না, তার কোনো দরকার নাই। আমি শুধু ব্যাপারটা লিখিতভাবে রাখতে চাচ্ছি। ফর, আই এ্যাম সারপ্রাইজ্ড দ্যাট ড. নিউম্যান ডিড নট মেনশন ইট ... এইভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টা দুঘণ্টা যাবৎ কথাবার্তা চললো। আমি বললাম : আমি এখানেই লিখে দিই। জেনকিনস বললেন না, না তুমি বাসায় যেয়ে লিখে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিও। ... আমি তো চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। তার বার চৌদ্দদিন পরে জেনকিনস আবার আমারে ডাকাইল : দ্যাখো রাজ্জাক, আই হ্যাভ থট ওভার ইট এ্যান্ড কনসাল্টেড আদারস অন দি ম্যাটার। উই আর অল এ্যগ্রিড যে তুমি আর নিউম্যান এক ডিপার্টমেন্টে থাকলে কাজ চলবে না। তাই আমার প্রস্তাব, এ্যান্ড দিস ইজ অলসো দি সাজেশন আব এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল দ্যাট ইউ টু দি ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস। জেনকিনস-এর এই প্রস্তাব শুনে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। আমি বললাম, এটা কেমন কথা? অবভিয়াসলী মিঃ নিউম্যান হ্যাড এ গ্রিভ্যান্স এগেইনস্ট

মি। তুমি তার ভালোমন্দের মধ্যে যেতে চাও না। কিন্তু এখন এমন এক প্রস্তাব করছ যার অর্থ হচ্ছে আমিই অপরাধী। আই এ্যাম নট এ্যাট অল এ্যাগরিয়েবল টু এনি সাচ কোর্স। আমি এরূপ কোনো ব্যবস্থায় রাজি না। নিউম্যান তোমার কাছে অভিযোগ করেছে আমার বিরুদ্ধে। সে বিচার চায়। তুমি বিচার করো। বিচারের শেষে যদি এটা প্রতিপন্ন হয় যে, আই ওয়াজ গিল্টি অব দিস অর দ্যাট, তার জন্য যে শাস্তি হয় আমি তা এ্যাকসেপ্ট করব। তার জন্য আই শ্যাল নট আস্ক এনি ফেভার ফ্রম দি ইউনিভার্সিটি। আর যদি প্রমাণ হয়, আমি দোষী না, তাহলে আই শ্যাল একসপেকট দি ইউনিভার্সিটি টু এ্যাক্ট অন দ্যাট অলসো। জেনকিনস আমার কথায় বললেন : নো, নো, দিস ইজ অল উই হ্যাভ ডিসাইডেড। আমরা এটা ঠিক করেছি। আমি বললাম, তুমি ভি.সি.। আনডাউটেড্লি ইউ আর পাওয়ারফুল, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ইউর পাওয়ার এক্সটেন্ডস টু দ্যাট। তোমার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তার বিস্তার অতদূর বলে আমি মনে করি না। আপনারা কী ডিসাইড করেছেন দ্যাট ইজ ও ম্যাটার এ্যাবসোল্যুটলি অব ইন্ডিফারেন্স টু মি। আই এ্যাম নট এ্যাট অল এ্যাগ্রিয়েবল ... আমাকে থামিয়ে দিয়ে জেনকিনস বললেন : ওহ্ দিস ইজ নট রাইট, না, এটা ঠিক নয়। আমি বললাম : ঐ ধরনের কথা তো উঠেই না। দেয়ার ইজ এ কমপ্লেইন্ট এগেইনস্ট মি। ইউ মেইক এনকুয়েরি। মেইক ইট এ্যাজ রিগোরাস এ্যাজ ইউ লাইক দেন অন দি ফাইন্ডিংস অব ইট, টেইক ডিসিশন। আপনারা বিচার করে ডিসিশন নেন। এতে আপনাদের অসুবিধা কি? আমার জবাবে জেনকিনস তবু বলতে থাকেন : নো, দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ ডিসাইডেড ফ্রম দি ইন্টারেস্ট অব ইউনিভার্সিটি। আমি বললাম : আই এ্যাম নট এট অল পারসুয়েডেড। ইউ হ্যাভ এন্টারপ্রাইন্ড এ কমপ্লেইড এগেইনস্ট মি। এখন তোমরা সামারি জাজমেন্ট দিচ্ছ, যাতে আমিই ভিক্টিমাইজড হচ্ছি। জেনকিনস তবু বলতে লাগলেন : আই এ্যাম নট টেকিং ইউর এ্যানসার। আই ওয়ান্ট ইউ টু রিকনসিডার। আই থিঙ্ক, ইউ আর হ্যাস্টি।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ব্যাপারটা সেদিন ওখানে এইভাবে শেষ হয়। তারপর প্রায় ৮-৯ মাস যাবৎ ভি.সি. এটা নিয়ে বারংবার বলার চেষ্টা করেছেন। আমাকে ডাকিয়েছেনও। এর মধ্যে একদিন আখতার হামিদ সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি ইউনিভার্সিটির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার। আমার সাথে দেখা হওয়াতে এই নিউম্যানের প্রসঙ্গে বললেন : 'দেখ রাজ্জাক, আমি যদি ভি.সি. হতাম তাহলে আমি তোমাকে আউটরাইট ডিসমিস করতাম। আমি বললাম কেন? আখতার হামিদ বললেন, 'বিকজ ভি.সি. হ্যাজ গিভেন এ্যান অর্ডার এ্যান্ড ইউ ডিসওবেড্। তুমি ভি.সি.-র আদেশ অমান্য করেছ। আমি বললাম, ভি.সি. হ্যাজ নো রাইট টু গিভ অর্ডার এ্যাবাউট চেইঞ্জের ইন দি ডিপার্টমেন্ট। আমার চাকরি একটা 'কন্ট্রাক্ট ব্যাসিস'এ। দিস কন্ট্রাক্ট স্টিপুলেটস দ্যাট আই এ্যাম টু ওয়ার্ক ইন দি ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্যাল সায়েন্স। ভি.সি. অব এনিবোডি এল্স হ্যাজ নো

রাইট টু ডু এনিথিং এ্যাবাউট চেঞ্জিং মাই ডিপার্টমেন্ট। চুক্তির ভিত্তিতে আমার চাকরি। আমার চাকরির স্থান বা বিভাগে পরিবর্তনের এখতিয়ার কারুর নাই। আমার এমন জবাবে আখতার হামিদ বললেন : জান, আমি হাইকোর্টে থাকলে আজ চিফ জাস্টিস হতাম। আমি তোমাকে বলছি, ল ইজ নট এ্যাজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। ল ইজ এগেইনস্ট ইউ। আইন তোমার বিরুদ্ধে। আমি ঠাট্টা করে বললাম, চিফ জাস্টিস হলেও তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু যে আশা করার নাই তা আমি বুঝি। টেক ইট ফ্রম মি দ্যাট ভি.সি হ্যাজ এ্যাবসোল্যুটলি নো অথরিটি ইন দি ম্যাটার। তখনি কথায় কথায় আমি বললাম : বেশ আমি জেনকিসনকে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করি : হ্যাভ ইউ গিভেন মি এ্যান অর্ডার হুইচ আই, ডিসওবেড্? আখতার হামিদ বললেন : হ্যাঁ, লেখ। তখন যেখানে আলাপ হচ্ছিল সেখানে বসেই ভি.সি'কে একটা চিঠি লিখলাম। আর অলমোস্ট উইথইন হাফ এ্যান আওয়ার দেয়ার কেইম এ রিপ্লাই : 'অফকোর্স ইট ওয়াজ নট এ্যান অর্ডার। আই এ্যাম ফুললি এ্যাওয়ার দ্যাট আই এ্যাম নট এন্টাইটলড টু গিভ এ্যানি অর্ডার। দিস ওয়াজ এ সাজেশন হুইচ ইউ ওয়্যার ফ্রি টু টেক, আর নট টু টেক। আমি আখতার হামিদকে চিঠিটা দেখিয়ে বললাম : তোমরা আমাকে অর্ডারটা কেমন করে দিবে? ... এমনিভাবে চলছে। হঠাৎ আবার চিঠি ভি.সি.'র কাছ থেকে : আমার ধারণা তোমার ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এ যাওয়া উচিত। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এ্যগরিস উইথ মি। আই এ্যাম রিকোয়েস্টিং ইউ এ্যগেইন। যদি তুমি না যাও, উই শ্যাল একসপেকট ইউ টু রিজাইন। প্লিজ লেট মি নো হোয়াট ইউ ডিসাইড। আমি এ চিঠির জবাবে বললাম : আমি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ডিপার্টমেন্টে যাব না। রেগিনেশনের ব্যাপারে কিছু আমার জবাবে লিখলাম না। তার জবাবে জেনকিনস চিঠি দিল : তুমি যেহেতু আমাকে জানাচ্ছ না তুমি পদত্যাগ করবে কি না, সেজন্য আই এ্যাম রিকোয়েস্টিং ইউ নট টু টেইক এ্যনিমোর ক্লাস এ্যাট দি মোমেন্ট ইন দি ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্যাল সায়েন্স। জেনকিনস-এর এই চিঠি পাওয়ার আগেই নিউম্যান আমাকে ডেকে বললো, ভি.সি. হ্যাজ আস্কড মি টু টেল ইউ দ্যাট ইউ আর নট টু টেইক এ্যনিমোর ক্লাস। ভি. সি. বলেছে তুমি আর কোনো ক্লাস নিবে না। মজা হল, নিউম্যান আমাকে একথা বললো ভি.সি.'র চিঠির জবাব আমার তরফ থেকে যাওয়ার আগে। আমি এটা উল্লেখ করেই ভি.সি'কে লিখলাম, আমি আমার চিঠিতে রিজাইন করবো কি করবো না, এ বিষয়ে কিছু না লেখার জন্যই তুমি আমাকে ক্লাস না নিতে বলছো। কিন্তু তোমার এই চিঠি পাওয়ার পূর্বেই আই লারন্ট্ অব দিস ডিসিশন ফ্রম মিঃ নিউম্যান। কাজেই আমার চিঠির পূর্বেই তোমার সিদ্ধান্ত তুমি গ্রহণ করেছ। ... তারপর আরো মাস দুই এভাবে চললো।

ফজলে রাব্বি অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেসকরলেন : আপনি কি এই সময়ে কোনো ক্লাস নিচ্ছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : না, আমি ক্লাস নিচ্ছি না। তিন চার মাস কোনো কিছু আমাকে করতে হল না। ভি.সি. ওয়াজ নট রেডি টু সাসপেন্ড অব ডিসমিস মি। হি হ্যাজ ওনলি আস্কড মি নট টেইক এ্যনি ক্লাস। আমাকে কোনো ক্লাস না নিতে বলেছেন। এতে আমার আপত্তির কি থাকতে পারে। আমি মনে মনে বললাম : ভালো ব্যবস্থাই। আমি আমার পড়াশোনা করি। শেষে ভি.সি. আমাকে আবার ডাকাল। ডাকিয়ে বললো : ইউ আর কমপেলিং মি টু পুট দি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, দ্যাট প্রসিডিংস বি সেট ইন মোশন টু রিমভ ইউ ফ্রম দি সারভিসেস। তোমাকে ইউনিভার্সিটি থেকে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে। সেটা ঠিক না। আই উড লাইক ইউ টু এ্যগরি টু হোয়াট আই এ্যাম সেয়িং। তুমি আমার কথায় রাজি হও। আমি সেদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম জেনকিনসকে : সাপোজ ইউ ওয়েয়ার ইন মাই পজিশন। আমার জায়গায় থাকলে তুমি যে প্রস্তাব আমাকে দিচ্ছ সে প্রস্তাব নিজে গ্রহণ করতে? ইফ ইউ টেল মি. ইউ উড হ্যাভ ডান ইট, আই উড কনসিডার ... তা নাহলে ইউ ডোন্ট আস্ক মি টু এ্যাক্ট অন ইওর এ্যাডভাইস, তা নাহলে আমাকে একথা বলো না। আমার এ প্রশ্ন শুনে জেনকিনস চুপ করে গেলেন। একেবারে কোনো কথা না। টেবিলের এক পাশে সে, এক পাশে আমি। কযেক মিনিট পরে আবার বললেন : মিঃ রাজ্জাক টেক ইউ এ্যাজ এ রিকোয়েস্ট ফ্রম মি। আমার বয়স বেশি। আমি তোমাকে আবার বলছি, তুমি যদি এটা এ্যাক্সেন্ট করো তাহলে এক্সিউটিভ কাউন্সিলে থিংস উড বি মাচ সিমপ্লিফাউড। আমি তাঁর কথা শুনে আবার বললাম : ইফ ইউ ক্যান টেল মি, দ্যাট ইন মাই সিচুয়েশন ইউ উড হ্যাভ ডান ইট, তাহলে আমি অবশ্যই তোমার এ্যাডভাইস মতো কাজ করবো। এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা গেল। এই দুই বাক্যই রিপিটেড হল। জেনকিনস একবার তার বাক্য বলে, আমি আমার বাক্য বলি। তারপরে জেনকিনস বললেন : আই এ্যাম ভেরে সরি, মিঃ রাজ্জাক। আই থিঙ্ক আই শ্যাল হ্যাভ টু ড্র প্রসিডিংস এগেইনস্ট ইউ। তোমার বিরুদ্ধে আমার ব্যবস্থা নিতে হবে। তার এই কথা শুনে আমি বিদায় হয়ে গেলাম। এর কয়েকদিন পরে ভি.সি.'র চিঠি পেলাম : শোকজ হোয়াট ইউ শুড নট বি রিমুভ্‌ড ফ্রম সারভিসেস ফর কলিং নিউম্যান এ লায়ার। আর কোনো চার্জ না।

পঙ্কজ ঘোষ তখনো এখানে আছেন। আমি তার কাছে যেয়ে সব ব্যাপারটা বললাম। তাদেরকে শোকজ নোটিশটা দেখলাম। সে শুনেই হেসে দিল : এটা কোন চার্জ হয় নাকি? তখন সে নিজে একটা জবাব তৈরি করে দিল। এই জবাব আমি ভাইস চ্যান্সেলরকে পাঠিয়ে দিলাম। জেনকিস এই জবাব পাইয়াই বুঝলো, ইট হ্যাজ বিন ড্রাফটেড বাই এ ল'ইয়ার। তখন জেনকিনস ড. মমতাজউদ্দিনকে আমার কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলো : ডাজ হি মিন টু গো টু দি কোর্ট অব ল'? ড. মমতাজ বললেন : অফকোর্স হি উইল গো টু দি কোর্ট। একথা শুনে

জেনকিনস বললেন : ওহ্! দিস ইজ নট রাইট, দিস ইজ নট রাইট। তারপরে ড. মমতাজ আমাদের এক কলিগের মারফত আমাকে বলে পাঠালেন যে জেনকিনস বলেছেন, আমার এ নিয়ে কোর্টে যাওয়া উচিত না। জেনকিনসের কথা হল : মিঃ রাজ্জাক তো ইউনিভার্সিটির গুড নেইম ইত্যাদি নিয়ে সবসময় কথা বলে। আস্ক হিম ওনলি দিস, ইফ দি ভি.সি. অব ই.সি হ্যাজ মেইড এ মিস্টেক, এটা চ্যালেঞ্জ করে পাবলিকলি যদি সে এস্টাবলিশ করে যে ইউনিভার্সিটি ওয়াজ নট রাইট, তাতে ইউনিভার্সিটির কি কোনো ভালো হবে? আমি একথা শুনে আমার সহকর্মীকে বললাম : এটা একটা কথা বটে। তবে আমি এমন ইমপ্রেশন দিতে পারি না যে এদের এইসব হুমকিতে আমি শঙ্কিত হইয়া মাফ চাইতেছি। হয় জেনকিনস আমাকে চিঠি লিখে বলুক যে এই তার মনোভাব, অথবা আমি তোমার উল্লেখ করে তাকে লিখে পাঠাই যে সে তোমার মারফত একথা আমাকে বলে পাঠিয়েছে। আমি দেখলাম আমার এ প্রস্তাবে আমার সহকর্মী রাজি নয়। সে তার নাম লিখিতভাবে উল্লিখিত হওয়াতে রাজি নয়। তখন আমি তাকে বললাম, তাহলে আমারও কিছু করণীয় নাই। কারণ, পরে জেনকিনস এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে বলবে যে আমি কান্নাকাটি করেছি আর ইসি সেজন্য মাফ করে দিছে—এতে আমি রাজি না।

ব্যাপারটার কীভাবে ফয়সালা ঘটেছিলো, কীভাবে কিছুদিনের জন্য অধ্যাপক রাজ্জাক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ছেড়ে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স বিভাগে চলে গিয়েছিলেন তার বিবরণ দিয়ে বললেন, যে তিন-চারদিন পরে ঐ একই কথা জেনকিনস ইন্টারশ্যানাল রিলেশন্সের হেড মিস আলসফের মাধ্যমে আমাকে জানায়। আমি মিস আলসফকেও ঐ একই প্রস্তাব দিই। আমি বলি যে জেনকিনস আমাকে না লিখলেও আমি মিস আলসফের উল্লেখ করে ভি.সিকে লিখতে পারি। তাতে মিস আলসফ বললেন : অফকোর্স ইউ ক্যান রাইট ইট। হি হ্যাজ টোল্ড মি দিস। তখন আমি জেনকিসনকে লিখলাম, যেহেতু তুমি আমাকে বলছো ... ইত্যাদি। মোটের ওপর দোষটা ইউনিভার্সিটির তৎকালীন কর্তৃপক্ষেরই ছিল, আমার না। সেইদিন অথবা পরের দিনই আমি চিঠি পেলাম, দ্যাট দি ভি.সি. ইজ প্লিজড টু ট্রান্সফার দি সার্ভিসেস অব মিঃ আবদুর রাজ্জাক টু দি ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স। আর কোনো কথার উল্লেখ নাই। এছাড়া নিজে আমাকে ডেকেও পাঠাল এবং বললো : আই এ্যাম ভেরি হ্যাপি দ্যাট ইউ হ্যাভ এ্যাগরিড টু দিস। আই হ্যাভ মেইড আপ মাই মাইন্ড। দেয়ার শুড বি থরো ইনকোয়ায়ারি। তাছাড়া এইবার বোঝা গেল আমার বিরুদ্ধে তারা যে নোটিশ দিয়েছিল তার আইনগত দিক নিয়েও তাঁরা আলোচনা করে বুঝেছে যে, তাদের অবস্থা ভালো নয়। এলিস সাহেব তখন ঢাকা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস এবং ইউনিভার্সিটির ই.সি.র'ও মেম্বার। জেনকিনস আমাকে বললেন : আই হ্যাভ কনসাল্টেড এলিস।

হি অলসো থিঙ্কস, দেয়ার শুড বি ইনকোয়ায়ারি এ্যান্ড মিঃ নিউম্যান ইজ নট এ সুটেবল পারসন ফর দি ইউনিভার্সিটি। তারপরে আবার বললেন : আর এটা এ্যাবসোল্যুটলি টেমপোরারি এ্যরেঞ্জমেন্ট। আই হোপ ইউ উইল বি ব্যাক টু ইওর প্যারেন্ট ডিপার্টমেন্ট ইন নো টাইম। তোমাকে আবার তোমার ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু ওর কয়েক সপ্তাহ পরে শুনলাম যে, ইনকোয়ায়ারি এ্যগেনস্ট মিঃ নিউম্যান হ্যাজ বিন ড্রপড। আই ওয়াজ কমপ্লিটলি মিসটিফাউড। এটা রহস্যজনক মনে হল। কিন্তুএতদিনে আমিও একেবারে বিরক্ত হয়ে গেছি। আই ওয়াজ আটারলি ডিসগাস্টেড। তখন প্রায় এক বছর হইতে চলছে—এই ব্যাপারে টানাহেঁচড়া চলছে। এ নিয়ে আর কিছু হল না। আমার এ্যাগেইনস্টে ইনকোয়ায়ারি ফরমালি উইথড্র করলো না। মোস্ট প্রোবাবলি ইট ইজ স্টিল পেন্ডিং। এই কথা বলে অধ্যাপক রাজ্জাক হেসে উঠলেন।

জেনকিনস ইউনিভার্সিটি থেকে চলে যান '৫৫ সালে। তাঁর চলে যাওয়ার কিছু আগে জেনকিনস সাহেবের সঙ্গে অধ্যাপক রাজ্জাকের আবার কিছু আলাপ হয়েছিল। সেখানে জেনকিনস সাহেবের নিজের কিছু স্বীকারোক্তি ছিল। অধ্যাপক রাজ্জাক সেই আলাপটির কথাও বর্ণনা করলেন। এ আলাপটি উঠেছিলো ঢাকা ক্লাবে অনুষ্ঠিত একটি সংর্বনা আয়োজনে। আয়োজনটা ছিল তখনকার পাকিস্তান প্লানিং কমিশনের চেয়ারম্যান জাহিদ হোসেনের ঢাকা আগমন উপলক্ষে। অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ঐ পার্টিতে দেখলাম জেনকিনস বারেবারে আমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাচ্ছে। তবে আমার নিজে থেকে আলাপের খুব আগ্রহ ছিল না। হঠাৎ জেনকিনস আমাকে একবার ধরে বললেন, ওয়েল মিঃ রাজ্জাক, তুমি তো আজকাল আমার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করো না। আমি বললাম : দেখা-সাক্ষাৎ তো তোমার সঙ্গে আমার ১৫-২০ বার হয়েছে। প্রত্যেকবারই ইউ আস্কড মি টু সি ইউ, এ্যান্ড ওয়েন্ট টু সি ইউ। আজ বলে আমার কী করতে হবে। আজকাল ইউ ডোন্ট আস্ক মি টু সি ইউ এ্যান্ড আই ডোন্ট সি ইউ। তুমি আজকাল আমাকে আর দেখা করতে হুকুম করো না, আর আমিও তাই দেখা করি না। তাতে জেনকিন বললেন : না, না, সে রকম নয়। আই উড লাইক টু হ্যাভ এ টক উইথ ইউ। আমি বললাম : দেখ, আমি একজন লেকচারার ক্লাস-টু, তুমি ভি.সি.। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সোশাল রিলেশন নাই। যেদিন হুকুম করবা, সেদিন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো, এ্যাজ আই এ্যাম ডিউটি বাউন্ড টু ডু ইট। আদারওয়াইজ আই ক্যান নট ভিসুয়ালাইজ মাই সিইং ইউ এ্যাজ এ সোশাল বিইং। আমার কথায় তো জেনকিনস খুব 'নো' 'নো' করতে লাগলেন। আমি বললাম, আমি তাই মনে করি। তখন জেনকিনস বললেন : ইফ ইউ লাইক দ্যাট ওয়ে, টেক ইট দ্যাট, আই এ্যাম আস্কিং ইউ টু সি মি। তুমি কাল সকালে আমার অফিসে সি মিঃ জামান। হি উইল ফিক্স এ্যান এ্যাপয়েন্টমেন্ট ফর ইউ। যাই

হোক আমি আর তাতে না করলাম না। পরদিন সকালে ভি.সির সেক্রেটারি জামানের কাছে যেতেই জামান বললো : রাজ্জাক ভাই, কি ব্যাপার! জেনকিনস সাহেব সকালে উঠে প্রথমেই বলেছে আপনর জন্য সাক্ষাতের সময় ঠিক করতে। আমি জামানকে বললাম, এমনি দেখা করতে এসেছি। জামান একদিন কি দুদিন পরে সাক্ষাতের একটা সময় করে দিল। সাক্ষাতের দিন যেতেই জেনকিনস বললেন : আমি তোমাকে একটা পার্টিকুলার কারণে আসতে বলেছি। আমি বললাম : কী কারণ? জেনকিনস বললেন : দেখো, তুমি হয়ত মনে করো আমি তোমার ওপর খুব অন্যায় করেছি। দেয়ার ওয়াজ এ প্রোট্রাক্টেড ইনকোয়ায়ারি ওভার ইউ। বাট আই হ্যাভ বিন ভেরি হ্যাপি ওভার দি ম্যাটার। আই হ্যাভ গিভেন ইউ সাম আন্ডারস্টাডিং, হুইচ আই হ্যাভ নট বিন এবল টু কিপ। আমি সেটা রাখতে পারি নাই। বাট বিলিভ মি। এটা আমার সাধ্যের অতীত ছিল। তোমার বিরুদ্ধে কোনো পরসনাল এনিমাস নিয়ে আমি কিছু করি নাই। আই ওয়ান্ট ইউ টু আন্ডারস্টান্ড দিস। আমি বললাম : আমি তো কোনদিন মনে করি নাই যে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন গ্রিভ্যান্স ছিল। ইউ নো মি এনাফ। হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়াজ দিস দ্যাট ইউ এ্যান্ড আই ডিফার্ভ অন এ ম্যাটার। এ্যান্ড ইউ হ্যাপেন্ড টু বি অন দি রাইট সাইড অব দি গান, এ্যান্ড আই হ্যাপেন্ড টু বি অন দি রং এন্ড। সি ম্যাটার এন্ডস দেয়ার ... তোমার পজিশনটা সুবিধাজনক। আমারটা না। এ ব্যাপারের আর কি থাকে। আমার কথায় জেনকিনস আবার বললেন : আই ওয়ান্ট ইউ ওনলি টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে, তোমার বিরুদ্ধে আমি কোন রকম এনিমাস নিয়ে কিছু করি নাই। তারপরে একটু থেমে হি পেইড ভেরি হাই কমপ্লিমেন্টস টু মি। জেনকিনস বললেন : এই ভারতবর্ষে, বেঙ্গলে, আই হ্যাভ স্পেন্ট অলমোস্ট এ লাইফটাইম। আই হ্যাভ রিয়েল লাভ ভর ঢাকা। আই মেট মেনি পারসনস ওভার অল দিজ ইয়ারস এবং এদের মধ্যে অনেকের সম্পর্কেই আমার ভালো ধারণা আছে। মোস্ট প্রোবাবলি আই হ্যাভ দি হাইয়েস্ট রেসপেকট্ ফর ইউ। আই ওয়ান্ট ইউ টু আন্ডারস্টান্ড, ইফ সারকামস্ট্যান্সেস কমপেল্ড মি ডু থিংস হুইচ হার্ট ইউ, আই হ্যাড নো কন্ট্রোল ওভার সারটেইন সারকামস্ট্যান্সেস। আই স্টিল মেইন্টেইন, ইজ ওয়াজ মাই প্রিভিলেজ টু হ্যাভ নোন ইউ। জেনকিনস-এর কথার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। তার এ আন্তরিকতা আমাকেও বেশ টাচ করেছিল। আসলে তার আলাপে যে একটা আফসোসের ভাব ছিল তার একটা কারণও ছিল। সেদিনই কাগজে বেরিয়েছে যে জেনকিনস ইজ লিভিং দি ইউনিভার্সিটি এ্যান্ড জুবেরী ইজ কামিং এ্যাজ ভাইস চ্যান্সেলর। সেই খবরের তিনি উল্লেখ করলেন না। তবু বললেন, দেখ আমি হয়ত ঢাকা ছেড়ে যাব শিগগির এবং আর কোনোদিন এই দেশে আসবো, তা মনে করি না। তুমি তো এখনো কমপ্যারেটিভলি ইয়ং। ইট ইজ পসিবল দ্যাট ইউ উড গো টু ইংল্যান্ড। যে

সময়েই তুমি যাও, তুমি আগে আমাকে জানাবে, এ্যান্ড ইউ উইল স্টে উইথ মি। দিস ইজ হোয়াট বোথ মিসেস জেনকিনস এ্যান্ড আই উইশ ... এই ধরনের কথা জেনকিনস আমকে সেদিন বললেন। এরপরে আমি বললাম, আমি কাগজে দেখলাম, ইউ আর লিভিং দি ইউনিভার্সিটি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর রিয়েলি লিভিং দি ইউনিভার্সিটি? আমি দেখলাম আমার একথা শুনে বুড়ো ইমোশনে একেবারে ভেঙে পড়লেন। বলতে লাগলেন : ডু ইউ নো মিঃ রাজ্জাক, ডু ইউ নো মিঃ রাজ্জাক।, ওনলি এ ফিউ ডেজ এ্যাগো আই ওয়েন্ট টু সি মাই ওল্ড চিফ। অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বললেন, জেনকিনস তার ওল্ড চিফ বলতে ফজলুল হক সাহেবকে বুঝাচ্ছিলেন। ফজলুল হক সাহেব তখন গভর্নর। কিন্তু অবিভক্ত বাংলাতেও ফজলুল হক সাহেব যখন মন্ত্রী তখনো তাঁর অধীনে জেনকিনস কাজ করেছেন। তাই তার 'ওল্ড চিফ'-এর উল্লেখ করে বলতে লাগলেন : এ ফিউ ডেজ এ্যাগো আই ওয়েন্ট টু সি মাই ওল্ড চিফ। আই হ্যাভ টোল্ড হিম দ্যাট আই হ্যাভ গ্রোন ওল্ড এ্যান্ড মাচ এ্যাজ আই লাইক ঢাকা, আই ওয়ান্ট টু বি রিলিভড। অথচ একথা শুনে হি ইনসিসটেড দ্যাট দেয়ার ক্যান বি নো কোয়েশ্চেন অব মাই গোয়িং। হি টোল্ড মি 'ইউ মাস্ট কন্টিনিউ ফর ওয়ান মোর টার্ম। এ্যান্ড মাচ এগেইনস্ট মাই উইল আই এ্যাগরিড। আই কুড নট ইমেজিন ডিসওবলাইজিং হিম। এ্যান্ড নাউ দিস মর্নিং আই সি ইন দি পেপার দ্যাট আই এ্যাম লিভিং, এ্যান্ড জুবেরী ইজ কামিং!' অধ্যাপক রাজ্জাক জেনকিনস সাহেবের মনোবেদনার কথা উল্লেখ করে বললেন, সত্যি জেনকিনস হেল্ড হাই অপিনিয়ন এ্যাবাউট মিঃ ফজলুল হক। অধ্যাপক রাজ্জাক সেদিনের আলাপের কথা বর্ণনা করে আবার বললেন, আমি জেনকিনসকে বললাম : কাগজে দেখেছি বলেই তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তবে ইফ ইট ইজ সারটেইন দ্যাট ইউ আর লিভিং ঢাকা, ইট ইজ সারটেইন দ্যাট জুবেরী ইজ নট কামিং। অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমার একথায় জেনকিনস একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন : হাউ ডু ইউ নো? আমি তার জবাবে বললাম এগুলো জিজ্ঞেস করো ন। বাট আই এ্যাসিওর ইউ, হুয়েভার মে বি দি ভি.সি. জুবেরী ইজ নট গোয়িং টু বি দি ভি.সি. অব দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি। তখন আতাউর রহমান সাহেব পূর্ব বাংলার চিফ মিনিস্টার।' জেনকিনস আবার বললেন : আর ইউ কুয়াইয়েট সারটেইন? আমি বললাম, এ্যাবসোল্যুটলি সারটেইন। জুরেবী ইজ নট কামিং অ্যাজ ভি.সি.। কে আসবে, তা আমি সঠিক জানি না। আমার একথা শুনে বুড়ো আমার হাত ধরে ফেলে বললেন : ইফ ইউ ক্যান এ্যাসিওর মি এবাউট, দ্যাট, ইউ মেইক মি হ্যাপিয়ার দ্যান ইউ নো। আই নো দিস ম্যান। আই উড নট লাইক টু লিভ দি ইউনিভার্সিটি ইন হিজ হ্যান্ডস। অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। কিন্তু বুড়ো বলতে লাগলেন : আই নো হি ভেরি ওয়েল।

আমি তাকে ভালো করে জানি। দিস ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইজ ভেরি ডিয়ার টু মি। আই হ্যাভ স্পেন্ট এ লট অব টাইম হিয়ার এ্যান্ড আই রিয়ালি উইশ ইট ওয়েল, এ্যান্ড জুবেরী ইজ নট দি পারসন ইন হুজ হ্যান্ডস আই উড লাইক টু লিভ দিস ইউনিভার্সিটি ... এইভাবে সেদিন কথাবার্তা হল।

আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে প্রশ্ন করলাম : এরপরে কি ড. মাহমুদ হোসেন ভি.সি. হয়ে এসেছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : না। জাস্টিস ইব্রাহিম এলেন।

অধ্যাপক রাজ্জাক আজকের আলাপটি শুরু করেছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একাকালীন অধ্যাপক এবং বিভাগের প্রধান ড. নিউম্যানকে নিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে একাধিক বিদেশি পণ্ডিত অধ্যাপক অধ্যাপনার কাজ নিয়ে এসেছেন। গোড়ার দিকে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে হারটগ, টার্নার, ল্যাংলী, জেনকিনস : এঁরা সুপরিচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাঁদের অকৃত্রিম অনুরাগ ও সেবার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জেনকিনস-এর যে কাহিনী এতক্ষণ বিস্তারিতভাবে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন, তাতে প্রশাসনিক দুর্বলতার পরিচয় যাই থাক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগের কোনো অভাব যে ছিল না, এটা বোঝা যায়। কেবল অর্থ কিংবা চাকরির আকর্ষণে তিনি বৃদ্ধ বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন, একথা বলা যায় না। অধ্যাপক আরনসন, অধ্যাপক এজি স্টক, এরাও তাঁদের সরল অনাড়ম্বর জীবনাচরণ এবং পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে বিভিন্ন সময়ে উন্নত করে তুলতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু বিদেশি অধ্যাপকদের ঐতিহ্যের ইতিহাসে ড. নিউম্যান একটি ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য যত না অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার একাগ্রতা নিষ্ঠা এবং দক্ষতায় ছিল, তার চেয়ে বেশি নিজের ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত খেয়ালিপনা প্রতিষ্ঠায়। স্থূলসূক্ষ্ম সকল কূটকৌশল গ্রহণ এবং ঝগড়া-বিবাদ সংঘটনে। ছাত্রদের পরীক্ষণ ও মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর জ্ঞানের নিরপেক্ষ বিচারের চেয়ে তাঁর নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা একাধিক সময়ে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই অধ্যাপক রাজ্জাকের সঙ্গে তার বৈরী আচরণই কেবল নয়। ছাত্রের সঙ্গে ড. নিউম্যানের সম্পর্ক উত্তম ছিল না। কোনো কোনো ক্ষুব্ধ ছাত্রও এজন্য তাঁকে অধ্যাপকের সম্মান দিতে অস্বীকার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ আন্দোলন তৈরি করেছে। অধ্যাপক রাজ্জাকের কাছ থেকে এসব কাহিনী শুনতে শুনতে স্বাভাবিকভাবে আমার মনে প্রশ্ন জাগছিলো, তাহলে এমন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধ্যাপক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কেমন করে? আমি তাই রাজ্জাক স্যারকে প্রশ্ন করলাম : এই নিউম্যানকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি যোগাড় করলো কেমন করে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : '৪৮-৪৯ সালে সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন একবার বিলেত যান ইউনিভার্সিটির জন্য অধ্যাপক সংগ্রহ করতে। উনি তখন

ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর। দেশ বিভাগের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ হিন্দু অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সঙ্কটজনক। ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেনের এটা বড় কমট্রিবিউশন যে তিনি নানা জায়গা থেকে অধ্যাপক সংগ্রহ করে এনে ইউনিভার্সিটিকে তখন টিকিয়ে রেখেছিলেন।

অধ্যাপক রাজ্জাককে, ড. নিউম্যান কেমন করে এলেন, একথা জিজ্ঞেস করাতে ভাইস চ্যান্সেলর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন প্রসঙ্গ উঠলো। সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন ছিলেন আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজের প্রফেসর। তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিককার ছাত্র। কৃতী ছাত্র। ইংল্যান্ডে যেয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন, এ কাহিনীটির মূল্য আছে। তাই আমরা অধ্যাপক রাজ্জাকের স্বতস্ফূর্ত বিবরণে কোনো বাধা দিলাম না। অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমিও তখন লন্ডনে এবং খুব দূরবস্থায়। আমি জানতাম না, সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন ওখানে গেছেন। ফজলুর রহমান তখন পাকিস্তানে সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। তিনিও এই সময়ে একবার বিলেত যান। তিনি বিমান থেকে নেমেই তাঁর লোকদের আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আমি আর একটু নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম অধ্যাপক রাজ্জাককে : আপনি কখন গিয়েছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমি যাই ১৯৪৫-এ। যাইহোক, ফজলুর রহমান লন্ডন নেমে তার এডুকেশনাল এ্যাটাচিকে পাঠিয়ে দিয়েছে, যেখানে থেকে পার রাজ্জাক সাহেবেকে খুঁজে বের করো। ফজলুর রহমানের এই এক স্বভাব ছিল : বাইরে খুব কর্কশ। ব্যবহারে অ্যাবরাপ্ট। কিন্তু তার নিজস্ব কায়দায় একটা আন্ত রিকতা ছিল। আমাকে এয়ারপোর্টে দেখতে না পেয়ে তার দলবদলকে বলেছেন : আই এ্যাম পারফেক্টলি সারটেইন, ইউ হ্যাভ নট টোল্ড হিম দ্যাট আই এ্যাম কামিং। কইলে আইত, না হলে খবর দিত। ... তখন ফজলুর রহমানের হুকুম পেয়ে বেচারা খলিলুর রহমান বহু খোঁজাখুঁজি করে আমাকে বার করলো। খলিলুর রহমান তখন ইউকেতে পাকিস্তান হাইকমিশনে এডুশেন এ্যাটাচি। আমার এখানো মনে আছে, বিকেল ৫টা-৫-৩০ টার সময়ে একটা বাসায় রয়েছি। সেখানে আমাকে পেয়ে সে ভদ্রলোক বললেন : দেখুন তো ব্যাপার, আপনার যন্ত্রণায় ... আমি বললাম : কী হয়েছে? তিনি বললেন : ফজলুর রহমান এসেই এয়ারপোর্ট থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন : আপনাকে খুঁজে নিতে হবে। এখন চলেন! আমি বললাম : আমি তো জানতামনা। আপনরা তো আমাকে বলেন নাই।

: ঠিক আছে, সেসব কথা পরে হবে, এখন চলেন। আমি গেছি। দেখি, ফজলুর রহমান সাহেবের হোটেলে মোয়াজ্জম সাহেব বসা। তাই মোয়াজ্জম সাহেবের সঙ্গে ওখানে দেখা হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখানে? তিনি

বললেন : আমি তো বেশ কিছুদিন আছি, ইউনিভার্সিটি টিচার-এর জন্য। আপনিও তো আমাদের একজন টিচার। আপনি তো আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আমি বললাম, সৈয়দ সাহেব, আপনি কখনো জানান নাই যে আপনি এখানে এসেছেন। আমি জানলে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতাম। সৈয়দ সাহেব বললেন : আমি তো রোজ খলিলুর রহমানের অফিসে যাই। আমি মোয়াজ্জম সাহেবকে বললাম, আপনি ভি.সি.। ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ডে আপনার স্ট্যান্ডিং ইজ ফার হায়ার দ্যান দ্যাট অব ইউর প্রাইম মিনিস্টার। আপনি ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের জন্য এসেছেন। আপনি এখানকার কোনো প্রফেসর বা ভাইস চ্যান্সেলর কাউকে যদি একটি ছোট্ট চিঠি লিখেও বলতেন, আমি এই কাজের জন্য এসেছি, ইউ এ্যাসিস্ট মি, তাহলে তারা প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে দিতেন। মোয়াজ্জম সাহেব বললেন : আমি তো খলিলুর রহমানকে একথাই বলে আসছি। ... আমি বললাম, সে যাক। আমি অধ্যাপক লাস্কিকে চিনি। হি ইজ সামবোডি। হি ক্যান এ্যাসিস্ট ইউ ওভার এ ওয়াইড এরিয়া। হোয়াই ডোন্ট ইউ সি লাস্কি? আমার কথা শুনে সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন একটু আশ্চর্য হলেন। তিনি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না যে আমার কথাতে লাস্কির মতো খ্যাতিমান লোক তাঁকে কোনো সাহায্য করবেন। এ্যান্ড আই রিকুয়ার্ড সাম কনভিন্সিং যে এতে কোনো ডিফিক্যাল্টি হবে না। যাই হোক অতঃপর সৈয়দ সাহেব বললেন, আচ্ছা আপনি ঠিক করে দিন।

অধ্যাপক লাস্কি ৩০.০৭.৭৬

লাস্কির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই অধ্যাপক রাজ্জাক এদিনের আলোচনা শেষ করে দিলেন। কিন্তু উল্লেখটি স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ সৃষ্টিকারী। হ্যারল্ড লাস্কি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি মারা যান। কিন্তু অধ্যাপক রাজ্জাক ১৯৪৫ সালে যখন বিলেত যান তখন তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অধ্যাপক লাস্কির তত্ত্বাবধানে 'ভারতের রাজনীতিক দল' শিরোনামের গবেষণার কাজ করছিলেন। সৈয়দ মোয়াজ্জম সাহেবকে অধ্যাপক রাজ্জাক অধ্যাপক লাস্কি সম্পর্কে যেভাবে বলেছিলেন তাতেই বোঝা যাচ্ছিল লাস্কির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি কেবল ছাত্র-অধ্যাপকের সম্পর্ক নয়। এ সম্পর্ক আমরা আর একটু বিস্তারিত জানার জন্য ৩০ তারিখের আলোচনায় প্রসঙ্গটাকে আবার তুললাম। অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমি যেয়ে লাস্কিকে বললাম : ঢাকা ইউনিভার্সিটিস ভি.সি. ডিজায়ারস টু সি ইউ। আমার কথা শুনে লাস্কি অমনি বললেন : ভেরি কাইন্ড অব হিম, ভেরি কাইন্ড অব হিম। করে আসবেন তিনি? আমি বললাম : তুমি একটা টাইম বলে দাও। তখন লাস্কি একটা টাইম দিলেন। দুটো-আড়াইটা হবে, ঐ এল.এস. ই-তেই (লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স)। আমি এসে ঐ সময়ে মোয়াজ্জেম সাহেবকে নিয়ে গেলাম।

এবার অধ্যাপক রাজ্জাক একটু ভিন্ন সুরে বললেন : লাস্কি তো কেবল অধ্যাপক নন। অন্য পরিচয়ও তার ছিল। হরদম নানা স্ট্যাচার-এর মানুষ আসত। কনটিনিউয়াস স্ট্রিম। কৃষ্ণ মেননকে দেখেছি কাপল অব ডজন টাইমস। কথা নাই বার্তা নাই, লাস্কিকে ভিজিট করতে আসতেন। লাস্কি তাঁর ঘরে থাকতেন। এঁরা তাঁর ঘরে যেয়ে দেখা করতেন। কিন্তু এই ফর দি ফার্স্ট টাইম আমি দেখলাম, ঠিক যে আড়াইটা টাইম দিয়েছেন, ঠিক সেই আড়াইটায় লাস্কি সিঁড়ির গোড়ায় এসে অপেক্ষা করছেন। মোয়াজ্জম সাহেব আসতেই, 'ওহ মিঃ ভাইস চ্যান্সেলর' বলে লাস্কি তাঁকে রিসিভ করলেন। অবশ্য আমি নিজে আর সাক্ষাতে থাকলাম না। আমি তাঁকে পৌছে দিয়ে কেটে পড়লাম।

কিন্তু এই প্রসঙ্গের শুরু হয়েছিল, ড. নিউম্যান কি করে সংগৃহীত হলেন সে প্রশ্ন নিয়ে। সেখান থেকে কথা উঠেছিলো সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন সাহেবের ইংল্যান্ড যেয়ে শিক্ষক সংগ্রহের কথা। অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমি মোয়াজ্জম সাহেবকে বলেছিলাম, বয়স্ক লোক খোঁজ না করে কম বয়সের কোয়ালিফাইড ৫-১০ জন মাস্টার এখান থেকে নিয়ে যান। দুএকজনের নামও আমি করেছিলাম। কিন্তু ডিফিকাল্টি হল, যাঁদের কথা চিন্তায় এল তারা এল.এস.ই-র ছাত্র এবং এদের মধ্যে যাদের প্রমিজ আছে তারা লং টার্ম-এর জন্য দূরে যেতে চাইবে না। মরিস জোন্স অবশ্য এখন বেশ পরিচিত। তখন ততটা ছিলেন না। তবু তাঁর কথাও উঠেছিলো। এই সময়ে নিউম্যানের কথা উঠলো। নিউম্যানকে লাস্কি চিনতেন। নিউম্যান ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য দরখাস্ত করেছিল। এর সম্পর্কেই মোয়াজ্জম সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন লাস্কিকে। লাস্কি বলেছিলেন, নিতে পার 'রিডার' করে। তবে কোনো ডিপার্টমেন্টের চার্জ দিও না। হি সাফারস ফ্রম পারসিকিউশন মেনিয়া। কিন্তু সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন সাহেব তাঁকে পুরো প্রফেসর করেই আনলেন।

তারপরেই অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদের বললেন : তবে একথা ঠিক যে মোয়াজ্জম হোসেন না থাকলে '৪৭-এর আঘাতে ইউনিভার্সিটি টিকতো না। ... সৈয়দ আলী আহসান, সাজ্জাদ হোসেন—এদেরকে উনিই ইউনিভার্সিটিতে এনেছিলেন। এদের বাড়িতে যেয়ে চাকরি অফার করে এনেছিলেন। আর কেউ এমন পরিশ্রম করতো না। যাই হোক, নিউম্যানকে উনি পুরো প্রফেসর করেই আনলেন। আইবার পরেই এটা ওটা নিয়া আমার সঙ্গে লাগলো।

আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলাম : কিন্তু নিউম্যান এর আগে কোথায় ছিল?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : বিলেত থেকে দক্ষিণ আফ্রিতাতে গেছিল একটা চকির নিয়ে অল্প কিছুদিনের জন্য। জাতিগতভাবে ইহুদি। অস্ট্রিক জার্মান। লেখাপড়ায় ভালো ছিল। স্বভাবের কথা আলাদা।

অধ্যাপক রাজ্জাক এরপরে নিউম্যান প্রসঙ্গ শেষ করে সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন সাহেব সম্পর্কে আর একটু বললেন : সেয়দ মোয়াজ্জম হোসেন সাহেব যখন ইউনিভার্সিটি থেকে চলে যান তার আগে কিছুদিন আমার সঙ্গে কিছুটা আনপ্লেজ্যান্ট রিলেশন চলেছিলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : উনি ভাইস চ্যান্সেলরশিপ থেকে কখন চলে যান?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে। তাঁর বিদায়ের জাস্ট আগে মুসলিম হল, মানে সলিমুল্লাহ হলের একটা ম্যাগাজিন বার হয়। তখন সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ড. ওসমান গনি। সেই ম্যাগাজিনে মোয়াজ্জম সাহেবকে এ্যাটাক করে একটা এডিটোরিয়াল লেখা হয়। এই এডিটোরিয়াল-এর কয়েক প্যারায় ওসমান গনি সাহেবের প্রশংসাও করা হয়। ব্যাপারটা খুব সুরুচির পরিচায়ক ছিল না। আই ওয়াজ ভেরি সরি। এই ঘটনার পরেও আট-দশদিন মোয়াজ্জম সাহেব ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন। কিন্তু ঐ কয়দিন আমি কন্টিনিউয়াসলি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কারণ, ওঁর জন্য আমার একটা ফিলিং ছিল। আফটারঅল তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। মানে, উনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমি তখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র। উনি হিউমিলিয়েটেড হয়ে বিদায় নিবেন, এটা আমার কাছে দুঃখজনক বলে বোধ হয়েছে। আমার এই ব্যবহারে মোয়াজ্জম সাহেব অলসো ওয়াজ এ লিটল টাচ্ড। আমাকে শেষে একদিন হঠাৎ বলে ফেললেন, দেখুন আমি আপনার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছি।

অধ্যাপক রাজ্জাক ব্যাখ্যা করে আমাদের বললেন : এটা হিউম্যানের ব্যাপারে ঘটেছিলো। তারপর মোয়াজ্জম সাহেবের সেদিনের কথা বর্ণনা করে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : মোয়াজ্জম সাহেব বললেন, কিন্তু এই শেষ ক'দিন আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন, ইট মেইকস মি ফিল ভেরি স্মল। এটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

অধাপক রাজ্জাক হাসিমুখে এবার থামলেন। তারপরে বরলেন, এরপরে যা বললেন তা লেখা উচিত কি না আমি জানি না। তিনি বললেন : দ্যাখেন রাজ্জাক সাহেব, আপনি যে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন তা নয়। তবে আমার একটা দুঃখ আপনি আমাকে কোনদিন 'স্যার' বলেন নাই। ...

অধ্যাপক রাজ্জাক বর্ণনায় একথা শুনে আমি এবং ফজলে রাব্বি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলাম।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমি সবসময় পারসনাল এ্যাডরেস হিসেবে মোয়াজ্জম সাহেবকে 'সৈয়দ সাহেব' বলতাম। এটা আমি একেবারে গোড়া থেকেই করে এসেছি, ১৯৩৬ সাল থেকে, যখন উনি ইউনিভার্সিটিতে রিডার ইন এ্যারাবিক। তখন থেকেই ওঁকে আমি সৈয়দ সাহেব বলেছি। তা যে কোনোরূপ তাচ্ছিল্য করে, তা আদৌ নয়। চিঠিপত্রেও 'সৈয়দ সাহেব' বলেই সম্বোধন করেছি। আই নেভার থট দ্যাট দিস কুড হ্যাভ বিন এ্যান অবজেক্ট অব গ্রিভ্যান্স।

উনি মানুষ খুব সরল। এই আলাপের দিনে খুব ইমোশনালি সারচার্জড ছিলেন। কারণ তাঁরা যাওয়ার সময়ে খুব বেশি মানুষ যে তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে, এমন নয়। আর আমি একেবারে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে থাকছিলাম। যেটা দরকার সেটা না বলতেই করে দিচ্ছিলাম। এটা তাঁর মনে খুব লেগেছিলো। মোয়াজ্জম সাহেব তারপরে আবেগ নিয়ে বললেন : মজহার সাহেবও (মজহারুল হক) কোনোদিন আমাকে 'স্যার' বললেন না। তাঁর এই অনুযোগ শুনেআমি একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমি বললাম : এখন তো এটার কোন সংশোধন নাই। এখন অসংখ্য বার 'স্যার' বললেও তো এর ক্ষতিপূরণ হবে না। আমি বললাম, আমি কোনোদিন মনে করি নাই যে, এতে আপনি আঘাত পাবেন ...

অধ্যাপক রাজ্জাক তারপর আমাদের আবার বললেন : উনি মানুষ খুব সরল ছিলেন। ... এমনি আমাকে খুব খাতির করতেন। আমার সঙ্গে খাতিরই ছিল। কারণ সেই ১৯৩৬ সাল থেকে উনি আছেন। তখন মুসলমান শিক্ষকও ইউনিভার্সিটিতে খুব কম ছিল। ইউনিভার্সিটির পুরানো ছাত্রদের মধ্যে উনিই একটা বড় এ্যাপয়েন্টমেন্ট পান। রিডার হিসেবে নিযুক্ত হন। ওঁর অক্সফোর্ডএর শিক্ষক ছিলেন মারগোলিয়াথ—আরবির ফিল্ডে তাঁর নাম আছে। ... বিলাতেই ফজলুর রহমান সাহেবের সুবাদে আমার সাক্ষাৎ ঘটলো সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে। আগেও উনি বিলেত ছিলেন। কিন্তু তার পড়াশোনার লাইব্রেরির বাইরে কিছু জানতেন না। সেবার বিলেতে দেখা হওয়ার পরে আমি ওঁর বেশ দেখাশোনা করতাম। একদিন ঢাকা ফিরে আসার আগে আমাকে বললেন : দেখেন তো, আমার ওয়াইফ কী কী লিস্ট দিয়েছে। সেগুলো আমি ক্যামন করে কিনবো। এগুলো কোথায় কি, আমি ঠিকও করতে পারি না ... আমি বললাম : ঠিক আছে, কী কী উনি চেয়েছেন, আমাকে একটা আইডিয়া দেন, আমি কিনে এনে দেব ... উনি নানা টুকিটাকির কথা বললেন। আমি সেগুলো যোগাড় করে দিয়েছিলাম। আমি ঢাকায় আসার পরে একদিন আমাকে বললেন : আপনি আমার যা উপকার করেছেন, আমি তা ভুলতে পারি নাই। আমি অবাক হয়ে বললাম : আমি আপনার কি উপকার করেছি। উনি বললেন : আমি এ পর্যন্ত এমন কোনো জিনিস কিনি নাই, যা নিয়ে আমার স্ত্রী আমার ওপর না চটেছেন। কিন্তু এবার আমাকে তিনি খুশি হয়ে বলেছেন খুব সেটিসফ্যাক্টরি। আমি কিন্তু আপনার নাম বলি নাই—বলে মোয়াজ্জম সাহেব সরলতায় হাসতে লাগলেন।

অধ্যাপক রাজ্জাক তারপর একটু মূল্যায়নের সুরে বললেন, তবে সাহস কম ছিল। আবার তিনি থামলেন। থেমে বললেন—গুড-ব্যাড নিয়েই মানুষ। তবে দি গুড দ্যাট হি ডিড টু দি ইউনিভার্সিটি ফার আউটওয়েজ দি থিংস আদারপ্রাইজ ...

সৈয়দ মোয়াজ্জম সাহেবের কথা বলতে যেয়েই '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা উঠে যায়। '৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার অন্যতম রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনই পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন ও

স্বাধীনতার সংগ্রামেরও সূচনা ঘটায়। ঢাকা শহরের, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করে। শিক্ষকদের মধ্যেও ভাষা আন্দোলন সহানুভূতি ও সমর্থনের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখতে চাইলাম না। কেবল রাজ্জাক সাহেবেরর যা স্মৃতি আছে এ সম্পর্কে, তা জানতেই আমাদের আগ্রহ ছিল। ভাইস চ্যান্সেলর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেনের কথা বলতে যেয়েই অধাপক রাজ্জাক বললেন : ১৯৫২-তে ভাষা আন্দোলনের সময়ে, আর কিছুর জন্য নয়, সাহসের অভাবে, হি অকেজন্ড মাচ ট্রাবল। আমার মনে আছে যেদিন গুলিটা হল, ইউনিভার্সিটির ঐ পুরনো দালানে (বর্তমান মেডিকেল কলেজ হসপিটাল বিল্ডিং-এর দক্ষিণ দিক) ছাত্র-শিক্ষক সব মিলিং এ্যারাউন্ড। একবার হঠাৎ এই ভিড়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। ছাত্ররা প্রসেশন করে বাইরে যাবার চেষ্টা করছে। রাস্তার পাশে গেট বন্ধ করে দিয়ে তাদের কোন রকম ঠেকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি বললাম—সৈয়দ সাহেবকে, ইট ক্যান ইজিলি বি হ্যান্ডলড।

: কেমনে?

আমি বললাম : এইগুলো ছেলেরা করছে ক্যান? দে হ্যাভ নো কনফিডেন্স ইন ইউ। আপনি তাদের সঙ্গে আছেন, এই বিশ্বাস তাদের নাই। এই বিশ্বাস যদি তাদের হয় তাহলে নিশ্চয়ই তারা এক্সট্রিমে যাবে না। সৈয়দ সাহেব বললেন : আমার কী করতে হবে? আমি বললাম, আপনি ছেলেদের বলুন যে, ইট ইজ ইনএ্যাডভাইজেবল টু গো আউট ইন প্রসেশন। তবে তোমরা যদি প্রসেশন নিয়ে বার হও, তবে সে প্রসেশন আমিই লিড করবো। আপনি ভি.সি. হিসেবে যদি বাইরে যান তবে পুলিশ নিশ্চয়ই গুলি করবে না। করতে পারে না এবং ছেলেদের ইমোশন ক্যান বি কামড ডাউন। তাদের শান্ত করা যায়। এই কথা আমি সৈয়দ সাহেবকে বলবার লাগছি, এমন সময়ে এক কলিগ, সিনিয়র শিক্ষক, তিনি এখনো ইউনিভার্সিটিতে আছেন, তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, রাজ্জাক কী বলছে?

সৈয়দ সাহেব রিপোর্ট করলেন : রাজ্জাক সাহেব তো এই বলছে। আমি বললাম : হ্যাঁ, আমি একথা এখনো বলি। একথা শুনে আমার সেই কলিগ উড়িয়ে দিলেন : না, এসব কী কথা? চলুন আমার ওদিকে যাই।

সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদের কাছে আবার বললেন : আই রিমেইন স্টিল কনভিন্সড্ যে সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন যদি সেদিন একথা বলতেন, তাহলে সেদিনকার ট্রাজেডি এড়ানো যেত!

অধ্যাপক রাজ্জাকের কথা শুনে আমি বললাম : তাঁর কাছ থেকে এমন ডিসিশন আশা করা কি একটু বেশি আশা করা নয়?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : না, ব্যাপার হচ্ছে ছাত্রদের তাঁর বিরুদ্ধে গ্রিভ্যান্স ছিল যে তিনি ছাত্রদের এক কথা বলেন, বাইরে আর এক কথা বলেন। পুলিশের এস.পি. তখন ইদ্রিস। আমার মনে আছে, গেটের সামনে ছাত্ররা পুলিশকে অশ্লীল

ভাষায় গালিগালাজ করছে। আমি গেটের সামনে গেছি। ইদ্রিসকে দেখলাম গেটের বাইরে। ইদ্রিস ওয়াজ ওয়ান অব মাই আরলি স্টুডেন্টস। আমি তাকে চিনি। আমি একবার গেটের বাইরে গেলাম। দেখলাম, ইদ্রিস খুব এক্সাইসাটেড হয়ে ছাত্রদের বলছে : আপনারা যদি এরকম করেন, আমি গুলি অর্ডার দেব। এই কথা শুনে আই ওয়াজ এক্সটিমলি শক্‌ড। আমি ইদ্রিসকে ডেকে বললাম : আপনি কী কইলেন? ইদ্রিস আমাকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল। আমতা-আমতা করে বললো : কী বলেছি স্যার? আমি বললাম, আমি শুনেছি আপনি বলেছেন, গুলির অর্ডার দিবেন! তখন সে নরম হয়ে বললো : আই ডিড নট ইন মিন ইট স্যার। আমি বললাম, আপনার ফৌজ আছে সামনে। আপনি এস.পি. কিংবা এ্যাডিশনাল এস.পি.। আপনি যে এরকম বলতে পারেন, আমি ভাবতে পারি নাই। ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, আপনার এই বলার এফেক্ট কী হতে পারে?

: না স্যার, আমি এটা মিন করি নাই।

অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদের বললেন, একথা বলছি আমি আজ এজন্য যে, আমি মনে করি, ইট ওয়াজ পসিবল টু এ্যাভয়েড দি ট্রাজেডি, অন্তত ঐদিন। পুলিশ, প্রসেশন বার করতে দিতে চায় না। কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর মোয়াজ্জম হোসেন সাহেব যদি প্রসেশনের সামনে থাকতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে পুলিশ তার তাৎপর্যটা বুঝতো এবং যা ঘটেছে তা ঘটতো না। বাঙালি যে অফিসারটা থাকতো, তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভি.সি.'র গায়ে হাত তুলতে পারত না। আমার সঙ্গেও একটা বাঙালি অফিসার কথা বলতে একটু সমীহ না করে পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, স্যার ওদিনই কি ফায়ারিং হয়েছিল?

: হ্যাঁ, ওদিনই শেষে ফায়ারিং হল। সেদিন ফায়ারিং-এর সময়ে আমি ইউনিভার্সিটির কম্পাউন্ডে ছিলাম না। সকাল থেকেই গন্ডগোল চলছে। তিনটা গেটেই জমায়েত। আমরা দেওয়ান বাজারের দিকের গেটে। বেলা সাড়ে বারটার সময়ে দেয়ার ওয়াজ এ লাল এবং ভেরি স্টুপিডলি অই কনক্লুডেড দ্যাট এ্যাট লিস্ট ফর দ্যাট ডে. দি থিং ইজ ওভার। সাড়ে সাতটার দিক থেকেই আমি এদিকে ঘুরছি। আমি তখন থাকি তাঁতখানা। সাড়ে সাতটা থেকেই এ অবস্থা। আই ফেল্ড সো টায়ার্ড। আমি দুপুরের দিকে বাসায় চলে যাই। গুলিটা হয়েছে আড়াইটার দিকে। আমি তাঁতখানা থেকে শুনলাম যে গুলি হয়েছে।

সঙ্গী ফজলে রাব্বি কাহিনী শুনতে শুনতে আমার কথা উল্লেখ করে বললেন : সরদার সাহেব তখন কোথায়?

অধ্যাপক রাজ্জাকের খেয়াল আছে। তিনি বললেন : সরদার তো তখন জেলে।

আমি বললাম : হ্যাঁ, স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি তখন জেলে। আমি এ্যারেসটেড হয়েছিলাম '৪৯-এর ডিসেম্বরে। তখন থেকেই জেলে।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এর কয়েকদিন পরেই বোধয় মুজাফফরকে ধরে নিয়ে গেল, মুনীরকে ধরে নিয়ে গেল।

আমি বললাম, অজিত গুহ, পৃথ্বিশ চক্রবর্তী এঁরাও গ্রেফতার হয়েছিলেন। কিন্তু স্যার, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষকরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, এদের কি ভাষা আন্দোলনে কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এঁদের কারোরই ভাষা আন্দোলনের ব্যাপারে কোন লিডিং পার্ট ছিল, এমন বলা চলে না। '৫২-এর ব্যাপারে শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কেউ যে তেমন প্রমিনেন্ট পার্ট নিয়েছেন, এমন মনে পড়ে না। একুশে ফেব্রুয়ারি মোর অব লেস সবাইকে এ্যাফেক্ট করেছিল। কিন্তু কোনো যে এর পেছনকার অরগাইনাইজার ছিল, এমন নয়। কেউ না। মুনীরও নয়! মুজাফফরও নয়। পরে শুনি মুজাফফরের এ্যারেস্টের কারণ।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম : কী কারণ ছিল?

: মুজাফফর তখন প্রক্টর ছিল এবং দেওয়ান বাজার সাইডে ইউনিভার্সিটি গেটে তার বাসা ছিল। বাসার নিচের ঘরে, প্রক্টরের অপিসে একটা টেলিফোন ছিল। এই টেলিফোনটা যে কেউ ব্যবহার করত। এবং এই টেলিফোন থেকে আওয়ামী লীগ অফিসে ফোন যেত! দিস মোস্ট প্রবাবলি ওয়াজ দি বেসিস ফর হিজ ইনকারসেরেশন। এরা যে এগিয়ে গিয়ে সট মার্টায়েৰ্ডম, তা নয়। নাইদার মুজাফফর, নর মুনীর। ইনফ্যাক্ট মুনীর ডিলিবারেটলি ডিউরিং দিস টাইম ট্রাইড টু আন্ডারপ্লে হিজ এ্যাসোসিয়েশন উইথ পলিটিক্যাল মুভমেন্ট। তার ভাব ছিল, আমি এসবের মধ্যে থাকতে চাই না। আই থিংক হি মেন্ট ইট। ভাষা নিয়ে যে সমস্ত গোলমাল হয় তাতে কোনো একজন শিক্ষকের নাম নিয়ে বলতে পারবো না যে, হি ওয়াজ হার্ট এ্যান্ড সোল ডেডিকেটেড টু ইট। আই থিঙ্ক '৫২ জাস্ট ডেভেপড। এ নিজের গতিতে ঘটেছে। এ খুব যে পূর্ব পরিকল্পিত ছিল, এমনও মনে হয় না। কয়েকদিন আগ থেকেই ট্রাবল ডেভেলপ করছিলো। ...

এখানে অধ্যাপক রাজ্জাককে আমরা একটা প্রশ্ন করলাম : স্যার, ফায়ারিংয়ের পরে ভি.সি. কি শিক্ষকদের মিট করেছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হ্যাঁ রিভালশন অব ফিলিং ওয়াজ কমপ্লিট, দেয়ার ওয়াজ নো তাসপেক্ট অব লাইফ দ্যাট ডিড নট ফিল ফর দি স্টুডেন্টস, এ্যান্ড হুইচ ওয়াজ নট এ্যান্টিগভর্নমেন্ট। সবচেয়ে রিমার্কেবল ব্যাপার হল, '৫২-এর ফেব্রুয়ারির ঘটনাতে ঢাকা শহরের স্থানীয় সাধারণ মানুষের ফিলিং অব সিমপ্যাথি ফর দি স্টুডেন্টস। সমস্ত শহরটাই ছেলেদের পক্ষে ছিল। ইট ওয়াজ অল স্পনটেনিয়াস। সব স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু ছাত্রদের জন্য ঢাকার সাধারণ মানুষের এই যে সহানুভূতি, এটা পরবর্তীকালে নষ্ট হয়েছে বলেই আমার ধারণা। এখন আর তেমন নাই। দিস ওয়াজ প্রোবাবলি দি লাস্ট মেনিফেস্টেশন অব দি ফিলিং বিফোর ঢাকা লস্ট ইটস ওল্ড কারেক্টার। ঢাকার সেই পুরনো চরিত্রও আজ আর

নাই। শিক্ষকরা আন্দোলনকারী ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কাউকে লক্ষ্য করি নাই যার ভাষা আন্দোলননের ব্যাপারে কোন রিজার্ভেশন ছিল।

আমরা আর একটি প্রশ্ন করলাম : শিক্ষকরা মিলিতভাবে কি এই ফায়ারিং-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন, হ্যাঁ দেয়ার ওয়াজ এ মিটিং অব দি টিচার্স। সেই মিটিংয়ে সকলেই ছিল।

: ভি.সি. ছিলেন?

: না, সে ছিল না। মুনীর, মুজাফফর—এরা তখনো কেউ এ্যারেস্টেড হয় নাই।

অধ্যাপক রাজ্জাক আর একটু বিস্তারিতভাবে বলতে যেয়ে বললেন : ঘটনাটা আমার মনে আছে এই জন্য যে, ড. শহীদুল্লাহ সাহেব তখন টিচার্স এসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমি ভাবছিলাম, কোনো রিজোল্যুশন শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে নেওয়া হলে তিনি কি খুশি মনে তা মেনে নিতে পারবেন, হোয়েদার হি উড ফিল হ্যাপি। তাই আমি আর মযহাব সাহেব (সরওয়ার ছিল কিনা মনে নাই),—আমরা ড. শহীদুল্লাহর কাছে যেয়ে বলি, আমরা শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে মার্ডার অব দি স্টুডেন্টসকে কনডেমন্ করে, 'ছাত্র হত্যাকে' নিন্দা করে প্রস্তাব দেয়। আপনাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই রিজোল্যুশন মুভ করতে হবে। দেখলাম, ড. শহীদুল্লাহ মার্ডার কথাটা মানতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন : 'মার্ডার' কথাটা কওয়ার দরকার কি? আমরা বললাম,না। 'মার্ডার' কথাটা থাকতে হবে। তিনি আবার যখন বললেন : 'মার্ডার' কথাটা ঠিক হবে না, তখন আমরা বললাম, স্যার, আপনি তাহলে মিটিংয়ে উপস্থিত না থাকলেন। তাতে ড. শহীদুল্লাহ বললেন : আচ্ছা তাই হবে। আমি মিটিংয়ে থাকব না। পরের দিন আমরা মিটিংয়ে উপস্থিত হলাম।

আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের পূর্ব দিকে দোতলায় পুরনো দিনের শিক্ষকদের কমনরুমের উল্লেখ করে অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলাম : মিটিংটা কি পুরনো দালালের সেই পূর্ব পাশের কামরাতে হয়েছিল।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : না, তার বিপরীত দিকে একটা বড় ঘর ছিল। এটাতেই পররবর্তীকালে মনজুর কাদেরকে ছেলেরা নাজেহাল করেছিল। মিটিং এ ঘরে হয়েছিল।

এই প্রতিবাদ সভার কথা বলতে যেয়ে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : সকলে ঠিক করলো, মিটিং প্রিসাইড করবো আমি। আমরা মিটিং শুরু করবো। নিয়ম মাফিক কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করলো : ঠিক এই সময়ে ড. জুবেরী এসে উপস্থিত হলেন। ড. জুরেবীর সঙ্গে আগে আমাদের কোনো কথা হয় নাই। কিন্তু তিনি এসে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে যেয়েই বসলেন। আমরা প্রথমে একটু থতমত খেলাম। তারপর আমি যেয়ে তাঁকে রিজোলিউশনটা দেখালাম। আমি বললাম :

এই রিজোলিউশনটা প্লেস করা হবে। এবং আপনি যখন প্রিসাইড করছেন তখন চেয়ার থেকে এই রিজোলিউশনটা আপনি মুভ করবেন। তিনি 'মার্ডার' কথাটা দেখে আপত্তি করলেন। আমি বললাম, 'না, এই রিজোলিউশনটাই নেওয়া হবে। এই সময়ে ইকনমিক্সের প্রফেসর আয়ারও বললেন, মার্ডার কথাটার দরকার কি? 'ডেথ' শব্দটা ব্যবহার করলেই তো হয়। দোজ টু আর সিনোনিমাস। একথা শুনে আমি বললাম, সিন্স হোয়েন মার্ডার এ্যান্ড ডেথ হ্যাভ বিকাম সিনোনিমাস? আয়ার অমনি চুপ করে গেলেন। আর কিছু বললেন না। তখন জুবেরী সাহেবও সমাবেশের অবস্থা দেখে আর কিছু বললেন না।

আমি প্রশ্ন করলাম : কিন্তু তিনি, মানে জুরেবী সাহেব কি মিটিং ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : না। তিনি, রিজোলিউশনটা মুভ করলেন। এই মিটিংয়ে মুনীর ও মুজাফফর বক্তৃতা দিল। আমি বক্তৃতা দিলাম না। আমি ড. জুরেবীরর পাশে দাঁড়িয়ে রিজোলিউশনটার দিকে খেয়াল রাখছিলাম। বক্তৃতার ব্যাপারে মুজাফফর স্পোক স্ট্রংলি, এজ হি ইউজুয়ালি ডাজ এবং মুনীর স্পোক, ইফ নট স্ট্রংলি, এ্যাট লিস্ট ভেরি এফেক্টিভলি এবং বোধহয় সরওয়ার মুর্শেদও বক্তৃতা করেন।

আমি প্রশ্ন করলাম : তখন ড. জুবেরী ইউনিভার্সিটির কী ছিলেন?

: তিনি ইংরেজির চেয়ারম্যান এবং ডিন অব আর্টস ছিলেন।

: এ্যাটেন্ডেন্স কী রকম ছিল?

: এ্যাটেন্ডন্স বেশ বড় ছিল। সমস্ত ঘরটা প্যাকড-আপ ছিল। রিজোলিউশনটা বোধহয় কাগজে বেরিয়েছিলো। তখনকার কাগজে থাকতে পারে।

অধ্যাপক রাজ্জাক, মুনীর চৌধুরী এবং মুজাফফর চৌধুরীর গ্রেফতারের ব্যাপারে আর একটু বলতে যেয়ে বললেন : টিচার্সদের এ্যারেস্টের ব্যাপারে আমার মনে হয়, মুনীরের আগেই একটা রাজনীতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। মুজাফফরের টেলিফোনের ব্যাপারটা ছিল। এসব মিলিয়েই এদের এ্যারেস্ট ঘটেছে বলে আমার মনে হয়। ইউনিভার্সিটির এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিক থেকে সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন ওয়াজ প্রাইমারিলি কনসার্নড দ্যাট দি ইউনিভার্সিটি ডাজ নট সাফার।তবে আবার ছাত্র মেরেছে, এটাও আনপ্রেসিডেন্টেড। ইট মুভড হিম এজ মাচ ডিপলি এ্যাজ ইট মুভড আজ। এরা এ্যারেস্ট হয়ে যাওয়ার পরে ইউনিভার্সিটির মেইন কনসার্ন ওয়াজ নট সো মাচ দি ল্যাংগুয়েজ মুভমেন্ট, এ্যাজ দি এ্যাবেস্ট অব দি টিচার্স।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: মুনীর মুজাফফর সাহেব, এরা কি তখন ইউনিভার্সিটির বাসায় ছিল?

: মুনীর নীলক্ষেতের একটা বাসায় আর কারোর সঙ্গে শেয়ার করে ছিল। আর মুজাফফর ইউনিভার্সিটির ঐ দক্ষিণ দিকের গেট হাউসে ছিল।

অধ্যাপক রাজ্জাক বলতে লাগলেন : ... এদের সকলকেই আমি চিনতাম। মুনীরের স্ত্রীর তখন প্রথম বাচ্চাটা হয়ত হয়েছে। এ্যারেস্টের পরে এদের ফ্যামিলি নিয়ে প্র্যাক্টিক্যালি কেউ মাথা ঘামায় নাই। এ ব্যাপারে আমি মনে করি সারওয়ার মুর্শেদ ওয়াজ এক্সেপশন। এটা প্রশংসার ব্যাপার। হি ওয়াজ প্রোবাবলি এ্যালোন এমোং দি টিচার্স হু কন্টিনিউয়াসলি এদের দুজনার বাসার খবরাখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমিও চেষ্টা করেছি, এদের সম্পর্কে কিছু করা যায় কি না। এই সময়ে ২৭-২৮ তারিখের একটা কথা আমার পার্টিকুলারলি মনে আছে। সেদিন ভি.সি-র বাড়িতে অনেকে হাজির হয়েছে। শিক্ষকরা লনের এদিক-ওদিক পায়চারি করছে। আমি ভি.সিকে বললাম এদের (শিক্ষকদের) এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। আমরা তো কিছু করতেও পারছি না। তবে একটা কাজ আপনি করতে পারেন। ভি.সি. বললেন, কী? আমি বললাম, এদের এ্যারেস্ট সম্পর্কে গভর্নমেন্ট তো আপনাকে কিছু জানায় নাই। এদিকে ২৮ তারিখে এদের মায়না দেওয়ার প্রশ্ন আছে। আপনি তো এই এ্যারেস্টের ব্যাপারটা নোটিসে না নিলেই পারেন। আপনাকে কিছু না জানানো পর্যন্ত এদের মায়না আপনি দিয়ে যান, এ্যাট লিস্ট এ্যাজ লং এ্যাজ গভর্নমেন্ট ডাজ নট রাইট টু ইউ, দ্যাট দিজ টিচার্স হ্যাভ ডান দিস অর দ্যাট। কথাটা আমি ভি.সি.-কে খুব প্যাশনেটলি বলছিলাম। ঠিক এমন সময়ে, জাস্ট এ্যাট দিস মোমেন্ট, হাদি সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। আমার এখনো মনে আছে, তিনি খালি পায়ে এসেছিলেন। পায়ে কিছু চোট পেয়ে হয়ত ব্যান্ডেজ করেছিলেন।

: তিনি তো তখন রেজিস্ট্রার?

: হ্যাঁ, তখন তিনি রেজিস্ট্রার। আমার কথার মধ্যে তিনি ইন্টারভেন করে ভি.সি.-কে বললেন, কী বলছে, আবদুর রাজ্জাক? আমার প্রস্তাব শুনে তিনি ভি.সি.-কে বললেন, চিন্তা না কইরা এসব করবেন না। এতে রিস্ক আছে। সৈয়দ মোয়াজ্জাম হোসেন সোজা মানুষ। এই রিস্কের কথা শোনার পরে আর তাকে এদিকে আমি টানতে পারলাম না। হাদি সাহেবের ওপর আমার সেদিন ভয়ানক রাগ হয়েছিল। হাদি সাহেব আমার সিনিয়র। আমি তাঁকে মান্য করি। কিন্তু আই লস্ট মাই টেম্পার। হাদি সাহেব আমার রাগ দেখে বলতে লাগলেন, দেখেন আবদুর রাজ্জাক, একথা আমি ভালো মনে করেই কইছি। আমি তার কোনো কথা না শুনে বললাম, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি নই। ...

তারপর অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদের বললেন : সেদিন ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে এটা করতে পারলে আমার মনে হয়, একজন শিক্ষকের এ ধরনের পার্টিসিপেশন ইন পাবলিক লাইফ উড হ্যাভ এ্যাপিয়ার্ড লেস ফিয়ারসাম দ্যান ইট টার্নড আউট টু বি। এরকম এ্যারেস্ট ইত্যাদি শিক্ষকদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করতো না।

অধ্যাপক রাজ্জাক বলতে লাগলেন : শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্টিকুলারলি হিরোয়িক আমরা কেউই ছিলাম না। সবাই সাবধানে থাকার চেষ্টা করতাম। যারা এ্যারেস্টেড হল তাদের সম্পর্কে তেমন কেউ চিন্তা করতো না। সবাই এদের চিনতাম। আর ছাত্রদের সঙ্গে টিচার্সদের সম্পর্ক এমন নয় যে তারা এ্যারেস্টেড টিচার্সদের সম্পর্কে খোঁজখবর করবে। ... আমি এরপরে ড. ওসমান গনির সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন ইউনিভার্সিটির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পাওয়ারফুল মেম্বার এবং এস.এম. হলের প্রভোস্ট। আমি বললাম, এ্যারেস্টেড টিচার্সদের বিরুদ্ধে আপনার কোনো ডিসিপ্লিনারি এ্যাকশন নিবেন না। এদের মায়না দেওয়া বন্ধ করবেন না। তিনি বললেন, ই.সিতে এমন প্রস্তাব দিলে গ্রহণ করানো যাবে না। আমি বললাম, তাহলে অন্তত এদের ব্যাপারে ই.সি'র আলোচনা ডেফার করেন। ইন দি মিনটাইম, দেখি কী করা যায়। তখনো আমি ভাবি নাই যে এদের দীর্ঘদিন থাকতে হবে। যেদিন ই.সি'র মিটিং, তার আগের দিন আমি গ্রামের বাড়িতে যাই। বাড়ি থেকে আসার পর আমার তাঁতিবাজারের বাসায় খবরের কাগজে হেডলাইন দেখলাম, ইউনিভার্সিটির এ্যারেস্টেড টিচার্সদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

'সাময়িকভাবে বরখাস্ত' কথাটি শুনে আমরাও একটু চমকে উঠলাম। এটা কী জিনিস? অধ্যাপক রাজ্জাক এই মনোভাবটি প্রকাশ করে বললেন : এই আমি প্রথম শুনলাম, সাময়িকভাবে বরখাস্তের অর্থ বার করা মুশকিল। আমার বাসার একটু দূরে মিউনিসিপ্যালিটির এক এ্যাডমিনিস্ট্রেটর আবুল খায়ের থাকতেন। সেখানে ই.সি.'র মেম্বার ইবরাহীম খাঁর সঙ্গে আমার দেখা।

আমি প্রশ্ন করলাম : কোন ইব্রাহিম খাঁ? প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হ্যাঁ তিনি এক্সিকিউপিটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। তাঁকে যখন বললাম, আপনারা এটা কেন করলেন, তখন তিনি বললেন, তিনি তো চান নি। কিন্তু অন্য মেম্বাররা রাজি নয়। আমি বললাম, আপনাদের যাকে জিজ্ঞেস করি,তিনিই বলেন, তিনি এটা চান নাই। এভাবে সবাইকে যোগ করলে দেখা যায় কেউই আপনারা এ্যারেস্টেড টিচার্সদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে চান নাই। তাহলে ব্যাপারটা হল কী করে?

'৫৬ সালের সংবিধান রচনার প্রশ্ন ৩০.০৯.৭৬

আজকের আলোচনা ইউনিভার্সিটির বাইরে চলে গেল। কথায় কথায় এদিন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ও ব্যবধানের কথা উঠলো এবং এই আলাপ প্রসঙ্গেই জানতে পারলাম ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের যে সংবিধান তখনকার সংবিধান পরিষদে তথা কনসটিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলিতে গৃহীত হয়েছিল সে সংবিধান তৈরির পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষ থেকে যে সব আলোচনা,

সংবিধান-কমিটিতে যেসব দেন—দরবার চলেছিলো তার পেছনে অধ্যাপক রাজ্জাকও ছিলেন।

কথাটা আরম্ভ করলেন অধ্যাপক রাজ্জাক এভাবে : পাঞ্জাবি মুসলমানরা ডেভেলপমেন্টের যে এ্যাডভান্টেজটা পেয়েছিলো তার একটা কারণ ব্রিটিশ পিরিয়ডেই ওখানে ইরিগেশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এ থেকেই পাঞ্জাবে ক্যানাল কলোনি হয়। তার চেয়েও বড় হচ্ছে আর্মি রিক্রুটমেন্ট। Post-47-এ Main problem হলো যে, পাঞ্জাবিরা ঘরে থাকতো না। সারা ভারতে তারা চাকরি করত হয় আর্মিতে নয় তো In hundreds of other civil occupations : the Punjab leaders were faced with this nightmare. এদের এখন কি করা হবে। This was a matter of supreme concern. সুতরাং সব কিছু পাঞ্জাবের জন্য করতে হবে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ওয়াজ দি ফাদার ফিগার। জাফরুল্লাহ খান গোলাম মোহাম্মদ এদেরও ভূমিকা ছিল। দিজ থ্রি মেন কনসারটেডলি ফলোড দিজ থিংস ডিড দি জব ফর দি পাঞ্জাবিজ। এটা অন্যরা ধরতে পারল না। ক্যাবিনেট সেক্রেটারি হিসেবে যখন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী দায়িত্ব পেলো তখন ১২৫টা এ্যাপয়েন্টমেন্ট হল। তার মধ্যে মাত্র ৫-৭টি বাঙালি ছিল। আমি ১৯৫০ পর্যন্ত দেশে ছিলাম না। ১৯৫০-এ ফিরে আসার পরে ফজলুর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়। আমি তাকে বললাম : কি করবার লাগছেন, আপনারা। তিনি তো এটা ওটা বললেন। ফজলুর রহমান সাহেবও বৈষম্যের ব্যাপার নিয়ে হয়ত অত ভাবতেন না। তিনি এক পাকিস্তানেই বিশ্বাস করতেন। ... ১৯৫৬ সালের কনসটিটিউশন তৈরির সময়ে আই টুক সাসটেইনড্ ইন্টারেস্ট।

আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে প্রশ্ন করলাম, সংবিধানের ব্যাপারে আপনাকে কি ফজলুর রহমান সাহেব জড়িত করেছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : তাঁর চেয়েও বেশি মোহন মিয়া। (ইউসুফ আলী চৌধুরী)।

আমি একটু আশ্চর্য হলাম। মোহন মিয়া জমিদারি মেজাজের মানুষ ছিলেন। তিনি কনসটিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলির মেম্বার ছিলেন এবং ফজলুল হক সাহেবের কৃষক-শ্রমিক পার্টির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ছিলেন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় থেকে। অধ্যাপক রাজ্জাকের সঙ্গে মোহন মিয়ার মেজাজ খাপ খায় না। আমি তাই আশ্চর্য হয়ে অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলাম : মোহন মিয়া কেমন করে আপনাকে যোগাড় করলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ইট ওয়াজ এ্যাবসোলিউটলি এ্যাকসিডেন্টাল। একবার কোনো এক মজলিসে এই সমস্ত প্রব্লেম নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। অনেক ছাত্রও আছে। মোহন মিয়া আমাকে জানতেনও না। খুব সম্ভব কেউ, বোধহয় মোশতাক, আমার নাম তার কাছে করে থাকবে। মোশতাক আমার ছাত্র ছিল।

মোশতাক সাজ্জাদের চাইতে একটু সিনিয়র। ... রেজা-এ-করিম সাহেব আমাকে একদিন একটা স্লিপ দিয়ে পাঠালেন : 'আমার বাড়িতে আসবেন।' যে আমার কাছে স্লিপটা নিয়ে এসেছিলো তাকে আমি বললাম, রেজায়ে করিম এতবড় কবে হলেন যে, তিনি স্লিপ দিলেই আমি যাব। কথাটা হয়ত আমার পক্ষে বলা ঠিক হয়নি। একটু আনফেয়ার হয়েছিল। রেজায়ে করিম আমার চেয়ে বয়সে বড়। উনি আমাকে তুমি করে বলতেন। আমি তখন শান্তিনগরে থাকি। পরের দিন দেখি, রেজা-এ-করিম সাহেব নিজে গাড়ি নিয়ে এসে বাসায় উপস্থিত। এসেই বললেন : আরে তুমি নাকি আমারে কি কইছ? এই দেখ, আমি নিজে চইলা আইছি। ... এই অবস্থা দেখে আমি তো হকবাক। আই ওয়াজ কমপ্লিটলি ননপ্লাসড্। আমি একটু মাফটাপ চেয়ে বললাম, আমি কার কাছে কি ঠাট্টা কইরা কইছি ... রেজা-এ-করিম থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে না, তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি কাল দুপুরে আমার বাড়িতে খাবে। ... কয়েকজন মানুষ আসবে। একটু কথা আছে।' আমি আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বললাম, ঠিক আছে, আমি আসবো। পরদিন সেখানে যেয়ে দেখি, আবু হোসেন সরকার রয়েছেন। আবু হোসেন সরকার তখন এখানকার চিফ মিনিস্টার। মোহন মিয়া আছেন। আরো কয়েকজন সেখানে বসা। তারা পাকিস্তানের কনসটিটিউশন নিয়ে আলোচনা করছেন : কী করবেন। আমি যেতেই বললেন! প্রফেসর সাহেব, আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।

আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলাম : এটাকি ১৯৫৫-তে?

: হ্যাঁ, ১৯৫৫ সালে। ... আমি বললাম, দেখুন কনসটিটিউশন ইত্যাদি নিয়ে কথাটথা কইবার দরকার নাই। যাইয়া এদের শুধু একটা কথাই কন : Capital of Pakistan would be transferred to Chittagong. আই থিংক, এ হলেই অল দ্যাট ইউ ওয়ান্ট, ইউ উইল গেট। বর্তমানের যে ব্যবধান, It is because the capital is in karachi, আর কিছু করবার দরকার হবে না। ওয়েস্ট পাকিস্তানে যা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, ঐ ফ্যাকট থেকেই হয়েছে। রেজায়ে করিম টুক আপ দি আইডিয়া। জাদরেল উকিল তো। দুঘণ্টা তিনঘণ্টা ধরে আমরা কেবল এই আলোচনাই করলাম। আমি কথাটা রসিকতা হিসেবেই বলেছিলাম। ওখানে মোহন মিয়া ছিলেন। মোহন মিয়া বেশ মন দিয়ে শুনছেন, দেখলাম। আলোচনা ও খাওয়া-দাওয়ার পরে মোহন মিয়া আমাকে বললেন, প্রফেসর সাহেব চলেন, আপনাকে পৌঁছে দিতে আসি। পথে গাড়িতে আমাকে বললেন, আপনাকে আমাদের সঙ্গে করাচি যাইতে হইব। আমি বললাম : আমি যাইয়া কী করমু। মোহন মিয়া বললেন : আপনি কনসাটিটিউশন বানাবেন। আমি তাঁকে ঠাট্টা হিসেবে বললাম : ঠিক আছে আমাকে একটা রিটার্ন টিকিট করে দিবেন। কারণ ওখানে যেয়ে ফিরে আসবার পয়সা তো আমি পাব না। ওখানে যেয়ে আপনাদের সঙ্গে কী রকম বনিবনা হবে, তাতো জানি না। আই মে ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক

নেকসড ডে। আই সুড বি ফ্রি টু ডু দ্যাট। ঐটা করলে আমি রাজি। মোহন মিয়া বললেন : ঠিক তো? আমি বললাম, হ্যাঁ ঠিক আছে। ... মোহন মিয়া আরো দুতিনদিন আমার বাসায় এসেছিলেন। খুব এনারেজটিক মানুষ ছিলেন। দোষত্রুটি যাই থাক, হি ওয়াজ আফটার অল লাইকেব্‌ল। দুই তিনদিন পরে সেক্রেটারিয়েট থেকে আমার খোঁজ পড়ে গেল। গোলাম ফারুকী তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চিফ সেক্রেটারি। সে খোঁজ করেছে হাদি সাহেবের কাছে। হাদি সাহেব আমাদের রেজিস্ট্রার। হাদি সাহেব তো প্রায় ঘাবড়ে গেছেন। আমার সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করলেন! আমাকে বললেন, কী করেছেন আপনি, চিফ সেক্রেটারি আপনার খোঁজ করতেছে। আমি বললাম, কই আমিতো এমন কিছু করি নাই যে আমার সম্পর্কে খোঁজ করতে হবে। এরপরে আর একজন এসে খবর দিল, আপনি করাচি যাবেন। আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা সরকার থেকে আপনার খোঁজ করছি। আপনি চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করুন। পরের দিন মোহন মিয়ার সঙ্গে দেখা। আমি বললাম, কী ব্যাপার? চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে আমি দেখা করতে যাব কেন? যা করবার আপনি করুন। আই এ্যাম নট গোয়িং টু সি দি চিফ সেক্রেটারি। আমার কী দরকার?

মোহন মিয়া বললেন, আপনারে যাইতে কইছে নাকি?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

: আর কইবে না।

দুএকদিন পরে আবার মোহন মিয়া আসলেন : 'টিকিট ফিকিট সব করেছি। কাল আপনাকে করাচি যাইতে হবে।' ... ফজলুল হক সাহেব তখন সেন্টারে মিনিস্টার। একবার ঢাকা এসেছেন। মোহন মিয়া একদিন আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেছেন। সেখানে দেখলাম হামিদুর হক (হামিদুল হক চৌধুরী) বসন্ত দাস, আরো অনেকে আছেন। ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে এর আগে আমার দুএকবার দেখা হয়েছিল।

কি মিয়া ভালো আছেন তো : এই রকম কিছু বাক্যালাপ করলেন। খুব উৎসাহ না। কিন্তু মোহনমিয়ার খুব আগ্রহ। মোহন মিয়া সেই করাচি যাওয়ার কথা বললেন। আমি সত্যই ব্যাপারটাকে অতো সিরিয়াসলি নেই নাই। আমি মোহন মিয়াকে বললাম, আরে সাহেব, আমি তো ঠাট্টা হিসেবে বলেছিলাম।

মোহন মিয়া বললেন : আরে না, আমি সব ব্যবস্থা করেছি। এখন আপনি না গেলে আমারই বা মুখ রক্ষা হবে কেমন করে। আর আপনার সম্পর্কেও অন্য সবাই ভাববে কি?

আমি দেখলাম, মহা বিপদ। বললাম রিটার্ন টিকিট করেছেন?

: হ্যাঁ, রিটার্ন টিকিট করেছি। যা কইছেন, তাই করেছি। ... অধ্যাপক রাজ্জাকের বর্ণনাটি বেশ কৌতূককজনক মনে হচ্ছিল। অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ঠিক আছে, আমি যামু। গেছি করাচিতে। এই প্রথম আমি জীবনে করাচি গেলাম।

ওখানকার কিছু জানি না। যেয়ে দেখি এয়ারপোর্টে স্টেট মিনিস্টার এল আর খান এসেছে। এল আর খান আমার আত্মীয় হয়। এল আর খান বললো, আমার সঙ্গে চলো। অন্যখানে থাকা লাগবে না। আমার সঙ্গে থাকবে। আমি বললাম, চলো, আমি করাচির কিছু জানি না।

দ্বিতীয় দিনে গভর্নমেন্ট দলের মিটিং হবে। তার আগে মোহন মিয়ারা বসলেন। আমি কিছু পয়েন্ট লিখে নিয়ে গেছিলাম। আমি বললাম, প্রথমে আপনারা আর্মির ব্যাপারটা তুলুন। তারা বলবে, আর্মি সেন্ট্রাল ব্যাপার। আপানারা বলুন : ঠিক আছে, সেন্ট্রাল ব্যাপার। কিন্তু There should be devolution of power, Provincial government should be responsible for recruitmcnt and organisation of one or two divisions in East Bengal মোহন মিয়াকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম। তারা গভর্নমেন্ট পার্টির মিটিং-এ যাবে। আমি তো আর সে পার্টি মিটিং-এ যেতে পারিনে। সে মিটিং থেকে তারা ফিরলে প্রথম দিন মোহন মিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম : কি, আর্মির কথা তুলেছিলেন?

মোহন মিয়া বললেন : না।

দ্বিতীয় দিনের পরে জিজ্ঞেস করলাম? কি, আর্মির কথা কইছিলেন?

: না।

আমি বললাম : তাহলে আপনাগো কী এ্যাডভাইস দিমু? যার সম্পর্কে বলে দেব, সে সম্পর্কে আপনারা কথা তুলবেন না, তাহলে আমার কী করণীয় আছে?

: আচ্ছা আজ কইমু।

: পরের দিন আবার জিজ্ঞেস করলাম : কি, কইছিলেন?

: না।

: তার মানে?

একথা বলতেই মোহন মিয়া একেবারে চটে উঠলেন : আমি আপনার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য না।

আমি তখন কিছু বললাম না। চুপ করে রইলাম। সে তো হৈচৈ করে আরো কী কী কইল। সে চলে যাওয়ার পরে লুৎফর রহমানকে (এল আর খান) বললাম, দেখ, মোহন মিয়া তোমাদের পার্টি বস। তুমি একটা মিনিস্টার অব স্টেট। তোমার বাড়িতে আমি থাকি। এখন মোহন মিয়ার লগে যদি একটা ঝগড়া-ফ্যাসাদ করি তাহলে তোমার ভবিষ্যতে ক্ষতি হতে পারে। এটা আমি চাই না। তবে তুমি মোহন মিয়াকে কইবা He is not to talk like that, This is not tobe repeated. লুৎফর আমাকে আবাল্য চিনে। কাজেই I thing he repeated it literally. মোহন মিয়াকে এই কথা বলেছে।

পরের দিন আবার পার্টি মিটিং। আবার সেই কথা। আমি জিজ্ঞাসা করেছি, কথাটা পার্টি মিটিং এ তারা তুলেছে কিনা। আর আমি জিজ্ঞেস করতেই সে

ফ্লেয়ার আপ করতে গেছে। কিন্তু করতে যেয়েই থেমে গেল। থেমে ঠাণ্ডাভাবে বললেন, প্রফেসর সাহেব, আমার বয়স হয়েছে। আমার কথার ধরণই এই রকম। আমি সবসময় যে উচিত মতো কথা কই, তা না। তবে আমি বলি, আমার এমন কথায় রাগ কইরেন না। আমি এরকম বললেও আই ডোন্ট মিন ইট।

আমি তাঁর এমন কথা শুনে হেসে ফেললাম। আমি বললাম : বেশ! আমি কিছু মাইন্ড করি না। তবে আপনিও দয়া করে মনে রাখবেন, আমার প্রফেশনটা মাস্টারি। আমারও টেম্পার ঠিক থাকে না। আই মে অলসো ফ্লেয়ার আপ। কিন্তু আপনি কিছু মাইন্ড করবেন না। So tet each of us forget it. আপনার বয়স হইছে, তা দেইখা। আর আমি মাস্টারি করি, সেই বিবেচনায়। অন দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং উই ক্যান গো এ্যাহেড।

অধ্যাপক রাজ্জাক কাহিনীর এখানে একটু থামলেন। তারপরে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন : মোহন মিয়া ভালো মানুষ ছিলেন না, সেকথাই শুনি। তবে I have not seen a man more dedicated to the cause of East Pakistan.

আমার সঙ্গী ফজলে রাব্বি অধ্যাপক রাজ্জাককে প্রশ্ন করলেন : কিন্তু আর্মির যে প্রশ্ন আপনি Suggest করেছিলেন তা তাঁরা সরকারি রদলের মিটিং-এ তুলল না কেন?

প্রশ্নটা আমারও ছিল। আমিও স্যারকে বললাম, এটা কি সাহসের অভাব?

অধ্যাপক রাজ্জাক একটু ব্যাখ্যা করে বললেন : তখন নানা গণ্ডগোল চলছে। তারপর মিটিং-এ পাকিস্তানের Prime Mintster, অমুক নবাব, তমুক জাঁদরেল বক্তা এদের সামনে। ফজলে রাব্বি ব্যাখ্যাটা পূরণ করে বললেন : মানে বাঙালি লিডাররা Inferiority complex থেকে সাহস বোধ করে নাই।

অধ্যাপক রাজ্জাক স্বীকার করলেন : তা কি অস্বীকার করা যায়? এদের হালচালই আলাদা ব্যাপার! একটা এ্যাসেম্বলি মেম্বারের দশটা-পনেরটা গাড়ি। বেয়ানে এক কাপড় পইরা আসে, বিকেলে আর কাপড় পইরা আসে। আর আপনাগো কাপড়-চোপড় হইল একটা ছেঁড়া কোর্তা!

এটা রাজ্জাক সাহেবের কল্পনা নয়। এটা আমার নিজেও অভিজ্ঞতা। আমি তাই বললাম : একথা ঠিক স্যার। আমি দেখেছি, ওখানকার একজন মেম্বার, মানে পার্লামেন্টের মেম্বার সদস্য হিসেবে যা allowance পেত তা তাদের বেয়ারা চাপরাশীদের বখশিশেই খরচ হত।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আরে, আমি একদিন আমার চোখের সামনে দেখলাম, আমাদের এক লিডার আমজাদ আলীকে বলছে, স্যার আপনিই প্রথম ফাইন্যান্স মিনিস্টার যে আমাদের সঙ্গে ভালো করে কথা কইছেন! এই কথা শুনে একদিন মিটিং-এর পরে তাঁকে ধরলাম : ব্যাপার কী?

আমজাদ আলী এ্যাসেম্বলির মেম্বার, আপনিও এ্যাসেম্বলির মেম্বার। আর আপনি তার লগে এইভাবে কথা কইবার লাগছেন। আপনাদের Advise দিতে আসে কোন পাগল! এমনভাবে কথা বলার পরে আমার নিজের মনটাও খারাপ লাগলো। I didont have to talk so rudely to the man. কিন্তু ঐ ব্যবহার চোখে দেখে আমি আর সহ্য করতে পারি নাই।

অধ্যাপক রাজ্জাক সংবিধান সম্পর্কে সেই আলাপ আলোচনার কথা উল্লেখ করে বললেন : কয়েকদিন পরে গভর্নর মুশতাক আহমদ গুরমানীর প্রস্তাবে বোধহয় ঠিক হয় যে, সরকারি দলের মধ্যে ছোট একটা কমিটি হবে, তাতে দুপক্ষ থেকে লোক থাকবে। তার মধ্যে Consembly র মেম্বার ছাড়া Adviser থাকবে। এবার তো আর উপায় নাই। এবার আমাকে সাক্ষাৎভাবেই কমিটিতে থাকতে হবে। ঢাকা থেকে মুজাফফর আর আতাউরকে জোর করে আনালাম। এবার দেখি, মিটিং-এ আমরা যা কই, তাই পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তারা স্বীকার করে।

আমি একটু পরিষ্কার হওয়ার জন্য অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলাম। মুজাফফর চৌধুরী সাহেবকে আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : মুজাফফর আর সাদেককে তারাই নিয়ে গিয়েছিলো। এখন আমরা যা কই তাকেই তারা মেনে নিতে বলে, হ্যাঁ, ঠিক হ্যায়! তখনো আতাউর আসে নাই। এখন আমি চিন্তা করলাম, Constitution-এর মধ্যে কী থাকবে না থাকবে তা আমি কেমন করে বলব। আমি তো আর এর এক্সপার্ট না। আমি বললাম, আতাউরকে আনতে হবে। মোহন মিয়া এবং দলের অন্যরা বললো : কে আতাউর হোসেন? আমি বললাম, আপনাদের দেখার দরকার নেই। তারা বললো : ঠিক আছে। আমরা আনাচ্ছি আতাউর হোসেনকে। তখন আতাউর হোসেনকে ঢাকা থেকে নেয়ানো হল।

আতাউর হোসেন সাহেবকে আমি ভালো করে চিনি না। সেজন্য আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলাম, আতাউর হোসেন এখন কোথায় আছেন? অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন, আতাউর এখন বিলেতে আছে। ... এই সময় আমি প্রথম এই East-West-এর ব্যাপারটা দেখতে শুরু করলাম। আতাউর আসার পরে। একটা পারটিকুলার পয়েন্ট, বিশেষ করে লাইসেন্স-এর ব্যাপারটা তুললাম। আমি কমিটিতে বললাম, তোমরা যে লাইসেন্স দাও ইস্ট পাকিস্তানকে, ওয়েস্ট পাকিস্তানকে, এটা কী বেসিসে দাও? আমাকে তারা একটা শর্ট এ্যানসার দিল। একটা শর্ট পিরিয়ড ছিল যখনও জি, এল বা ওপেন জেনারেল লাইসেন্স ছিল। সে সময়ে স্বাভাকিভাবে West Pakistan বেশি পেয়েছে। কারণ ওয়েস্ট পাকিস্তান যে টাকা খরচ করতে পেরেছে, ইস্ট পাকিস্তানের খরচ করার সে ক্যাপাসিটি নাই। একথার জবাবে আমার রেডি এন্যসার ছিল না। কারণ, হিসাব-নিকাশের সঙ্গে

আমি অত ফেমিলিয়ার ছিলাম না। আতাউর আসার পরে আমি তাকে বললাম : এটার জবাব কী? আতাউরের স্ট্যাটিস্টিক্যাল মাইন্ড। সে বললো : ওটা ওভাবে দেখছেন কেন? ও.জি.এল যদি দুবছর চলে থাকে তবে ও.জি.এল-এর আগের বছরের ফিগার নেন। ও.জি.-এল এর প্রথম ছমাসে ইস্ট পাকিস্তান এত পার্সেন্ট পেয়েছে দেখেন। দ্বিতীয় ছয়মাসে কতো পার্সেন্ট? ওরা শুরু করেছে হাজার দিয়ে। ধরুন ইস্ট পাকিস্তান শুরু করেছে একশ' দিয়ে। একশ' থেকে আপনার যদি পাঁচশ' হয়ে থাকে তাহলে আপনার আমদানির ক্যাপাসিটি ৫০০% পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ওদের ক্যাপাসিটি এক হাজার থেকে যদি ১২০০-তে পৌঁছে থাকে তাহলে তাদের ক্যাপাসিটির বৃদ্ধি ২০%। কাজেই ক্যাপাসিটির কথা টিকে না। আতাউরের এ ব্যাখ্যায় আমি তো লজ্জাই পেলাম। এই সোজা কথাটা আমার মনে হয় নাই। মানে ক্যাপাসিটির কথা বলে পশ্চিম পাকিস্তান প্রশ্নটা যেভাবে এড়িয়ে গেছে, সেভাবে তারা এড়িয়ে যেতে পারে না। আমি আতাউরকে বললাম, আমিতো এক্সপার্ট নই। কিন্তু এগুলো তোমাদের নজরে পড়ে নাই? তোমরা তো এই লাইনেরই লোক। আতাউর সম্পর্কে সকলেরই বেশ উঁচু ধারণা ছিল। তখন আতাউর আমাকে ১৯৫০ সালে তারা যে Economic appraisal coummittee's report বার করেছিল, সেটা দেখাল। আতাউর বললো : এই দেখেন স্যার। এগুলি আমরা বলেছিলাম। অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন, ঐ দেখেই আতাউরদের তাড়ানো হয়। আর ওখান থেকেই আওয়ামী লীগের চেতনা জাগলো। তারা দেখলো, একটা পাকিস্তান তো হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তানের ফজলুলর রহমান, নুরুল আমীন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলো। তবে তাদের দেন-দরবারের ভাষাটা আলাদা ছিল।

ফজলে রাব্বি একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন : বৈষম্যের ব্যাপার তারা বুঝতে পেরেছিলো?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হ্যাঁ, আতাউর ঐ Economic appraisal committee-র রিপোর্ট Chapterwise আমাকে দেখাল। আতাউর হোসেন ঐ কমিটির মেম্বার ছিল।

অধ্যাপক রাজ্জাক আলাপ করছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য এবং বিরোধের বিষয়ে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তির কথা উল্লেখ করে বললেন : আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের সামরিক চুক্তির ব্যাপারটা সামরিক বাহিনীর শক্তির পরিচায়ক ছিল। Muslim League was dead against it. ইসকান্দার মীর্জা, গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী-তারা পাঞ্জাবি তথা Army-র পক্ষ থেকে এটাকে সমর্থন করেছিল। আসল ব্যাপার ছিল দেশ রক্ষা খাতের খরচটা। By 1954 Pakistan army had aquired enough power. প্রথম রাওয়ালপিন্ডি

Conspiracy case হল '৪৮-'৪৯-এ। সুতরাং Army has been always with its hand on the trigger. এ পর্যন্ত সুবিধা করতে পারে নাই। By 54-55 it had become strong Muslim League আর যাই হোক, Political ছিলো। Political party army rule চাইতে পারে না। আর Army-ও Political party-কে সহ্য করতে পারে না।

অধ্যাপক রাজ্জাকের মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এর কোনো বিস্তারিত আলোচনা যে করেছেন তা নয়। আমরাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে বেশি দূর যেতে চাইলাম না বলে এ প্রশ্নটির বিস্তারিত আলোচনায় গেলাম না। অধ্যাপক রাজ্জাক শুধু বললেন, এটাই হচ্ছে undeveloped countries-এর Problem : civil mititary relation. যেকোনো Political party যে limitation-এর মধ্যে কাজ করে সে ইচ্ছে সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তি। ১৯৭০ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি Political Science Association-এর একটি সম্মেলন হয়েছিল। তাতে আমাকে একটি ভাষণও দিতে হয়েছিল। তাতে আমার বক্তব্য এইটিই ছিল। ১৯৬০ সালে হারভার্ড-এ একটি ছোট Paper পড়েছিলাম। তারও বিষয়বস্তু এক। Civil militiary relation. এটাই হল warf and woof of poliics in all developing countries. বাংলাদেশের তো একটা কথা চালু আছে। Army-কে শেখ মুজিব যথেষ্ট খাতির না করার অপরাধেই নিহত হয়েছে ...

আর একদিনের কথা। আমার নিজের আগ্রহ ছিল অধ্যাপক রাজ্জাকের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর জাকির হোসেন এবং মোনেম খানের কী 'সংলাপ' সংঘটিত হয়েছিল তার কাহিনী শুনবো। মোনেম খানের ব্যাপারটা বোধহয় '৬৮ সালে। কীভাবে যেন কথাটা উঠেছিলো যে ইসলামিক একাডেমির হলে মোনেম আর অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের বাকযুদ্ধ হবে। বিষয়বস্তু : কেন আমরা পাকিস্তান চেয়েছিলাম। আবুল হাশিম সাহেব তখন ইসলামিক একাডেমির পরিচালক। এককালের রাজনীতিক নেতা। তাঁর উদ্যোগেই ব্যাপারটা সংঘটিত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটলো না। কেন ঘটলো না তার কথাও অধ্যাপক রাজ্জাক বলেছিলেন। কিন্তু পরে। আজ আমি বললাম, স্যার, জাকির হোসেনের সঙ্গে আপনার সেই Dialogue-টার কথা একটু বলুন।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : সে আর একদিন বলব। আজ বলি কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের কথা।

অধ্যাপক রাজ্জাকের এ প্রস্তাবটি যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি আনন্দের বিষয়। অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন কেবল বিজ্ঞানী নন, তিনি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকের অধ্যাপকদের অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন তাঁর নিজের এমএসসি পরীক্ষার পরেই সেই ১৯২১-২২ সালে। কেবল পুরাতন এবং প্রবীণ অধ্যাপক বলেই যে তিনি আমাদের

আগ্রহের বিষয়, তাই নয়। সরল আত্মভোলা মানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত ছাত্র-অধ্যাপক-শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক—সকল মহলে ব্যাপ্ত। বিষয় এক না হলেও অধ্যাপক রাজ্জাকেরও অধ্যাপক-হচ্ছেন কাজী মোতাহার হোসেন। তাই অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে অধ্যাপক রাজ্জাকের প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিচারণের প্রস্তাবটি আমাদের মনেও বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করলো। আমরা সানন্দে আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, খুব মজার ব্যাপার তো। বলুন স্যার কাজী সাহেবের সঙ্গে আপনার প্রথম সাক্ষাতের কথা।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন। এটি আমার বেশ মনে আছে। আমি তখন মাত্র ভর্তি হয়েছি ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু দাবা খেলা পছন্দ করি। শুনেছি কাজী সাহেব দাবা খেলেন। একদিন তাঁর কার্জন হলের ঘরে, Physics laboratory-তে যেয়ে হাজির হলাম। দেখলাম তিনি একটা কি কাজ করছেন। আমি তাঁর পেছনে যেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি টেরও পেলেন না। তিনি তাঁর কাজ করে চললেন। এই তাঁর স্বভাব। যা করেন, একাগ্রভাবে করেন। তারপর এক সময়ে পেছনে ফিরে আমাকে দেখে চমকে গিয়ে বললেন : তুমি কে? তুমি কী চাও? আমি দাবা খেলার উল্লেখ করতেই বললেন : ও তুমি দাবা খেল। বেশ! বেশ! একটু অপেক্ষা কর। আমি হাতের কাজটা সেরে নিই। কিন্তু পরে তিনি ঘর থেকে বেরুলেন। তাঁর সেদিনকার পোশাকের কথা আমার এখনো মনে আছে। তখন তিনি দাড়ি রাখতেন না। আর ধুতি পরতেন। দেখলাম ঘরের পাশে একটা সাইকেল আছে। সেটা নিলেন। নিয়ে এসে আমাকে বললেন, তুমি পেছনে ওঠ। আমি তো কমপ্লিটলি টেকেন এ্যবাক। প্রস্তাব শুনে হতবাক। জিনিসটা ভাবতে আজ মজা লাগছে। কিন্তু সেদিন স্যারের প্রস্তাবটায় অবাক না হয়ে উপায় ছিল না। তখন কাজী সাহেবের মাস্টারির বয়স হয়ত দশ বছর হয়ে গেছে। তখনকার দিনে শিক্ষক মাত্রকেই আমরা সমীহর ভাব নিয়ে দেখতাম। কাজেই স্যারের সাইকেলের পেছনে চড়ার প্রস্তাব তো অদ্ভুত। কাজী সাহেব কিন্তু সরল, নিঃসংকোচ। তিনি বলতে লাগলেন : ওঠো। এতে সময় বাঁচবে। একটা গেম বেশি খেলার সময় পাওয়া যাবে। অকাট্য যুক্তি। কী আর করি। তাঁর সাইকেলের পেছনে চড়ে তাঁর সেগুনবাগানের একতলা বাড়িটিতে এলাম। সে বাড়ি এখন তেতলা। কিন্তু তখন দাবা খেললাম। আমরা খেলা দেখে তো তিনি বেশ খুশি। বাহবা দিয়ে বললেন : তুমি তো বেশ খেল। তোমার ভবিষ্যৎ আছে। খেলা শেষ তো হল রাত বারোটায়। সেই '৩১ সালের রমনা। জনশূন্য এলাকা। আমি যাব সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। তিনি তো ঘরের বাইরে এসে বিদায় জানিয়ে বললেন : তাহলে তুমি এসো। আমি তো মনে মনে ভয়ে কাঁপছি। কাজী সাহেবের সাংসারিক জ্ঞান চিরকালই আজকের মতো। কাজেই তাঁর এসব কিছু মনে করি নি। এতো রাত্তিরে আমি যাব কেমন করে। আমি হেঁটে কিছু দূর এগিয়েছি তখন তিনি পেছন থেকে

ডেকে বললেন : ওহে শোন, রাস্তার পাশ দিয়ে না যেয়ে, একটু মাঝখান দিয়ে যেও। সাপ-টাপ আছে।

এই আমার কাজী সাহেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। বলে অধ্যাপক রাজ্জাক আনন্দে হেসে উঠলেন। তারপর একটু হেসে বললেন : কাজী সাহেবের কথায় কাজী নজরুল ইসলামের ঢাকা আসারও কথা ও মনে পড়ে।

আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলাম। তবে তিনি প্রথম এসেছিলেন?

: আমরা তখন স্কুলে পড়ি। '২৫-'২৬ সালে হবে। তখনই আমি প্রথম কাজী মোতাহার হোসেনকে দেখেছিলাম। দাড়ি ছিল না। ধুতি-শার্টই বেশি পরতেন। তখন কোলকাতা থেকে আসতে হত ঢাকা মেইলে। ঢাকা মেইল পৌছার টাইম খুব ইররেগুলার ছিল নজরুল ইসলাম আসেন মিটিং বেশকিছুটা প্রগ্রেস করার পরে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম। এটা কোন মিটিং-এর কথা বলছেন স্যার?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এটা পুরান মুসলিম হলের মিটিং। এখন সেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বিল্ডিং। তার ডাইনিং হলে মিটিং হচ্ছিল। কে যেন একটা প্রবন্ধ পড়ছিলেন। এই সময়ে নজরুল ইসলাম ঢুকলেন। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ পাঠ বন্ধ হয়ে গেল। নজরুল ইসলামও কমপ্লিটলি অবলিভিয়াস যে কোনো একটা মিটিং হচ্ছিল। ঢুকেই একটু মাফ চাইলেন। আমি তো ইচ্ছে করে দেরি করি নি। তোমাদের ঢাকা মেইল কীভাবে আসে তাতো তোমরা জানো। তাঁর বোধহয় একটা কবিতা লিখে এনে পাঠ করার কথা ছিল। বোধহয় 'ওমর ফারুক'। তার উল্লেখ করে বললেন : ওটা আমার লেখা শেষ হয় নি। তার চেয়ে এর আগে একটা কবিতা লিখেছিলাম। 'আমানুল্লাহ', সেটা পাঠ করে শুনাই।

অধ্যাপক রাজ্জাক প্রায় ৫২ বছর আগের সেই দিনটির কথা স্মরণ করে বললেন : সেই পাঠের কথা আমার এখনো মনে আছে। কবিতা পাঠ হয়ত অনেকে এর চেয়ে ভালো করতে পারতেন। কিন্তু He had s style of his own।

আমি বললাম : হ্যাঁ স্যার, কবির রেকর্ড শুনেছি। গলাটা একটু ভাঙা।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : তখন গলা ভাঙা না। Full vigour. পোশাক-পরিচ্ছদও একটু অদ্ভুত ছিল। ভায়োলেট রঙের ট্রাউজার। খদ্দরের গেরুয়া রঙের আচকান। আর cross-belt-এর মতো একটা চাদর। মাথায় বাবরী চুল। কবিতা পাঠ শেষ করে নিজেই বললেন : একটা গান গাই। কিন্তু একটা নয়। বেলা পাঁচটা পর্যন্ত কেবল গান গেয়ে চললেন। মিটিং-এর অন্য কোনো বিষয় আর হল না। পাঁচটার দিকে বোধহয় ওখান থেকে ওঠে Gate House-এ এসে উঠলেন। ওখানে ওঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। উনি ঘরে না ঢুকে বাইরে মাঠে বসলেন। মাঠে একটানা কথা বলে চললেন। ওখানে কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন। এই কাজী মোতাহার হোসেনকে প্রথম দেখলাম। নজরুল ইসলাম, নানান কথা

বললেন। এর মধ্যে একটা কথা মনে এখনো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে। বেশ ক্রিটিক্যাল। কাজী সাহেব কথায় কথায় বললেন : এই যে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, এগুলি লাউগাছের মাচার মতো। নজরুল তার জবাবে বললেন : কিন্তু লাউগাছের চেয়ে মাচা বেশী বড় হয়ে গেছে। তারপর গেট হাউসের উপরে যেয়ে পোশাক বদলাতে বদলাতে বললেন : একটু ভদ্র পোশাক পরে নিই। এবার আচকান পাজামা বদলে ধুতি-শার্ট পরে এলেন। তারপরে আবার গান শুরু করলেন। অল্প কয়েকজন লোক তখন। তার মধ্যে I was the youngest. কোনো রকমে এক কোণে একটু জায়গা করে নিয়েছিলাম। মনে হয় রাত দুটো পর্যন্ত গান করলেন। একটার পর একটা Gate House এ বসে। একটার পর একটা গান গাইতেছে আর গান গাইতেছে। রাত দুটার সময়ে almost half intoxicated রওনা দিলাম। ডাফরিন হস্টেলে যাব।

আমি বললাম : আপনি কি ডাফরিন হস্টেলে থাকতেন তখন।

: হ্যাঁ তখন ডাফরিন হস্টেলে থাকতাম। এখন যেটা কাজী নজরুল কলেজ, লক্ষ্মীবাজারের এই মাথায় মিউনিসিপ্যালিটির অফিসের পশ্চিমে, সেখানে। এখানো এ হস্টেলটা আছে। মুসলিম হইতে পড়তাম, আর ডাফরিন হস্টেলে থাকতাম।

আমি কাজী সাহেব সম্পর্কে বললাম : ১০২৫-২৬ সালের কথা বলছেন। তখনো কি তিনি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক?

: হ্যাঁ, উনি তখন শিক্ষক।

: উনি ইউনিভার্সিটিতে কবে এসেছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ইউনিভার্সিটির গোড়াতেই। ১০২১-২২ সালে।

অধ্যাপক রাজ্জাক তারপরে কাজী মোতাহার হোসেন সম্পর্কে আবার বলতে লাগলেন : ঐ দেখার পরে কাজী সাহেবের সঙ্গে আর দেখা নাই। তারপরে ১৯৩১ সালে যখন ইউনিভার্সিটিতে আসি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়।

অধ্যাপক রাজ্জাক এরপরে কাজী সাহেবের সঙ্গে তাঁর সেই দাবা খেলার গল্পটি করেছিলেন। সেই গল্পের শেষে আবার বলেছিলেন। তারপরে '৩১ থেকে যে সময়ে মুসলিম হলে থাকতাম তখন যদি ৮-১০ দিনের মধ্যে না গেছি, হঠাৎ এসে হলে উপস্থিত হতেন। কিহে তুমি যে আর যাও না? তখন আবার নিয়ে আসতেন। আবার দাবা খেলায় বসে যেতাম দুজনে।

কাজী সাহেব সম্পর্কে একটু স্মৃতিচারণ করে অধ্যাপক রাজ্জাকের নিকট আমিও বললাম : হ্যাঁ, তাঁর দাবা খেলার একাগ্রতার কথা সবাই জানত। '৪২-'৪৩ সালে আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। সেই সময়ে ওঁর মেজ ছেলেটি মারা গেল। গেট হাউসের পুকুরে ডুবে। যখন পুকুর থেকে ছেলেকে উঠানো হল, তখন কাজী সাহেবকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজতে খুঁজতে কোথায় দাবা খেলছেন, সেখানে যেয়ে তাঁকে খবর দেওয়া হল। ছেলেটি পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তো। পাশে পুকুর। সাঁতার জানত না।

অধ্যাপক রাজ্জাক পুরনো কথা স্মরণ করে আবার বললেন : কাজী সাহেবের সঙ্গে ৪২-৪৩-এর আর একটা ঘটনা। ঐ গেট-হাউসে আছেন। তখন মাঝে-মাঝেই riot হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি বন্ধ। সন্ধ্যা থেকে কারফিউ। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং মানে বর্তমানের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দক্ষিণ মাথায় ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের ক্লাব। বিকেলের দিকে এসেছি। আসাতেই কাজী সাহেবের সঙ্গে দেখা।

এই যে এসেছ? ভালো হয়েছে। অনেক দিন খেলা হয় নি।

আমি বললাম : না সার খেলতে বসবো না। খেললে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। Cufew। তখন বাসায় ফিরতে পারব না। অসুবিধা হবে। আমার কথা শুনে কাজী সাহেব তো আকাশ থেকে পড়লেন : তুমি ক্ষেপেছো! আমার এসব জ্ঞান নেই? সন্ধ্যা পর্যন্ত কি রাখবো? তার আগেই তোমাকে ছেড়ে দেব। আর কী করা! বসলাম, খেলতে সন্ধ্যা বলতে, রাত দশটায় খেলা! শেষ হল।

খেলা শেষ হলে আমি কাজী সাহেবকে বললাম : স্যার, এই সময়ে যাইতে বললেও আমি যাইতে-টাইতে পারুম না। বার হইলেই রাস্তায় আমারে গুলি করবে।

কাজী সাহেব চিন্তিত মুখে বললেন : তাইতো!

আমি বললাম : নিচে আপনার Drawing room আছে। আমি সেখানে শুয়ে থাকব।

: নিচে মশাটশা আছে যে!

আমি বললাম : না স্যার মশা-টশায় আমার অসুবিধা হবে না। আমি ওখানেই থাকব।

: তুমি খাও দাও নাই কিছু— ।

আমি বললাম : না স্যার, আমি কিছু খাবো না।

কাজী সাহেব তখন বললেন : আচ্ছা। এই বলে উনি উপরে চলে গেলেন। আমি শোবার চেষ্টা করছি। কিন্তু মশার কামড়ে ঘুমানো কি যায়। হঠাৎ রাত দুটা-আড়ইটার সময়ে গেটে হৈচৈ। কী ব্যাপার? বাইরে কারফিউ। পাঠান পুলিশ—এরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইউনিভার্সিটির ভেতরেও ফেফু দারোয়ান ও তার দলবল পাহারা দিচ্ছে। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো : হৈচৈটা কীসের। ব্যাপারটা বোঝার জন্য কাজী সাহেবের নিচের তলার Drawing mom-এর দরজা খুললাম। তখন উপরে কাজী সাহেবের স্ত্রীরও গলা শুনতে পেলাম। তিনি আমার দরজা খোলার শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করছেন কাজী সাহেবকে : নিচে দরজা খুললো কে? নিচের ঘর তো খালি। শুনলাম কাজী সাহেব তাঁর স্ত্রীকে বলছেন : ও কিছু না। কাজী সাহেবের স্ত্রী বলছেন : ও কিছু না, মানে কি? দরজা খুললো কে?

এই পর্যন্ত শুনলাম। আর কিছু শুনলাম না? ২-৩ মিনিট পরে কাজী সাহেব আসলেন : এই দ্যাখো, কী সব বলছে আমাকে।

আমি বললাম : কী বলছে, স্যার?

: বলছে, আমি তোমাকে দাবা খেলতে এনে রেখে দিয়েছি। তোমাকে যেতে দেই নি। শোবার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাকে যা তা বলছে। আচ্ছা, তুমিই বল, আমি তোমাকে বলি নি, এখানে মশাটশা আছে? তুমি কেমন করে থাকবে?

আমি বললাম। হ্যাঁ, স্যার, তাতো কইছিলেনই। আমি না করেছি।

কাজী সাহেব বললেন : দেখ তো, আমার কথা না শুনে না। আমায় বলে, আমি তোমাকে খেতে বলিনি। আমি তোমাকে খেতেও তো বলেছিলাম?

আমি বললাম : হ্যাঁ, স্যার আপনি খেতে বলেছিলেন।

: এখন আমার কথা কিছু শুনছে না। তোমাকে উপরে যেতে বলছে। চল উপরে।

অধ্যাপক রাজ্জাক ঘটনাটি বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলছিলেন। বললেন : ওপরে গেলাম। একদিকে মিসেস হোসেন থাকেন। আর একদিকে কাজী সাহেব। আমি বললাম, এই রাতে আমি আর খাবো না। তবে শুতে হবে উপরে, নিচে আর শোওয়া যাবে না। ...

এই ঘটনার সময়ে অধ্যাপক রাজ্জাকও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর শিক্ষকতার বয়সও পাঁচ-ছ' বছর হয়ে গেছে। কাজী সাহেবের সরল জীবনযাপনের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এই কাজী সাহেব ১৯২১ সাল থেকে ৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত Lectur class II. মাইনে পান দু'শ টাকা। অথচ এ নিয়ে কিছু অনুযোগ করেছেন বলে মনে হয় না।

সবার ক্ষেত্রেই হয়ত এই রেওয়াজ ছিল। তাই আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলাম : তার মানে এমনও তো হয় নি যে কাজী সাহেবকে অন্যায়ভাবে অতিক্রম করে অপর কেউ উচ্চতর পদ পেয়েছ কিংবা অধিকতর মায়না পেয়েছে? এমন কি হয়েছে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : নিয়ম হিসেবে নয়। তবে দুএকটা ব্যতিক্রম ছিল না, এমনও নয়। শিক্ষকদের মধ্যে অল্প ছিল যারা sclection grade-এ দুশ পার হয়ে দুশো পঞ্চাশ পেত। একথা হয়ত ঠিক যে ওঁর Physics-এ research work কিছু ছিল না। কিন্তু class teacher হিসেবে he was one of the most eminent ... এতে আমার কোনো সন্দেহ নাই যে কাজী সাহেবের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু সেই অন্যায় নিয়ে কোনোদিন তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। ২০০ টাকায় ২৫ বছর চাকরি করেছেন। মনে অনেক জোর ছিল ... পরে উনি Statistics-এ PH.D করেন। সে অনেক পরে। দেশ বিভাগের হয়ত পরে। Statistics Department তখনো আলাদা হয় নি। Mathematics এর একটা part হিসেবে Statistics-এর বিভাগ করে কাজী সাহেবকে রিডার করা হয়। এরপর জেনকিনস যখন ভাইস চ্যান্সেলর তখন তাঁকে প্রফেসার করা হয়। দীর্ঘ জীবন কাজী সাহেবের। কিন্তু এর প্রথম ২৫-৩০ বছর আচার আচরণে

একেবারেই তুলনাহীন। শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রথম দিককার জীবনধারণ made impression on the younger people. একটা dedication, জ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্মনিবেদিত, অন্য কোনো চিন্তার স্থান নাই—এই বৈশিষ্ট্য was one of the major elements in the remaking of the mind of the younger generation। এটা গোড়ার দিককার শিখা গোষ্ঠীর অনেকেরই বৈশিষ্ট্য। সেদিনকার শিখা গোষ্ঠীর কার intellectual contribution কী, কতোটা মূল্য, There may be discussion about that.

ঢাকার মুসলিম অধ্যাপক-সাহিত্যিকদের উদারনীতিক চিন্তার মুখপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 'শিখা' এবং তার সংগঠকদের সম্পর্কে অধ্যাপক রাজ্জাককে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন কি না। অধ্যাপক রাজ্জাক বলেছিলেন। তিনি নিজে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ১৯৩১-এর দিকে ইউনিভার্সিটিতে আসেন শিখার প্রকাশ চাঞ্চল্য তার আগেই শেষ হয়ে যায়। তবু স্বল্পকাল স্থায়ী 'শিখা' মুসলিম সমাজের বুদ্ধির মুক্তিতে' একটি স্মরণীয় অবদান রেখেছিলো। তাই শিখা গোষ্ঠীর সঙ্গে সেদিন যারাই জড়িত ছিলেন তারাই সাহিত্য-সংস্কৃতির উত্তরসাধকদের নিকট স্মরণযোগ্য ব্যক্তি। অধ্যাপক রাজ্জাক এই প্রসঙ্গে তাঁদের কথা বলতে যেয়ে বললেন : এই শিখা গোষ্ঠীর kingspin. মধ্যমণি ছিলেন কাজী ইমদাদুল হক। তাঁর চরিত্রেরও এই বৈশিষ্ট্য ছিল। আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এঁদের সাহিত্যকর্মের আলোচনা আমার ক্ষমতার বাইরে। তবে এটা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি যে তাঁদের সকলেরই একটা চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল। এই চারিত্রিক দৃঢ়তাটাই আজ বিরল।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : কেবল শিখা গোষ্ঠী নয়। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ধরলে প্রথম ২০-২৫ বছর যাঁরা শিক্ষক ছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অত্যন্ত Superior লোক ছিলেন : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. সিদ্দিকী। তাছাড়া রমেশ মজুমদার, সত্যেন বসু, জ্ঞান ঘোষ ...

আমি একটু যোগ করতে চাইলাম : ইংরেজির হাসান সাহেবও তো একজন prominent teacher ছিলেন?

: তিনি 'লেকচারার' হিসেবে আসেন। কাজী সাহেবের সম সাময়িক কালে।

অধ্যাপক রাজ্জাক পুরোনো অধ্যাপকদের আরো নাম স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। এস. কে দে (সুশীল দে—এঁরা মস্তবড় লোক ছিলেন। অবশ্য সংখ্যায় যে এঁরা বেশি তা নয়; উপরে দশ-বারো জন। এখন এই ৭৫-৭৬ এ হয়ত একথা ঠিক যে there is no one who reacher that height আগের নাম করলাম, এদের তুল্য নয়। তবে average qualification of the family members, I am sure, is much higher বিশেষ করে natureal sciences-এ। বিজ্ঞানে ভালো Post graduate work করা লোক বেশকিছু আছে।

এ কথাটা অধ্যাপক রাজ্জাক আর একদিনও বলেছিলেন। আজও বললেন : এদের সংখ্যা বেশ। কিন্তু যেদিকটা এখন নাই বলে মনে হয় সে হচ্ছে সেই impact, প্রভাব, যেটা কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হোসেন—এই ধরনের শিক্ষকরা সেদিন সৃষ্টি করেছিলেন।

আমি আবুল হোসেন সাহেবের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে জানতাম না। তাই অধ্যাপক রাজ্জাককে প্রশ্ন করলাম : আবুল হোসেন সাহেবও কি অধ্যাপক ছিলেন? অর্থনীতির?

: হ্যাঁ, শিক্ষক ছিলেন। Commerce এবং Law- তে।

: পরে কি উনি আইনজীবী হন।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : পরে M.L হয়ে কোলকাতা Bar-এ যোগ দেন। ঢাকায় প্রাকটিস করেন নি। ...

পুরোনো শিক্ষকদের সম্পর্কে মন্তব্যে আর একটু যোগ করে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : উপরের দিকের শিক্ষক সম্পর্কে যা বললাম, নিচের দিকে যারা ছিলেন তাঁদেরও একটা considerable number ছিলো যাদের মধ্যে চরিত্রের একটা দৃঢ়তার প্রকাশ ছিল ...

আমি অবশ্য একটু সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইলাম। অধ্যাপক রাজ্জাককে বললাম : কিন্তু এস.কে. দে সম্পর্কে তো এমন কিছু গল্প শোনা যায় যা কিছুটা তার সুনামের হানি করে?

কথাটা আমি বিস্তারিত করি নি। আমরা পরবর্তীকালের ছাত্র। সুশীল বাবুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু মুখরোচক গল্প আমাদের যুগেও ছাত্রদের কানে এসে পৌঁছেছিলো। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা বা বিরাটত্ব সম্পর্কে বিস্ময় ব্যতীত অন্য কোনো প্রশ্ন ছিল না। আমার প্রশ্নটার ব্যক্তিগত দিকের প্রতি অধ্যাপক রাজ্জাক খুব মন দিলেন না। তিনি বললেন : উপরের দিকের শিক্ষকদের অনেকের সম্পর্কেই এরকম অনেক কিছু বলা চলে। They wanted to get even higher or other descriptions of non-palatable treats. তবে বেশির ভাগ ছাত্র সেদিন যাদের সম্পর্কে বেশি আসত তাঁরা ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হোসেন—এঁদের মতো শিক্ষক : these teachers provided the moral to the whole show, This, I fear is lacking these days. এই দিকটা আজ অনুপস্থিত। লেখাপড়ার দিক নয়। লেখাপড়ায় ঐ বড় আট-দশজনকে বাদ দিলে আজকের দিনের লেখাপড়ায় bemoan করার কিছু নাই। A verage ভালো বৈ খারাপ নয়। কিন্তুএ ধরনের impact দেওয়ার মতো শিক্ষক যে lecturer class II হিসেবে আরম্ভ করে would continue indefinitly to show fairly happy তাতে সন্তুষ্ট থাকা—এটি আজকে একেবারেই নাই। একজন মাস্টার কী বলে সেটাই important না। কী সে করে সেটা important. আর একটা কথা খাটি : it is very difficult to mislead

young people. যে শিক্ষকদের কথা বললাম, তাঁরা কী করতেন, তাদের জীবনাচরণ that was quite transparent. এঁরা অধিকাংশই অন্তত : Deputy Magistrate হতে পারতেন। একটা Deputy Magistrate হইলে ৮-১০ বছরে ৮০০-৮৫০ টাকা মায়না হইত : আর এই শিক্ষকরা ৫৫-৬০ বছর বয়সে ২০০ টাকা মায়নায় রিটায়ার করতেন without pension. এটা ছাত্রদের মধ্যে একটা প্রভাব সৃষ্টি করত। এটা নিয়া সভা-সমিতি কইরা কেউ বলতো না, কিন্তু তথাপি প্রভাব সৃষ্টি করত। ...

আমিও আমার পুরাতন শিক্ষকদের দুএকজনের নাম অধ্যাপক রাজ্জাকের কাছে উল্লেখ করলাম। আমি বললাম, এ. কে সেন বা অজিত সেন। তিনি মানে, তাঁর আচার-ব্যবহার, ক্লাসে বাংলা ভাষায় সহজ করে বিষয়ের ব্যাখ্যা দান এগুলো আমাদের খুব inspire করত।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এই অজিত সেনও তো তখনকার উপরের দিকের শিক্ষক নন। তিনিও ছিলেন নিচের দিকের লেকচারার ক্লাস-ওয়ান। আমি এ কথাই কইতে আছি : these are the people যাদের সঙ্গে contact of the students was more intimate এবং constant. বড় শিক্ষক যাঁরা ছিলেন তাঁদের তো অন্যান্য দায়িত্ব থাকত—তাঁরা ছাত্রদের জন্য সময় কমই ব্যয় করতে পারতেন : the time that they could give, except to exceptional students, এটা ছাত্ররা বেশি পাইত না। তাই নিচের দিকের শিক্ষক, তাঁদের জীবনযাত্রার ধারা this was very important in building up the atmoshere of some amount of resect for leaning লেখাপড়ার প্রতি একটা গুরুত্ব আরোপের মনোভাব সৃষ্টি করত। তাছাড়া চরিত্রের অন্যান্য দিকেও এর প্রভাব পড়ত। লেখাপড়া করে সেইকালেও হাজার টাকা মায়নার চাকরি পাওয়া যেত। এঁরা মাস্টারি না করে অন্য কোনো কাজে যে টাকা যোগাড় করতে পারতেন না এবং নিজেদের material prospects improve করতে পারতেন না, এমন তো বলা যায় না। সুতরাং এই যে ২০০ টাকায় সন্তুষ্ট রইলেন—এর তো একটা নিজস্ব বক্তব্য ছিল : এই ready acceptance of comparative penury, when it was not that necessary, এটার একটা impact তো cumulative আকারে ছিল। This is now difficult to say about presentday teachers.

এদিনকার সাক্ষাৎকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ও লেখক মুনতাসীর মামুনও আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাজ্জাককে একটি জবাব দিলেন : কিন্তু স্যার, এখন আমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার, আমাদের তো সত্যি অসুবিধা হয়।

অবশ্য অধ্যাপক রাজ্জাক স্বীকার করলেন, জীবনযাপনের অসুবিধা সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষকের জন্য সেদিনের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকাশমান মুসলিম

মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে একটা দিকের উল্লেখ করে বললেন : এখনতো আমাদের শিক্ষকরা অধিকাংশ মুসলমান। এরা সব নতুন মুসলমান middle class. একটি মুসলমান কৃষক পরিবারের একটি ছেলে শিক্ষিত হয়ে যখন মধ্যবিত্ত হল তখন সে যে তার গরিব আত্মীয়স্বজনথেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সেটা আজো হয়ত তত সত্য নয়। If one has left the class, there are others clamouring around : ভাইবোন, cousin who also want to join the queue এবং তাদের জন্য কিছু করা দরকার। এই দরকারটা সেদিনকার শিক্ষক, বিশেষ করে হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষকদের অধিকাংশের জন্য ছিল না। Those 200 rupees were exclusively almost for his much smaller family.

আমি বিষয়টি সম্পর্কে একটু পরিষ্কার হতে চাইলাম। আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে প্রশ্ন করলাম : কিন্তু স্যার, হিন্দু teachers দের উপর তাদের আত্মীয়স্বজনদের demand কি কম ছিল?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : Mostly they came form that kind of class for whom that kind pf assistace was not that much urgent. একেবারে যে ছিল না তা নয়। তাদের ওপর যে দাবি করত না তা নয়। কিন্তু ওরা ছিল established middle class : third, fourth generation. আর মুসলমানরা তখনো এবং এখনো নতুন middle class : এরা just middleclass হইতে আছে। একজন হয়ত university- তে আছে। আর একজন হয়ত still in the rural setting very much like his ancestors. This was not the problem with the established Hindu middle class যারা university-তে সেদিন ছিলেন, vast majority of the teachers. আরবি-ফার্সি বাদ দিয়ে মুসলমান teacher আর ক'জন ছিলেন : ৫-৬ জন maximum. এই পাঁচজনকে এখনো স্মরণ করা যায় : Shahidullah headig the list : ড. শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, এ.এফ. রহমান, আবুল হোসেন, (আবুল হোসেন, এফ. রহমান অবশ্য পরে চলে গেছেন) এরাই তো সেদিন ছিলেন যাঁরা বরাবরই শিক্ষক রইলেন। কই চিন্তা করেও আর তো দেখি না। অবশ্য আর একজন ছিলেন : মাহমুদ হাসান। আর নাম মনে আসে না। almost এই পনের বছরের মধ্যে, ১৯২১ থেকে ১৯৩৬, এর মধ্যে আমিই প্রথম মাস্টার হইয়া থাইকা গেছি। আর সব deputy magistrate হইয়া চইল্যা গেছে।

অধ্যাপক রাজ্জাকের আজীবন শিক্ষক থাকার কথাটা আর একদিনও উঠেছিলো। আজও আমি বললাম : স্যার আপনার ব্যাপরটা তো মিস্টেরিয়াস। সবাই বলে, উনি কেন মাস্টার হিসেবে পড়ে থাকলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিতে জবাব দিলেন : কপালের লিখন!

আমি আবার বললাম : আজকালকার যুগেও ইউনিভার্সিটিতে বেশিদিন কেউ থাকতে চায় না।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমারটা তো deliberate choice-এর ব্যাপার ছিল। আমার পরীক্ষাটা তো actually due ছিলে। ১৯৩৫-এ।

আমি বললাম : হ্যাঁ স্যার, সে কথা আপনি আমাদের একদিন বলেছেন। তবু আপনি তো বাইরে যেতে পারতেন।

অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর এই শিক্ষকতায় থাকার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে আজকেও বললেন : in a way it was possible perhaps, for, my family was more considerate than others: they agreed not to make any demand upon me. এইগুলি আগে তাগো কইয়া লইছিলাম। তা না হলে আমাকে যদি family বলতো, তাহলে I could have opted for some other job.

অধ্যাপক রাজ্জাকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এরূপ স্মৃতিচারণটিকে আমরা প্রায় শেষ করে আনছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকাকালীন নানা ব্যক্তি ও ঘটনা সম্পর্কে তাঁর যে স্মৃতি আজো উজ্জ্বল তারই কিছু স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনা। আরো দুজন ব্যক্তি এবং ঘটনার বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞেস করার ছিল। আজকে আমি আবার বললাম : স্যার, জাকির হোসেনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকারটির কথা আজ বলুন।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : সেটা আর একদিন বলবো। কিন্তু এই সময়ে ইব্রাহিম সাহেবের সঙ্গেও একটা আলাপ হয়েছিল।

ইব্রাহিম সাহেব, মানে বিচারপতি ইব্রাহিম যিনি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন এবং আয়ুইব খাঁ যাকে তাঁর সংবিধান সদস্য হিসেবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, তার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক রাজ্জাক এই আলাপটির কথা বললেন : ঐ সময়ে ইব্রাহিম সাহেবের সঙ্গেও একটা আলাপ হয়েছিল। ইব্রাহিম সাহেব তখন ভি.সি.। '৫৮ সালে মার্শাল ল' জারি হওয়ার কয়েকদিন পর। সেদিন আলাপ হচ্ছিল মার্শাল ল'র ফলাফল কি হবে তা, তা নিয়ে। আমি যখন বললাম, মার্শাল ল' অবস্থার কোনো উন্নতি করতে পারবে না,তখন দেখলাম, তিনি বেশ Surprised হলেন। তিনি বললেন, 'আমি তো মনে করি, এরা দেশের মঙ্গল করতে চায়। রাজনীতিকরা যে অবস্থায় দেশকে নিয়ে এসেছে তাতে এছাড়া কিছু উপায় ছিল না। এর কিছুদিন পরে তিনি আয়ুইব খাঁর মন্ত্রী হন। তখন আবার আমাকে ডাকলেন। ইব্রাহিম সাহেব বললেন : আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন। আমি বললাম : আমি কী সাহায্য করতে পারি? ইব্রাহিম সাহেব বললেন, 'আপনি তো Constitution-এর ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন নাড়াচাড়া করেছেন। সরকার বলেছে, তারা একটা নতুন Constitution করবে। আমাকে তার দায়িত্ব দিয়েছে। তারা বলেছে, আমি যা করব, তাই তারা গ্রহণ করবে।' আমি ইব্রাহিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনি তাই বিশ্বাস করেন? ইব্রাহিম সাহেব আমার প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন : কেন, কেন? আমি বললাম, আপনি সরল মানুষ, তাই বিশ্বাস করছেন। আসলে

Constitution যা করার, ওরাই করবে। ওরা কেবল আপনাকে সই করতে বলবে। ইব্রাহিম সাহেব তখন তো আমার একথা বিশ্বাস করলেন না। তারপরে আমার সঙ্গে আর দেখা হয় না। এর মধ্যে আমি আমেরিকায় হারভার্ডে চলে গেলাম।

অধ্যাপক রাজ্জাক কিছুদিনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কবে তা জানতাম না। তাই আমি প্রশ্ন করলাম : আপনি কবে ইউ.এস. এ.তে গিয়েছিলেন?

: ১৯৫০-এ। আমি যখনআমেরিকা থেকে ফিরে এসেছি তখন একদিন ঢাকায় ইব্রাহিম সাহেব আবার আমাকে ডাকলেন। ডাকিয়ে বললেন : রাজ্জাক সাহেব, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। ওরা কী একটা তৈরি করেছে। আমার সঙ্গে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ নাই। এখন বলছে, সই করো। আমি ওসব সটটই করবো না। আমি ঢাকা এসে বসে আছি। ...

অধ্যাপক রাজ্জাকের এমন কথায় আমরা একটু বিস্মিত হলাম। সে সময়ের কথা কিছু মনে পড়ে। ইব্রাহিম সাহেব আইয়ুব খানের সংবিধান জারির সময়ে ঢাকা চলে এসেছিলেন। তারপর বোধহয় অসুস্থতার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আইয়ুব খানের সংবিধানের ব্যাপারে তাঁর যে এরূপ ক্ষুব্ধ মনোভাব ছিল তা আমাদের জানা ছিল না। ইব্রাহিম সাহেব মারা গেছেন। অধ্যাপক রাজ্জাক এই প্রসঙ্গে তাঁকে স্মরণ করে বললেন : ইব্রাহিম সাহেবের মনটা ভালো ছিল। বহুদিন যাবৎ ঢাকা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। লোক চিনতেন। কে কোন গুণের, তা তিনি জানতেন। তবে ইউনিভার্সিটির Geaneral principles-এর ব্যাপারে খুব মাথা ঘামাতেন না। এসব ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়, বলা চলে বেশ আলসেই ছিলেন।

আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে বললাম : স্যার, আপনার সঙ্গে মোনেম খানের encounter সম্পর্কে কিছু বলুন।

অধ্যাপক রাজ্জাক সাহাস্যে বললেন : সে এক মজার ব্যাপার। এটা আবুল হাশিম সাহেবের কাণ্ড। তিনি ইসলামিক একাডেমিতে 'Why I Wanted Pakistan' বলে বক্তৃতার একটা সিরিজ করেছিলেন। আমিই প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এটা করুন। হাশিম সাহেব আমাকে বক্তৃতা দেবার দাবি করতে আমি বললাম, মোনেম খান একদিনের বক্তা হলে আমি আর একদিনের বক্তা হতে রাজি আছি। হামিশ সাহেব বললেন : আমি Arrange করব। কয়েকদিন পরে হাশিম সাহেব টেলিফোনে করে বললেন, মোনেম খান রাজি হয়েছে। তারিখ দিয়ে বললেন : অমুক তারিখ ৫ টার সময়ে ইসলামিক একাডেমির হলে বক্তৃতা হবে।

আমরা বললাম, অধ্যাপক রাজ্জাককে, হ্যাঁ, আমরা কাগজে এর ঘোষণা দেখেছিলাম এবং ব্যাপারটাতে বেশ কৌতুক বোধ করেছিলাম।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হ্যাঁ, কিন্তু তারিখের দিন দুটার দিকে হাশিম সাহেব বললেন : ভাই, এ তো এক বিপদে পড়লাম। আমি আপনার বক্তৃতা ঘোষণা করেছি, এদিকে মোনেম খান বলেছেন, তাঁর অসুখ হয়েছে, তিনি মিটিং-এ আসবেন না। ...

আমরা অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলাম : তবু কি আপনি সেদিন বক্তৃতা করেছিলেন?

: হ্যাঁ, আবুল হাশিমকে বিপ থেকে উদ্ধার করার জন্য আমার বক্তৃতা করতে হয়েছিল। সে বক্তৃতার বোধহয় টেপ করা রেকর্ড আছে ইসলামিক একাডেমিতে।

অধ্যাপক রাজ্জাক এ ব্যাপারে বললেন : কিন্তু মজার ব্যাপার সেদিন রাতেই আমি রাজশাহী যাবার জন্য রাত এগারটায় ট্রেনে উঠেছি। কিন্তু কী ব্যাপার? গাড়ি আর ছাড়ে না। কেন গাড়ি ছাড়ে না? কারণ, গভর্নর মোনেম খান যাবেন ময়মনসিংহ। তিনি আসবেন, তবে গাড়ি ছাড়বে। আমি মনে মনে বললাম : মজার ব্যাপার তো! এই না দুপুরে মোনেম খান খবর পাঠিয়েছে যে তার অসুখ। মিটিং-এ বক্তৃতা দিতে পারবে না। কিন্তু এখন তো বেশ সুস্থতার আলামত দেখা যাচ্ছে।

ঘটনার ঘটনা টেনে আনে। অধ্যাপক রাজ্জাকের আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। কৌতুকের সুরে আমাদের বললেন : মোনেম খাঁর আর একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিলো আমাকে নিয়ে।

আমরা সাগ্রহে বললাম : কী ব্যাপার?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এটা বলেছিলেন আখতার হামিদ খাঁ। কুমিল্লা একাডেমির (কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি) তিনি পরিচালক। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। একবার তিনি আমাকে ফোন করে বললেন যে আমাকে তার একাডেমিতে যেয়ে কাজ করতে হবে। তাঁর ভাষায় : 'আমি তো আপনাকে কতোবার বলেছি, আমার কাছে এসে থাকুন। তাতো আপনি রাজি হচ্ছেন না। এবার আপনাকে আসতেই হবে।' আমি বললাম : আপনার কাছে আসার প্রস্তাব খুব উত্তম নয়। কারণ আমরা দুই বৃদ্ধ এই বৃদ্ধ বয়সে কেউ কারুর ভাবনাচিন্তা ছাড়তে পারব না। না আপনি, না আমি। নতুন কিছু শিক্ষা করাও আমার পক্ষে কষ্টকর। আর তাই আপনার কাছে এলেও ছ'মাসের মধ্যে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটতে বাধ্য।

: না, এবার আর কোনো কথা নয়। আপনাকে আসতেই হবে। এবার আর আমার কথা নয়। খোদ লাট সাহেবের কথা।

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম : কেন, তার আবার কথা কি?

: সে আর বলবেন না। হঠাৎ সেদিন গভর্নর মোনেম নিজে আমাকে ফোন করেছেন। আমি তো ফোন পেয়েই আশ্চর্য। ভাবলাম, আমি আবার কী অপরাধ করলাম। কিন্তু তিনি ফোন ধরেই জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, 'আপনি ঢাকা

ইউনিভার্সিটির আবদুর রাজ্জাককে চিনেন? 'আমি বললাম হ্যাঁ চিনি। গভর্নর বললেন,আপনি তাকে আপনার একাডেমিতে নিয়ে নেন। আমি চাই না সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে থাকে ...

এই কাহিনী স্মরণ করে অধ্যাপক রাজ্জাক হাসতে হাসতে বললেন : এমনি মজার লোক ছিলেন মোনেম খান।

গভর্নর জাকির হোসেনের সঙ্গে সংলাপ ০১.১০.৭৬

গভর্নর জাকির হোসেনের সঙ্গে অধ্যাপক রাজ্জাকের সাক্ষাৎ ঘটেছিল মোনেম খান গভর্নর হওয়ার আগে। জাকির হোসেনের সঙ্গে অধ্যাপক রাজ্জাকের আলাপটির বেশ কৌতুকজনক ছিল। এর আগেও কয়েকদিন অধ্যাপক রাজ্জাকের কাছে কাহিনীটি শুনতে চেয়েছি। আজকে আবার শুনতে চাইলে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : জাকির হোসেন বোধহয় গভর্নর হন '৫৯-'৬০-এ। গভর্নর হওয়ার আগেও, তাঁকে একটু চিনতাম। যাইহোক গভর্নর হয়ে এলেন। আমি পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্টের Planning Board-এ তখন আছি। একদিন হঠাৎ চিঠি পাইলাম, তিনজন Planning Borad-এর মেম্বার : আতাউর হোসেন, নূরুল হুদা আর আমি—এদের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। He asked us to see see him. কিন্তু সেই সময়ে আবার এমন হল যে আতাউর আর নূরুল হুদা—এরা দুজনেই ঢাকার বাইরে। আমি একা। সুতরাং আমি একাই গেলাম। গভর্নমেন্ট হাউজে। দেখলাম, জাকির হোসেন খুব Formal. ইংরেজিতে আমার সঙ্গে কথা শুরু করলেন : You are Mr. Abdur Razzaq?

আমি বাংলাতেই বললাম : জি, আমার নাম আবদুর রাজ্জাক।

আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলাম : এমনিভাবে আরম্ভ হল? একেবারে formal?

: হ্যাঁ, খুব formal. দুএক কথার পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি Planning Board-এর মেম্বার হওয়ার আগে কী ছিলাম। আমি বললাম : ইউনিভার্সিটির লেকচারার ছিলাম। আমার জবাব শুনে জাকির হোসেন তাঁর গলার স্বর একটু তীক্ষ্ণ করে বললেন : Lecturer!

আমি বললাম : জি লেকচারার। এবং it is absolutely a fact যে Planning Board-এর মেম্বার হওয়ার কোনো যোগ্যতাই আমার নাই। তবে আমি আতাউর রহমান সাহেবকে আগে থেকেই চিনতাম। So it was an act of patronization on his part as Chief Minister! আমার এ জবাব শুনে জাকির হোসেন তাড়াতাড়ি বললেন : না, আমি সে কথা বলি নাই।

আমি বললাম : না, আপনি বলেন নাই। তবে what you implied, I wanted to make it clear.

এ পর্যন্ত উনি ইংরেজিতে প্রশ্ন করতেছেন আর আমি বাংলায় জবাব দিতেছি। এরপরে তিনিও বাংলায় নামলেন। Hundreds of প্রশ্ন করলেন। এটা-ওটা খুব সম্ভব he expected that the interview would be over in five to ten minutes. Gradually it went to nearly two hours by which time his lunch hour had come. তার মিলিটারি সেক্রেটারি ইত্যাদিরা তো এর মধ্যে দুই-তিনবার উঁকি দিয়ে গেছে। তারা অবাক, এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী হইতেছে। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পরে, উনি বললেন : আমার একটা engagement আছে সুতরাং ...

আমি বললাম : দেখুন ঘণ্টা দুই যাবৎ you have asked me hundreds of questions. সবগুলোই আমি জবাব দিছি। I geve answers to the questions. মাস্টারি করি। Profesional একটা pride আছে। প্রশ্ন করলে জবাব দেব না, এমন একটা কথা তো ঠিক না। সুতরাং যা মনে আইছে বলবার চেষ্টা করেছি। তবে একটা কথা আপনি জিজ্ঞেস করেন নাই। সেটা আমি অযাচিতভাবে বলতে চাই। I want to tell you.

জাকির হোসেন একটু আশ্চর্য হলেন। বললেন : আচ্ছা! কী কথা?

আমি বললাম : দেখুন, আমি ১৯৩৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করি। যে সময়ে আমি শিক্ষক হয়েছি ২০০-২৫০ শিক্ষকের মধ্যে আরবি-পার্সি ছাড়া ৩-৪ জন মুসলমান শিক্ষক। এবং এমন কোনো শিক্ষক ছিলেননা ইউনিভার্সিটিতে who was less qualified than, I. I had still to learn lots of things form each one of them. I acknowledge it clearly. একটা ব্যাপারে সম্বন্ধে I differed with them and I think I was right.

জাহির হোসেন বললেন : কী?

আমি বললাম : তখন তাঁদের একটা জিনিস প্রাণপণে বুঝাবার চেষ্টা করতাম যে দেশের মধ্যে Hindu-Mussalman হিসেবে একটা problem আছে। and that problem has not been faced and solved. আমার colleague-দের সবাই একই কথা বলতেন : আসলে প্রব্লেমটা নাই : this is illusion resulting form a third party machination. আমি মনে করি it was because of this refusal to face the problem that we arrived at `47. Partition was not inevitable except for the refusal to admit the problem by the Congress or the majority of the Hindus to face facts. 1947-এর পরে আমরা কিছু মানুষ বুঝাবার চেষ্টা করছি যে there is a problem in the country confronting East Pakistan and West Pakistan. কথাটা উল্লেখ করলেই We are told we are the tools of India or some such third party—almost the exact prototype of the argument we used to

hear in the older days before '47. And because of this attitude, most probably in the near future we shall again he counfronted whit the some situation with which we were confronted in 1947.

জাকির হোসেন খুব গম্ভীরভাবে বললেন :আপনি তাই মনে করেন নাকি?

আমি বললাম : দেখুন আপনি মার্শাল'ল'র গভর্নর ।এবং আপনার Official residence-এ বসে কথাটা বলছি ald unless I was enirely convinced I would not have ventured it. আমি শিক্ষাকতা করি । আমি মনে করি না, it is my duty to cry form the housetop, what I think, to be the situation. কিন্তু it is absolutely my conviction এবং যদি আপনারা কোনো সময়ে আবার জিজ্ঞেস করেন it is excactly this that I would say. It is none of my business to volunteer this infomation on public plat form.

আমার কথা শুনে জাকির হোসেন একটু থেমে বললেন : 'আচ্ছা, আর একদিন কথাবার্তা হবে ।' সেই একদিন আর অবশ্য আসে নাই ।

অধ্যাপক রাজ্জাককে আমি জিজ্ঞেস করলাম : ঐ সাক্ষাৎকার ওভাবেই সেদিন শেষ হল?

: হ্যাঁ, সেদিন ওখানেই শেষ হল।

: এর কোনো reaction কোনো ঘটনাতে কি পাওয়া গেছে? আপনার কথায় সে mind করেছে, এমন কি বোঝা গেছে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : একেবারেই না। তারপরে একদিন শুধু আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলেন ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের সঙ্গে মিট করতে। আমরা receive করার জন্য গেটে দাঁড়িয়ে আছি। আমি লাইনের মধ্যেই ছিলাম। এমন সময়ে জাকির হোসেন নামলেন গাড়ি থেকে। জাকির হোসেন গাড়ি থেকে নেমেই আমাকে দেখে দূর থেকেই তার peculiar voice-এ জোরেই বলে উঠলেন : আপনি এখনো এখানে কি করতে আছেন? আপনি হারভার্ড যাইবেন, Permission চাইছেন—আমি তো Permission grant করেছি। ... এই দুই এক সেকেন্ডের আলাপ। আমি একটু non-plussed হয়ে গেলাম। কাজেই ঐ সাক্ষাতের কথায় তিনি কিছু মনে করেছেন, এমন আমি মনে করি না। This was before March '59 when I left for Harvard.

অধ্যাপক রাজ্জাক আজ কথা বলার বেশ মেজাজে ছিলেন। এরকম intellectual confrontation বা বুদ্ধির দ্বন্দ্বে তিনি বেশ মজা পান। এমনি করে একটি সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে বললেন : আর একটা interview-ও খুব মজার হয়েছিল। This was some where in '61-'62.

আমরা ঔৎসুক্যে একাগ্র হলাম। বললাম : বলুন স্যার, কার সঙ্গে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমি একদিন বাসায় বসে আছি—এই পাড়াতেই, ১৬ নং ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারে। এই সময়ে Pakistan Intelligence বা গুপ্ত পুলিশের আবদুল খালেক এসে আমার সঙ্গে দেখা করল।

আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলাম আবদুল খালেক? যিনি শেখ সাহেবের আমলে সাহায্য ও পুনর্বাসনের সেক্রেটারি ছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : হ্যাঁ খালেক আমাদের ছাত্র। সে তখন ঐ Intelligence-এর Deputy Director খালেক বাসায় এসে বলল : স্যার, আওয়ান আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

অধ্যাপক রাজ্জাককে আমি জিজ্ঞেস করলাম : কী নাম বললেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আওয়ান। আমিও কোনোদিন আওয়ানের নাম শুনি নাই, I never heard of Awan, আমি খালেককে বললাম : সে কে? খালেক বলল, স্যার, আওয়ান Central Inelligence-এর Director. আমি বললাম : then he must be someone very big ... তুমি নিজে একটা Deputy Director. তুমি নিজে যখন তার Messenger হিসেবে এসেছ, তখন সে নিশ্চয়ই আরো বড়। Someone very particular. আমি খালেককে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি মনে কর it will do you some good if I go and meet him তাতে খালেক বলল : স্যার, he wants to see you here at your house. আমি বললাম : আমার এই বাসায় আইসা যদি তার বসার কোনো অসুবিধা না হয়, তাহলে he is welcome.

: হ্যাঁ, স্যার, কাল আসবে, সাড়ে চারটা পাঁচটার সময়ে।

যাই হোক আমি বিকেলে মাহমুদ হোসেনের কাছে গেছি। মাহমুদ হোসেন তখন ভাইস চ্যান্সেলর। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : আওয়ান কে? আমার প্রশ্ন শুনে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : আওয়ানকে তুমি চেন কেমন করে? আমি বললাম খবর পাঠাইছে, he wants to see me. একটু চুপ করে থেকে মাহমুদ হোসেন আবার বললেন, আওয়ান তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?

আমি বললাম : হ্যাঁ। তারপর আবার তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম :

আওয়ান কে?

মাহমুদ হোসেন বললেন : আওয়ান হচ্ছে Director General of Intelligence. তার particular responsibility হল to look after the safety of the president. He comes and goes a little ahead of the President ... তোমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চায়?

আমি বললাম : তা তো কিছু বলে নাই। আমি মাহমুদ হোসেনকে আর কিছু বললাম না। কারণ তিনি হয়ত আমাকে সাবধান-টাবধান করে দেবেন। আমার ইচ্ছে যে যদি আসে তাহলেI shall have also a rare opportunity of meeting such a big person.

অধ্যাপক রাজ্জাক পাকিস্তান গুপ্ত পুলিশের এই প্রধানের সঙ্গে তার সাক্ষাতের ঘটনাটি বেশ জমিয়ে বলতে লাগলেন : যাক, পরের দিন তো তিনি আসলেন। কাপড়ে-চোপড়ে খুব ধোপদুরস্ত। আমার বাসায় বসার জায়গা-টায়গাও তেমন সুবিধার নয়। আমার একটি ছোট ভাইয়ের মেয়ে তখন বারান্দায়। খুব ছোট মেয়ে। ঘরে ঘুরঘুর করে হাঁটে। সে আমার এখানে কখনো এত ভালো কাপড়-চোপড় পরা মানুষ দেখে নাই। she was therefore exceedingly curious. একবার সে আমার কোলে এসে বসে। আবার নেমে যেয়ে আমার সেই বিরাট মোহনকে ঘুরে ঘুরে দেখে। কিছুক্ষণ পরে যেয়ে আঙুল দিয়ে তাঁর শরীর ধরে, জুতার দিকে চেয়ে থাকে। চকচক করছে জুতা। আঙুল দিয়ে সে জুতা ধরতে যায়—আমি তাড়াতাড়ি ওকে তুলে নিয়ে আসি। আবার সে নেমে যায়। এই দেখে কিছুক্ষণ পরে সেই আওয়ান বলল : you seen to be very fond of your niece.

এর মধ্যেই কথাবার্তা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর আমাকে সে বললো : তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে Pro-communist element এত বেশি কেন?

আমি বললাম : দেখ এই প্রশ্নের যদি ভালো জবাব দিতে হয় তাহলে : I shall have to ask you a few questions. Do you mind answering them.

: কি প্রশ্ন?

আমি বললাম : আমি জিজ্ঞেস করি, তুমি প্রথমে শুন।

: জিজ্ঞেস কর।

: তুমি পুলিশ সাহেব হইলা কবে?

আমার প্রশ্ন শুনে আওয়ান বলল : ক্যান্?

আমি বললাম : বল না?

: ১৯৩৪-এ।

আমি বললাম : খুব ভালো কথা। This was exacly the year when I also graduated. তুমি তো B.A পাস কইরা I.P.S. পরীক্ষা দিয়ে পুলিশ অফিসার হইলা। আমার মনে হচ্ছিল তুমি আমি এক বয়সেরই হব। হয়ত একটু উনিশ-বিশ :

: তাইতো মনে হয়।

আমি তখন বললাম : আচ্ছা তোমার মনে আছে ১৯৩৪-এ Why did you choose to be a policeman rather than something clae?

আমার প্রশ্ন শুনে আবার জিজ্ঞেস করল : ক্যান?

আমি বললাম : বল না, তোমার যদি মনে থেকে থাকে।

তখন সে আমতা আমতা করতে লাগল। আমি বললাম : Let me reconstruct আমি মনে করিয়ে দিই?

: কর।

: তখন এইটা নিশ্চয়ই তুমি মনে কর নাই যে, দেশে law and order situation এত critical যে it demands your life work to become a policeman to set things in order What actually happened is that, তুমি তোমার degree পাইলা। ডিগ্রিটা হাতে নিয়া you took counsels with yourself তুমি ভাবলা এই ডিগ্রিটা তোমাকে best return কী দিতে পারে। তোমার conclusion হলো যে policeman হলে you would get the best; you can be eaming more than in any other capacity. এই জন্য তুমি policeman হয়েছ।

আওয়ান সায় দিল : ধর এই রকমই।

আমি বললাম : ধরার কথা নয়। ব্যাপারটা ওই রকমই হয়েছিল। This is precisely what happened.

আওয়ান আগ্রহ দেখিয়ে বলল : আচ্ছা, তারপরে?

আমি বললাম : দেখো ১৯৩৪-এ আমিও বি.এ. পাস করলাম।

১৯৩৬-এ আমি এম.এ. পাস করলাম। এম.এ পাস করার পরে I also talked to myself similarly যে, আমার ডিগ্রি দ্বারা আমি কী পেতে পারি। Rightly or wrongly I concluded : ইউনিভার্সিটি শিক্ষক হলে most probablymy return would be maximum, And so I chose to become a teacher. তোমার back gorund এবং আমার background-এর খুব বেশ কম নাই। তুমি যে রকম ছাত্র ছিলে তার চেয়ে আমি খুব খারাপ ছিলাম, এমন মনে করার কারণ নাই। উনিশ বিশের তফাৎ হতে পারে। তুমি ১৯৩৪-এ পুলিশ অফিসার হওয়ার পরে, you did not prove an unsuccessful police officer and these were the heydays of British Imperialism in India. In 1947 redical change took place. Mr. Jinnah came to power. মিস্টার জিন্নাহ পাওয়ারে আসার পরও you did not find any difficulty. মিস্টার জিন্নার পরে নাজিমুদ্দিন আসলো। গোলাম মোহাম্মদের পর এখন ইস্কান্দার মির্জা আছে। Each very different from his predecessor. But you have found no difficulty in keeping in the good book of each of these people. আমার কেসও তোমার কেসেরই ভিন্নতর ভাষ্য। আর কিছু না। তোমার চেয়ে আমার Position অবশ্য much less critical to keep myself in goodbook of those who matter in the university; it is one hundredth of your difficulty. But you have succeeded in this. Why do you think that I am likely to fail and why do you think that with all our similarity in background and other things

that I am or my collegues in the univesrsity are the king of people যারা আহার নিদ্রা সব ছাইড়া খালি এখন যারা power-এ আছে তাদের উৎখাত করার জন্য জান দিয়া ফেলবে? আমি তো মনে করি যে The kind of motivation that is working in you, the same king of motivation is working with us. The vast majority of us in the univerist—তাদের সবার উদ্দেশ্যে তোমার যা উদ্দেশ্যে তাই। তোমার উদ্দেশ্যে হচ্ছে : to live for your children একটা গাড়ি, একটা বাড়ি, একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা : this also exactly is the ambition of the like of in the university.We constitute as much a threat to the system obtaining in the country as yourself constitute.

অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে পাকিস্তানের গুপ্ত পুলিশ-প্রধান আওয়ানের সঙ্গে তার আলাপটির বর্ণনা দিচ্ছিলেন। আওয়ানের সঙ্গে অবশ্যই তিনি ইংরেজিতে আলাপ করেছিলেন। কিন্তু তার সুরটি তাঁর এখনকার ইংরেজি-বাংলা মেশানো বর্ণনাতে যত তাৎপর্যময় হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল, কেবল বাংলা বা ইংরেজিতে বললে তা সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি প্রকাশ পেত না। আমি আলাপটি পুনর্লেখনেও তাই অধ্যাপক রাজ্জাকের বাংলা-ইংরেজি মেশানো বর্ণনাটি রাখার চেষ্টা করেছি।

অধ্যাপক রাজ্জাক সেই আলাপটির বর্ণনাতে বলতে লাগলেন :

: কাজেই তোমাদের এই ধরনের কারণ খোঁজ করার কোনো প্রয়োজন দেখি না except if you think যে তুমি Intelligence-এ আছ, তোমার কিছু কাজ দেখানো দরকার। সেই কাজ দেখানোর মাধ্যমে আমাদের ক্রশ বিদ্ধ করা তোমার আবশ্যক। এমন হলে ভিন্ন কথা। This is in the interest of your life. I can understand it and have sympathy for it. Afterall I am the victim. কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, এই কথা আমারে তুমি বইলো না, যে, we constitute such a class of people from whom this social system or any such system stands in danger.

অধ্যাপক রাজ্জাক একটু হাসলেন। তারপরে বললেন : আমি তারপরে তাকে বললাম : তুমি এই যে আমারে এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করছ, তোমার office-এর একটি অফিসার আরো ৪-৫ বছর পূর্বে আমাকে এই প্রশ্নটই জিজ্ঞেস করেছিল। তাকেও আমি বলেছিলাম যে, যাদের সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হয় যে তারা কমিউনিস্ট বা বিপ্লবী, তোমার সরকারের বিরোধী, তাদের সম্পর্কে কোনো Seriouse action নেওয়ার আগে এই দুএকটা relevant খবর নিও যে, তারা কত টাকা মাইনে পায়, মায়না পাইলে সেই টাকটা দিয়া তারা করে কী? যদি দ্যাখো যে ৫০০ বা ১০০০ টাকা তারা পায় তার সবটাই তাদের ব্যয় হইয়া যায়,

There is no savings. then retain your interest in him, further inquiry কর। আর যদি দাখো, হাজার টাকা ইনকাম, ৫০০ টাকা সে save করে and he spends these 500/- rupees saved, in the procurement of all the good things of life and also wants একটা বাড়ি একটা গাড়ি, একটা জায়গা then lose all interest in him, এদের নিয়া মাথা ঘামাইও না। এই দুইটা জিনিস এক সাথে যায় না। আরাম আয়েশের বাঞ্ছা আর বিদ্রোহের কর্মকাণ্ড। তুমি একটু কষ্ট কইরা খোঁজ নেও ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টির দ্বারা মেম্বার তাদের বাজেটটা কি? And you will see the entire labour that you devote is wasted; thay are your first cousins, your brothers and they exactly do the things that you also are doing. এদের কাছ থেকে তোমার আশঙ্কার কারণ কি থাকতে পারে? ...

অধ্যাপক রাজ্জাকের বর্ণনাটি আরো এগুলো।

: এইসব কওয়ার পরে আমার মেহমান খালি কইলো ... আচ্ছা তুমি যা আমারে কইলা, আমি মনে রাখার চেষ্টা করবো। তবে তুমি আমাকে অন্য একটা প্রশ্নের জবাব দাও। একটা কথা বল ...

অধ্যাপক রাজ্জাক গুপ্ত পুলিশ প্রধানের প্রশ্নটা বলার আগে একটু ব্যাখ্যা করে আমাদের বললেন : Just then Ayub Government-এর against-এ গোলমালটা শুরু হইতেছে। আওয়ান বলল : এই যে এখন একটা outburst এইটার কি কারণ? তুমি বল? তুমি তো বললে যে তোমরা শিক্ষকরা সব শান্তি ও সুবিধাকামী। তাহলে তোমাদের কাছে যারা পড়ে তারা কেন এই রকম হয়?

অমি বললাম : দেখ one can go into the matter. তার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে দুই-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। তুমি কইতে পার, এই গোলমালটা কবে থেকে শুরু হইল? তুমি যদি তারিখ দিতে না পার তাহলে I can give you the exact date.

আওয়ান বলল : কবে?

আমি বললাম : শহীদ সোহরাওয়ার্দী arrested হওয়ার পরে। আচ্ছা, did you have any suspicion যে শহীদ সোহরাওয়ার্দী arrested হলে এই রকম একটা গোলযোগ হতে পারে?

আওয়ান আমাকে জবাব দিল : oh, of course we knew, we were absolutely certain.

তার জবাব শুনে আমি হেসে ফেললাম : দেখ, তোমরা একটা কাজ করেছ। এটার consequence কি হবে তাও তোমরা জানতা। At the time you tok thees steps, you did not consult me, Now when your expectations have been fulfilled, why do you come to me?

Where do I come in it? যদি এইটা হইতো যে, you have been taken by surprise, তোমরা এমন ভাব নাই, আশঙ্কা কর নাই, তাহলে তোমার প্রশ্নের একট অর্থ থাকতো But it seems you knew all about it, you were exactly expecting these. এখন আমি কি করতে পারি। ...

অধ্যাপক রাজ্জাক বর্ণনাটি শেষ করতে যেয়ে বললেন : ঘণ্টা দুই এই ধরনের আলাপ-সালাপ চললো। শেষে যাওয়ার সময়ে বললো : দেখ আমি ননান জনের কাছে তোমার সম্পর্কে নানান কথা শুনেছিলাম। তবে I am rather glad that I came to see you. আমার ধারণা যে যাই হউক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পোষণ করতাম সেটা অনেকখানি বদলাবার চেষ্টা করব। তারপরে বলল : যদি কোনোদিন আমাদের ওদিকে যাও, তাহলে তুমি কিন্তু আর কোথাও থাকতে পারবা না। আমার কাছে তোমাকে উঠতে হবে।

আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে লক্ষ্য করে বলে উঠলাম : এতো এক সাজ্ঘাতিক দাওয়াত। পাকিস্তানের গুপ্ত পুলিশ প্রধানের বাড়িতে মেহমান হওয়ার দাওয়াত।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : আমি তাকে হেসে বললাম, দেখ আমি মাস্টারি কইরা যে মাইনা পাই তাতে লাহোর-করাচি নিজের পয়সায় যাওয়ার কথা উঠে না। যদি তুমি কোনো সময়ে arrange কর আমার যাওয়া তাহলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে আমার respects জানাইয়া আসুম। তবে তোমার কাছে থাকবার সাহস হইবে কি না, সেটা স্বতন্ত্র কথা।

: না,না, তুমি আর কারুর কাছে থাকবা না। I would like to talk with you again.

এইখানে অধ্যাপক রাজ্জাক আওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের গল্প শেষ করলেন।

আমি আবার বললাম : ভারি মজার ব্যাপার।

ড. মাহমুদ হোসেন স্মরণে

০২.১০.১৯৭৬

ড. মাহমুদ হোসেনের সঙ্গে অধ্যাপক রাজ্জাকের বেশ সখ্য ছিল। ড. মাহমুদ হোসেন ছিলেন পরবর্তীকালে ভারতের যিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ড. জাকির হোসেন, তার ছোট ভাই। ড. মাহমুদ হোসেন চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পরে বোধহয় তিনি করাচি ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। ষাটের দশকের দিকে তিনি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে। মোনেম খাঁ গভর্নর থাকাকালে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে ড. ওসমান গনিকে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করেছিলেন। ড. মাহমুদ হোসেনের ভাইস চ্যান্সেলরকালের এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে,

তিনি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক-কর্মচারীদের সাধারণ দলাদলির উর্ধ্বে ছিলেন এবং তাঁর একটি জ্ঞানীসুলভ উদার ও যুক্তিনির্ভর মন ও মেজাজ ছিল। শিক্ষক ছাত্র-কর্মচারীদের সকলের সঙ্গে ব্যবহারে ছিলেন স্মিতমুখ ও সুজন। আজকের আলোচনায় আমরা তাই ড. মাহমুদ হোসেনের কথা তুললাম। আমি বললাম : স্যার, ড. মাহমুদ হোসেনকে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে কে নিযুক্ত করেছিলেন? সে কি গভর্নর জাকির হোসেন? তার মতো লোককে মার্শাল ল'র এরা পছন্দ করেছিল কী কারণে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : মাহমুদ হোসেনের একটা প্রেস্টিজ ছিল। গোলাম মোহাম্মদ ছিল মাহমুদ হোসেনের বড় ভাই, ড. জাকির হোসেনের ছাত্র। প্রথম যখন গোলাম মোহাম্মদ মন্ত্রিসভা বাতিল করে, তখন মাহমুদ হোসেনকে ডেকে আলাদা করে বলেছিলো : তুমি কেন ওদের সঙ্গে থাকো। তখন থেকেই গোলাম মোহাম্মদের যারা সাগরেদ ছিল—আইউব, ইত্যাদি এরাও একই দলের—They tried to draw Mahmood Hussain. বহুদিন নানা ধরনের জিনিস তাকে offer করেছিল। শেষে '62 এ he was offered V.C.-ship of Dacca Univerisity and he accepted. it.

আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে বললাম : ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে তার মেয়াদটা আমাদের আর পাঁচজন ভি.সি. থেকে ভিন্ন ছিল। নয় কী? আপনার কি ধারণা?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : ভাইস চ্যান্সেলরদের মধ্যে হারটগকে আমি দেখি নাই। ল্যাংগীর সময়ে প্রথম ছাত্র হিসেবে আমরা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলাম। পরের সব ভাইস চ্যান্সেলরের সময়ে আমি teacher. স্যার এ. এফ রহমানকেও দেখেছি। Perhaps his last action was appointing me a teacher. ইউনিভার্সিটির নথিপত্র ইত্যাদিতে যা দেখেছি তাতে দেখা যায় Philip Hartog had definite ideas of what the University sould develop into : good. bad or indifferent—তার একটা ধারণা ছিল। Hartogh knew precisely what the University should be এবং আমার ধারণা, if it was not as wide as that, Mahmood Hussain also had a definite notion of what it ought to be, ১৯৬১ বা '৬০-এর শেষে যখন উনি প্রথম আসেন তখন most of us knew him fairly well.

আমি বললাম : তাতো বটেই। তিনি এখানে আগে শিক্ষক ছিলেন—আপনাদের সহকর্মী।

অধ্যাপক রাজ্জাক ড. হোসেনের সেই আগেকার কথা উল্লেখ করে বললেন : Reader হিসেবে তিনি History-তে join করেছিলেন। পরে partition-এর একটু আগে Professor of International Relations হন ড. মাহমুদ হোসেন অবশ্যই জ্ঞানী লোক ছিলেন। কিন্তু তার নিজের স্কলারশিপ সম্পর্কে he was very modest, I think he had a natural flair for administration এবং

আরম্ভেই he made up his mind, that what he could do most efficiently was to contributs to the infrastructure of the university. বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পড়ালেখা হবে, এটার কী পরিবর্তন প্রয়োজন—এগুলো, he felt would be better attended to by the general body of teachers. উনি প্রথমেই ঠিক করলেন ১৯২১-২২ থেকে শুরু করে '৬১ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটির দালানকোঠা—either for students or teachers or for academic purposes কি হয়েছে, তার একটা হিসাব নিতে হবে। সে হিসাবে তিনি দেখলেন, অবস্থা একেবারে stationary হয়ে আছে—সেই ২১-২২ এরই পর্যায়ে রয়ে গেছে। In fact '47-এ প্রথম যখন দেশভাগ হল তখন quite a few of the university buildings গভর্নমেন্ট নিয়ে নিল। গভর্নমেন্টের তখন তা প্রয়োজন ছিল। একটা city, Dacca, had all on a sudden been transformed into a capital, capital of half of Pakistan,in fact the more populous half. And Govenment required all sorts of accommodations. এই জন্য University suffered a great deal. ড. মাহমুদ হোসেন ইউনিভার্সিটির বাড়িঘর, দালানকোঠা—তার এই অভাবের দিকটাতেই নজর দিলেন। তিনি মনে করলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তাতে এই ক্ষেত্রে তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে কিছু সাহায্য করতে পারেন—he could be most useful here. সুতরাং ডাইনে বায়ে না চেয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণের কাজ করে গেছেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, শিক্ষকদের বাসস্থান যা দেখছেন নির্মাণ বা নির্মাণের সূচনা তাঁর সময়ের—this is what he gave.

ড. মাহমুদ হোসেন সম্পর্কে অবশ্যই অধ্যাপক রাজ্জাকের স্মৃতি এর চেয়েও বিভিন্ন ঘটনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু অধ্যাপক রাজ্জাকের সঙ্গে সাক্ষাতের এই পর্যায়টি আমাদের আজকের এই আলোচনাই সঙ্গেই শেষ হয়েছিল।

পরিশিষ্ট ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববাংলা, তথা বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯২১ সালের প্রতিষ্ঠাকালে থেকে ১৯৭১ সালেই এর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। ১৯৭২ সালে এর একটি স্বর্ণজুবিলি বা স্মারক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। এর প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু সেরূপ কোনো অনুষ্ঠান যে হয় নি এবং এখনো যে হচ্ছে না তার দুটি কারণ হতে পারে : এক. আমরা এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন নই। দুই. এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের মধ্যে এমন কিছু আছে যার স্বীকারে বর্তমানে আমরা খুব নিরাপদ, নিশ্চিন্ত এবং সুখী বোধ করিনে।

আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর পূর্বে স্থাপিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করার অর্থ এই ভারত উপমহাদেশের অর্ধশতাব্দীর অধিককালের ইতিহাস পাঠ করা। ইতিহাসকারদের নিকট থেকে আমরা ইতিহাসের পাঠ পাই। প্রত্যেক ইতিহাসকারই ইতিহাসের পাঠক। সে হিসেবে ইতিহাসকার একজন ব্যক্তি। ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন এবং দৃষ্টিভঙ্গি সেই পাঠের নিয়ন্ত্রক। অতীতের ঘটনাপঞ্জির নির্বাচন, তার ঝাড়াই-বাছাই এবং ব্যাখ্যাদানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। এ কারণেই একই ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাসকার থেকে ইতিহাসকারের ব্যাখ্যার ভিন্নতা। তাৎপর্য বিশ্লেষণে ভিন্নতা।

কথাটা হয়ত পুরো সত্য নয়। কারণ কেবল যে ব্যক্তি ইতিহাস পাঠকরে তা নয়। আসলে বর্তমানই অতীতকে পাঠ করে। বর্তমানের প্রয়োজনেই অতীতের আলোড়ন এবং উদ্‌ঘাটন। এ কারণে একটা কথা আছে, প্রত্যেক ইতিহাসই বর্তমানের ইতিহাস, অতীতের নয়। একথাটা অমূলক নয়।

কিন্তু বর্তমান থেকে বর্তমান আবার আলাদা। এই পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর সচেতন অংশের যে বর্তমান এই শতকেরই বিশ-ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে ছিল,

সেই পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর সচেতন অংশের সত্তর কিংবা আশির দশকের বর্তমান এক এবং অপরিবর্তিত নয়। আজকের বর্তমান, বর্তমানের প্রয়োজনে একটু ভিন্নতর দৃষ্টিতে অতীতকে পাঠ করতে চায়। প্রাগ্রসর ইতিহাসকারদের নিকট আজকের বর্তমান স্বাভাবিকভাবে তাই অতীত পাঠে কিছুটা নতুন ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ দাবি করবে।

মানুষের পরিচয়ের একাধিক ক্যাটেগরি বা সূত্র আছে। পূর্ববাংলার মানুষের প্রধানতম অংশের পরিচয়ের একটা ক্যাটেগরি যে তারা ধর্মে মুসলমান। কিন্তু তারা যদি কেবলই মুসলমান হত তাহলে তাদের পক্ষে আর বাঙালি হয়ে ওঠা সম্ভব হত না। কিংবা তারা যদি কেবল বাঙালি অর্থাৎ পূর্ব বাঙালি এবং মুসলমান হয়েই থাকতে চায় তাহলে আর তাদের আর্থিক বিন্যাসের ভিত্তিতে শ্রেণীগত যে বৈচিত্র্য এবং দ্বন্দ্ব রয়েছে তাকে অনুধাবন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এবং পরিশেষে তারা যদি শ্রেণীসংঘাতকেই চরম বলে মনে করে, তাকে অতিক্রম করে শ্রেণীহীন সমাজ তৈরির কল্পনা যদি তারা না করতে পারে এবং তাকে বাস্তবায়িত করার পথ যদি তারা না পায় তাহলে তাদের পক্ষে যথার্থরূপে মানুষ বলে পরিচিত হওয়া সম্ভব হবে না। কারণ, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খৃস্টান এবং বাঙালি, বিহারি কিংবা পাঞ্জাবি—তাদের আসল আত্মপরিচয় এই যে, তারা মানুষ। সেই আসল আইডেন্টিটি বা আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে এবং সেই লক্ষ্যে ক্রম অগ্রসরের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, বিহারি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি মধ্যবর্তী পর্যায়ের পরিচয়গুলোর তাৎপর্য।

অবশ্য মানুষের জীবনের ইতিহাসে এই পর্যায়ন্তর বছর কিংবা দশকের ব্যাপার মাত্র নয়। এক একটা স্তর বা প্রক্রিয়ার বিস্তার দীর্ঘ হতে পারে : শতাব্দী কিংবা তারও অধিক তার একটি স্তরের পরিমাপ হতে পারে। আমি শুধু লক্ষ্য হিসেবে কথাটার উল্লেখ করেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার গোড়ার কিছু তথ্যের উল্লেখ করা যাক। বৃটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় স্থাপনের প্রস্তাব দেয় ১৯১২ সালে। ঐ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯১১ সালের পরে। ১৯১১ সালে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' ঘোষিত হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯১১ সালে তৎকালীন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা মিলিত বিপুলাকার প্রদেশকে বৃটিশ সরকার বিভক্ত করে আসাম এবং পূর্ববঙ্গ নিয়ে একটি প্রদেশ তৈরির প্রস্তাব ঘোষণা করে। তখন রাজনৈতিক আরো ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে উপলক্ষ করে তখনকার প্রাগ্রসর হিন্দু সমাজ বিশেষ করে সে সমাজের ইংরেজি শিক্ষিত এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে ক্রমাধিক পরিমাণে উচ্চকণ্ঠে উচ্চ এবং মধ্যশ্রেণী আবেগময় এক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। তৎসত্ত্বেও ১৯০৫ থেকে ১০১১ সাল পর্যন্ত নতুন প্রদেশটি চালু থাকে। কিন্তু ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ

করে বিহার এবং উড়িষ্যাক বাদ দিয়ে বঙ্গপ্রদেশ পুনর্গঠিত করে। এই ঘটনার নানা ব্যাখ্যা। কিন্তু একটু অধিকতর দূরের দৃষ্টিতে আজ একথা বলা যায় যে আসলে ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ বৃটিশ সরকার তখনকার বাঙালি জাতীয়তাকে আঘাত করার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে করে নি। কারণ ১৯০৫ সনের পূর্বে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের চরমপন্থী-সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ যত না ঘটেছে, ১৯০৫ সনের পূর্বে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের চরমপন্থী—সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ যত না ঘটেছে, ১৯০৫-এর পরে ১৯০৮ পর্যন্ত তার অধিক ঘটেছে। এবং এই সময়েই বৃটিশ সরকার সর্বপ্রকার চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি। রাজনৈতিক সংগঠন এবং আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করে। তাই হিন্দু মধ্যবিত্তের বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দমন করার প্রয়োজন বৃটিশ সরকারের ১৯০৫-এর পরে যত ঘটেছে, পূর্বে তত নয়। একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য একথা যে নওয়াব সলিমুল্লাহ বা অপর কোন মুসলমান নেতা বা নেতৃবৃন্দের আবেদনে সেদিন বৃটিশ সরকার আসাম এবং পূর্ববঙ্গ নিয়ে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠন করে নি। বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ করেছিল পূর্বতন বিপুলাকার প্রদেশের শাসনগত সমস্যা কিছুটা সহজ করার জন্য। পূর্বতন বৃহৎ প্রদেশের মধ্যে পূর্ববঙ্গে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা ছিল অধিকতর দুর্বল। পূর্ববঙ্গে রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। উচ্চতর অফিসারের অভাবে পূর্ববঙ্গের অনেক জেলার মানুষ যেখানে ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার এবং সৈন্যবাহিনীকে আদৌ কখনো চোখে দেখতে পায় না, সেখানে তাদেরমনে ইংরেজ সরকারের প্রতি সমীহবোধ জাগবে কেমন করে?

একথা সত্য যে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম মিলে একটা প্রদেশ হওয়াতে এবং ঢাকা তার রাজধানী হওয়াতে ঢাকা শহরের প্রধানদের এবং সাধারণভাবে পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত অংশের প্রশাসনগত চাকরি এবং শিক্ষা ও ব্যবসায়ের সুযোগ কিছুটা সহজপ্রাপ্য হওয়ার এবং বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু মুসলমানদের মুখের দিকে লক্ষ্য রেখে বৃটিশ সরকার যেমন ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ করে নি, তেমনি ১৯১১ সালে তাদেরদিক থেকে মুখ ফিরিয়েও তারা বঙ্গভঙ্গ রদ করে নি। তাদের মুখ একদিকেই নিবদ্ধ ছিল। সেদিকটি ছিল ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং চেতনার দিক। আর সে চেতনার ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজই তখন প্রধান। কেবল যে সে সমাজের চেতনা তখন প্রধান ছিল, তাই নয়। সে সমাজের কিংবা সে সমাজের সচেতন শ্রেণীগুলোর তৎকালীন শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধতাও প্রধান ছিল।

এই সীমাবদ্ধতা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনেও কম প্রকাশিত হয় নি। পূর্ববঙ্গ এবং আসাম প্রদেশ গঠনের ক্ষেত্রে যে কথা বৃটিশ ভাবে নি, সেকথা ভাবল হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণ শ্রেণীগত স্বার্থপ্রণোদিত হিন্দু মধ্যবিত্ত। তারা ক্ষোভ প্রকাশ

করে বললো, বঙ্গ দেশকে ভঙ্গ করার আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান প্রাধান্যের একটি প্রদেশ তৈরি করা।

এই মনোভাবের ফলে আন্দোলনকারী হিন্দুমধ্যবিত্তের পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কোনো আন্দোলন বৃটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। আর এর ফলে বৃটিশ সরকারের বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে হিন্দুমধ্যবিত্ত-জাতীয়তাবাদের ক্ষমতা নেই ভারতের সকল ধর্মাবলম্বী মানুষকে নিয়ে অখণ্ড কোনো জাতীয়তাবাদী মোর্চা তৈরি করার। এই অক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়েই ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে ইংরেজ প্রতিভূগণ বলার সুযোগ পায় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলমানদের জন্য একটি চমৎকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে চিন্তা করা হয়েছিল।

কিন্তু কি রকম চমৎকার ক্ষতিপূরণ যে ১৯১২ সালে যার প্রস্তাব হল, ১৯২২ সালেই মাত্র তার বাস্তবায়নের শুরু হল। অথচ এর মধ্যে অর্থাৎ এই দশ বছরে কেবল বঙ্গভঙ্গ রদ হয়নি, ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধটা সংঘটিত হয়েছে, ১৯১৬-তে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ সমঝোতার প্রয়োজন উপলব্ধিকরে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সহি করতে সক্ষম হয়েছে এবং বড় কথা ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাগের হত্যাকাণ্ডের পরে দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা ঘটেছে যে-আন্দোলনের মৌলানা শওকত আলী এবং মৌলানা মোহাম্মদ আলীর ন্যায় মুসলিম নেতা যোগ দিয়েছেন। এ সমস্ত ঘটনাদৃষ্টেই ইংরেজি প্রতিভূষণ বলার প্রয়োজনীয়তা বোধকরেছে ১৯২২ সালে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'একটি চমৎকার রাজকীয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে চিন্তা করা হয়েছিল। ইংরেজ প্রতিভূগণ এসব ঘটনাতে অধিকতর সচেতনতার সঙ্গে বুঝলো যে, নবজাগ্রত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এখন যত না দান করা দরকার আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান, তার চেয়ে অধিক ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বোধ। আর তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'কোর্টে'র মিটিং-এ ইংরেজ ভাইস চ্যান্সেলর হার্টগ বললেন, 'ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধ্যায়নই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে।' এজন্য আরবি এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে যাকে প্রধান হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হয় তিনি একজন ইউরোপীয় অধ্যাপক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি সাধারণ বক্তব্য এই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের তরুণদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। আগে যেখানে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল নগণ্য, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকের ছাত্রসংখ্যা এবং তাতে মুসলমান ছাত্রের যে বৃদ্ধির তথ্য পাওয়া যায় তাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেই মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা খুব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন দেখা যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্র বৃদ্ধির তথ্য (অসম্পূর্ণ)।

শিক্ষাবর্ষ	মুসলমান ছাত্রসংখ্যা	মোট ছাত্রসংখ্যা
১৯২১-২২	১৭৮	১১০৫
১৯২২-২৩	২৪৫	১৩৩০
১৯২৩-২৪	৩০০	?
১৯২৪-২৫	... ৩৭১	১৪৮১
১৯২৯-৩০	৪২৭	১৩০০
(ট্রেনিং কলেজ ও মেডিকেল	স্কুলের ছাত্রদের বাদে)	
১৯৩০-৩১	৩৯৯	"
১৯৩০-৩৪	?	১০২৭
১৯৩৪-৩৫	?	৯৩৩
(৩৯ জন ছাত্রীসহ)		
১৯৩৭-৩৮	৫৯৫	১৩৬৯
১৯৩৯-৪০	৬৭৩	১৫২৭
১৯৪০-৪১	৬০০	১৬৩৩
১৯৪৫-৪৬	?	১০০০ ৯০ জন ছাত্রীসহ
১৯৪৬-৪৭	?	১০৯২ (১০০ জন ছাত্রী)
১৯৪৭-৪৮	৮৮৫	১৬৯৩ (৭২ জন ছাত্রী)

আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো সেই মধ্য ও উচ্চ কৃষককে তৈরি করে নি, যে মধ্য এবং উচ্চ কৃষক তার সন্তানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ব্যয়বহুল শিক্ষালাভে পাঠাতে পারে বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বকালীন অবস্থা, কলকারখানার বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা, পাটের মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে পূর্ববঙ্গে মধ্য এবং উচ্চ কৃষক যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি তাদের সন্তানরা স্কুল, কলেজ, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে শুরু করেছে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সময়কার ছাত্র তথ্যে দেখা যায় ত্রিশের মন্দায় মুসলিম ছাত্র সংখ্যায় হ্রাস ঘটেছে এবং যথার্থভাবে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯, ১৯৪০-এর দিকে।

পূর্ব পাকিস্তান এবং পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন অর্থাৎ : পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে একটি মীমাংসাকারী ভূমিকা পালন করেছে, তা নিঃসন্দেহ। আর এ ভূমিকার বীজ পাকিস্তান সৃষ্টির পরে উপ্ত হয় নি, হয়েছিল পাকিস্তানের পূর্বে ১৯৪০-৪২,'৪৩ সালে : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদেরই একাংশের মধ্যে। এ বীজের বৃদ্ধি ঘটেছিলো '৪৩-এর যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে জনতার পাশে যেয়ে তাদের

দাঁড়ানোয়, রক্তক্ষয়ী আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিরুদ্ধে তাদের শান্তির মোর্চা সংগঠনে এবং নেতৃত্বদানে, কোলকাতার রশীদ আলী দিবসের সংগ্রামী আওয়াজকে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তারিত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের জঙ্গি ভূমিকা পালনে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তর্ক, বিতর্ক, বক্তৃতা—অর্থাৎ তার সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবেশে তাদের দ্বারা মানবকল্যাণ, স্বাধীনতা,সমাজতন্ত্র এবং আন্ত র্জাতিকতার বোধ সৃষ্টির মধ্যে। এই মুসলিম তরুণদের আদর্শগত ভাবনাই পাকিস্ত ান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই পূর্ববাংলার মানুষের মোহমুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগামীর দায়িত্ব পালন করে। আর তারই ফলে ১৯৭১। তাদেরই উত্তরসূরি ১৯৭১-এর শহীদ বুদ্ধিজীবী শিক্ষক-ছাত্র যাঁরা বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় যে কেবল মুসলান হিসেবে নয়, তার উত্তম পরিচয় যে বাঙালি হিসেবে এই সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। আর এ কারণেই যুগের হিসেবে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের নিকট তাঁরা চক্ষের শূল হয়েছিলেন এবং এজন্যই প্রতিক্রিয়ার হাতে তাঁরা নিহত হয়েছিলেন।

কিন্তু এ পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিশ বছরের পরবর্তী ইতিহাস। আর এ পর্যায়টিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, অধিকতর তাৎপর্যে পূর্ণ। এর বিস্তারিত ইতিহাস রচনা আজকের ইতিহাসকারদের অন্যতম দায়িত্ব এবং কর্তব্য। [১৯৮৬]

** কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ১৫-১২-৭৬ তারিখে ইতিহাস সমিতির সেমিনারে ড. আবদুর রহিম (চেয়ারম্যান ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক পঠিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববাংলার মুসলিম জাগরণ' শীর্ষক প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি।*

পরিশিষ্ট ২

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে গোড়ার দিকেই শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর কিছু স্মৃতি সংগ্রহ করার জন্য জানুয়ারি ১, ১৯৭৭ তারিখে অমি তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। সাক্ষাৎকারটির বিবরণ 'কাজী মোতাহার হোসেনের সান্নিধ্যে' শিরোনামে ১৯৭৭ (বাংলা ১৩৮৪)।-এর ঈদ সংখ্যা 'দৈনিক সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটির বিবরণ পুনরায় নিম্নে দেওয়া গেল।

আজ পহেলা জানুয়ারি, ১৯৭৭ সাল। ভাবলাম, হিসাব-নিকাশের আর একটা বছর তো শুরু হল। কিন্তু আমি কী দিয়ে এর সূচনা করি?

কিছু দ্বিধা নিয়ে বেরুলাম ঘর থেকে। হাতের থলিতে নিলাম কিছু খাতা-পত্তর আর শব্দ ধরার একটি ক্ষুদে যন্ত্র 'টেপরেকর্ডার।' একটা ইচ্ছা মনের মধ্য অনেকদিন ছিল যে, কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ কথা বলবো এবং সম্ভব হলে তাঁর কণ্ঠস্বর কিছুটা ধরে রাখবো। দেখি আজ তা পারি কি না। সেদিন এই ইচ্ছা নিয়ে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। সেখানে সেদিন, ২৬-১২-৭৬ তারিখে তাঁর নির্বাচিত গ্রন্থসঙ্কলনের ওপর একটি আলোচনা ছিল। 'মুক্তধারা' প্রকাশ সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত গ্রন্থ প্রদর্শনী ও আলোচনা। ভেবেছিলাম কাজী সাহেবও কিছু বলবেন। কিন্তু আলোচনার মাঝ পথে অন্য কোথাও যেতে হল বলে তিনি বললেন না।

সেগুনবাগানে তাঁর বাড়িতে যেয়ে উঠলাম। এ বাড়িতে যাতায়াতের স্মৃতি আমার কেবল আজকের নয়। অনেকদিন আগের। অবশ্য বাড়িখানি স্থান পরিবর্তন না করলেও তার আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। একতলা বাড়ি বোধহয় এখন চারতলা কিংবা পাঁচতলায় পরিণত হয়েছে।

আমি যেয়ে দেখলাম, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কাজী সাহেব দাবা খেলছেন। এটিতে এখনো তিনি সমান রপ্ত, সেই ১৯৪২-৪৩ এর স্মৃতি। তখনো দেখেছি, তিনি কোনো দাবাড়ু পেলেই তাকে নিয়ে দাবায় বসে যেতেন। আজো তেমনি। তবু আজ বয়সের ভারে স্মৃতির প্রখরতা কিছুটা বিনষ্ট। কানেও শুনতে অসুবিধা হয়। আমি জানি, আমার নাম যদিবা তিনি বিস্মৃত হয়ে থাকেন তবু আমার ওপর তাঁর স্নেহের স্মৃতি মুছে যায় নি। তাই কাছে যেয়ে জোরে শব্দ করলাম : স্যার, আমার নাম মনে আছে? কাজী সাহেব আমার হাত জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে নিয়ে বললেন : তোমাকে ভুলতে পারি? তুমি আমার ছেলের মতো।

কাছে বসতেই কয়েক টুকরা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন : তুমি পড়ে দেখো। আমি লিখেছি।' কিছু স্মৃতির কথা। আমার হাতে কাগজের টুকরা কয়টি সঁপে দিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে দাবা খেলার চাল দেওয়ার কথা চিন্তা করতে লাগলেন : তাইতো, যা অবস্থা দেখছি এ মারাই পড়বো! ...

আমি কাগজের টুকরা কয়টি গুছিয়ে পড়তে লাগলাম। পড়তে কোনো অসুবিধা হয় না। হাতের লেখাটি সেই ত্রিশ-পয়ঁত্রিশ বছর আগের মতোই সুগঠিত, দৃঢ় এবং স্পষ্ট। স্মৃতিকথাটি এককালের বাঙালি মুসলিম কৃতী মহিলা শিক্ষাবিদ ফজিলতুন্নেছা সম্পর্কে। ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কে অনার্স এবং এম.এ.তে প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সেকালের নানা উপাখ্যানের নায়িকা ছিলেন তিনি। কবি নজরুল ঢাকাতে এসে তাকে দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। অধ্যাপক এন. এম. বসুরও প্রগাঢ় স্নেহ ছিল এর ওপর। কিন্তু আমরা জানতাম না, কাজী মোতাহার হোসেনেরও তিনি ছিলেন একান্ত স্নেহধন্য। কাজী সাহেবের স্মৃতিচারণে এই প্রথম আমি সে কথা জানতে পারলাম এবং অবাক হলাম। এ স্মৃতিকথা লেখার উপলক্ষ নাকি কয়েক মাস আগে পরিণত বয়সে তার লোকান্তরিত হওয়া। তাঁর একটি মেয়ে আছে। সেও আজ ঘর-সংসারে স্থাপিতা। তাঁর স্বামী নাকি একজন ব্যবসায়ী। কাজী সাহেব তার লেখা কাগজের টুকরা কয়টিতে উল্লেখ করেছেন, ফজিলতুন্নেসা কোথায় জন্মেছিলেন। গরিব ঘরের একটি মেয়ে। করটিয়ার জমিদার পরিবারে আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের মেধা দিয়ে শিশু বয়স থেকে সকলকে সম্মোহিত করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিলেন বিদ্যার্জনের পথে। ঢাকায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন তখন ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন কাজী সাহেবের সঙ্গে, তার পরিজনদের সঙ্গে। কাজী সাহেব লিখেছেন : "ওকে আমি নিজের বোনের মত দেখেছি।ওর রোগে, অসুস্থতায় ওর বিছানার পাশে বসেছি, ওকে আদর করে সারিয়ে তুলেছি।" ঘটনার বিবরণ এবং স্মৃতিচারণ কাজী সাহেবের সর্বজন পরিচিত ভাষার সারল্য এবং অকপট প্রকাশের বৈশিষ্ট্যে এখনও বিশিষ্ট। এ কাগজের টুকরো কয়টিতে ফজিলতুন্নেসার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, এমন অপর কোথাও তার কোনো বিবরণ আছে বলে আমার জানা নেই। স্মৃতিচারণের কাগজের পৃষ্ঠা কয়টি পড়ে আমি বললাম : "এ জিনিসটিই আপনার নিকট থেকে চাচ্ছিলাম। আপনার স্মৃতিকথা। আপনার জীবনের কাহিনী। লিখেছেন কি এমনি কাহিনী আরো"—এ

প্রশ্নে তেমন কোন জবাব দিতে পারলেন না। জবাবের অনিশ্চয়তায় বোধ হল হয়ত কিছু লিখেছেন। ধারাবাহিকভাবে না হলেও। কিন্তু তা কোথায় রয়েছে, সে কথা মনে করতে পারছেন না।

আমার টেপরেকর্ডারটি চালু করে কিছু আলাপ করলাম। বললাম : আপনার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা কিছু বলুন। কাজী সাহেব বললেন, কখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। সেই ১৯২০ সালে। তখনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। তখন ঢাকার প্রধান কলেজ ঢাকা কলেজ। কার্জন হলে তার অবস্থান। ইংরেজ সাহেব আর্চবলড নাকি তার প্রিন্সিপ্যাল। কঠিন মানুষ তিনি। কঠিন তখনকার শৃঙ্খলাবোধ। গল্প বললেন সেই ডিসিপ্লিনের। মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলেন। বলেন, কী যেন বলছিলাম? ধরিয়ে দিলে আবার বলেন। যত না স্মৃতিকে ঝালিয়ে তুলতে পারেন, তার চেয়ে স্মৃতির পটে যা আটকে আছে তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেন প্রকাশিত হয়। তারপর আবার হয়ত ছেদ পড়ে। আবার স্মৃতির অপর ভাস্বর টুকরা। কিন্তু আলাপে দেখলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিশ এবং ত্রিশের দশকের ক্ষুদ্র পরিসরের সেই আবাসিক বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ গৃহের পরিবেশটি কাজী সাহেবের মনে অম্লান হয়ে আছে। বললেন, "আমি তখনো এম.এ. পাস করি নি। মাত্র পরীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু ল্যাংলী সাহেব তখনি আমাকে চাকরি দিলেন।"

আমি ঠিক জানতাম না, স্যার অঙ্কে না পদার্থবিজ্ঞানে এম.এ.। জিজ্ঞেস করতে বললেন : ফিজিক্স-এ. কিন্তু এম.এস. সি. এন, এম.এ।

তিনি বললেন, "আমরা থিওরেটিক্যাল পরীক্ষা দিয়েছিলাম ঢাকা। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল দিতে হয়েছিল কোলকাতায়।"

তাঁর এম.এ. র কৃতিত্বের কথা জিজ্ঞেস করায় বললেন : "আমি ফার্স্ট ক্লাস পাই নি। কিন্তু ফার্স্ট হয়েছিলাম। কেন যে ফার্স্ট ক্লাস পেলাম না, তারও গল্প আছে।"

আমি বললাম : কি গল্প?

: এক সাহেব এক বিষয়ে আমাদের নিয়েছিলেন প্রাকটিক্যাল। সে সাহেব আমাদের ত্রিশ-চল্লিশজনের মধ্যে তিনজনকে মাত্র পাস করালেন।

আমি বললাম : মুসলিম ছাত্র আপনারা কজন ছিলেন?

: না, ক'জন নয়। আম একাই ছিলাম মুসলমান ছেলে। আর সাহেব ফার্স্ট করালেন আমাকে। সাহেবের এই রেজাল্ট দেখে অন্য মাস্টাররা গেলেন রেগে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বললেন, সাহেব যে তিনজনকে পাস করিয়েছে তাদেরকে ঠাসতে হবে। আর এমন ঠাসা তারা ঠাসলেন যে, এই তিনজনের মধ্যেও একজনকে ফেল করিয়ে দিলেন। একজন থার্ড ক্লাস পেল। আর আমি সেকেন্ড ক্লাস পেলাম। দাবাতে দাবাতে এরকম হল। বিচারের এই মানদণ্ড দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। একজন বেশি নম্বর দিল, তার জন্য কি আমরা দায়ী।

কিন্তু স্যার, এই সমস্ত নীতির মূল্য তো আপনাদের সেই পুরনো যুগেই বেশি ছিল, না কি?

হয়ত আমার প্রশ্নটা শুনতে পান নি কিংবা হয়ত প্রশ্নের জবাব হিসেবে বলতে লাগলেন : 'প্রেসিডেন্সি কলেজে আমি যখন পড়ি তখন ওটেন সাহেবকে ছাত্ররা মেরেছিলো। তার কারণ হল, তিনি হিস্টরির প্রফেসর। তিনি বলেছিলেন, "হিন্দুস আর এসেনশিয়ালিএ ব্যাকওয়ার্ড নেশন।"

: তখন ছেলেরা মারল রাগ করে?

: হ্যাঁ, ছেলেরা মারলো। আর তার লিডার ছিল সুভাষ বোস। আমি সেই ঘটনার সময়ে বারান্দায় ছিলাম। নোটিশ বোর্ড দেখছিলাম। হঠাৎ শব্দ শুনলাম, 'মার শালাকো, মার শালকো'। এই শুনে যখন সরে পড়তে যাচ্ছি, দেখি ওটেন সাহেবকে ছেলেরা ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করলাম, ভয়ানক ব্যাপার। আমি তাড়াতাড়ি, ঐ কী যেন রাস্তাতে বলে তাতে চড়ে ...।

আমি ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

: বাস?

: না।

: ট্রাম? তখন ট্রাম ছিল না?

: হ্যাঁ, ঐ ট্রামে চড়ে ইলিয়ট হস্টেলে চলে এলাম।

: আমি আবার তাঁর পরীক্ষা পাসের কাহিনীটিতে ফিরে যেতে চাইলাম।

: আপনি একমাত্র মুসলমান ছেলে যে পরীক্ষাতে ফার্স্টহলেন, এতে হিন্দু ছেলে কিংবা হিন্দু শিক্ষকদের মধ্যে কি কোন রি-এ্যাকশন হয়েছিল?

: হিন্দু ছেলেদের মধ্যে রি-এ্যাকশন এই দেখেছি যে পরীক্ষা হয়েই তো তিন মাস ছুটি হয়ে গেল। সেই তিন মাস ছুটির পরে যে এসেছি তখন আমার প্রতি ফার্স্ট কথা হচ্ছে : মিয়া সাহেব তো বেশ মেরে দিয়েছে। মানে মুসলমান ছেলে ভালো করতে পারে না। তাই বলছে : মিয়া সাহেব তো বেশ মেরে দিয়েছে। তবে আমি তাদের কথা ততো গায়ে মাখি নি।

অধ্যাপক ও বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসুর সঙ্গে কাজী সাহেবের অধ্যাপনার ক্ষেত্রেই ঘনিষ্ঠাতা। আমি সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম :

: স্যার, সত্যেন বসু সম্পর্কে আপনার তো বেশকিছু স্মৃতি আছে। আপনাদের মধ্যে তো ভালো রিলেশন ছিল।

: হ্যাঁ।

কিন্তু কথার জবাবে সত্যেন বসুর চাইতেও পুরনো কথায় ফিরে গেলেন। সেই ওটেন সাহেবের মারের কথা বললেন :

: তারপর কলেজের সব ছেলেরর দশ টাকা করে ফাইন হল। তখন আমার অবস্থা কঠিন। আমাকেও ফাইন দিতে হবে। অথচ আমি পনের টাকা স্কলারশিপ পাই। তার মধ্যে সাত টাকা খাওয়া খরচ। দুই টাকা মাইনে দিতে হয়। বার টাকা মাইনের মধ্যে দশ টাকা আমি মোহসিন ফান্ড থেকে পেতাম। বাকি দুটাকা আমাকে দিতে হত। ... শেষে দেখলাম একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনো ছাত্র যদি এ ব্যাপারে কোনো টিচারের মারফত এ্যাপলাই করে তাহলে তার ফাইন

কমিয়ে এক আনা করে দেওয়া হবে। দশ টাকা ফাইন আমি কেমন করে দেব। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর, কী যেন নাম, বাগেরহাট বাড়ি ...

আমি বললাম : আচার্য পিসি রায়ের কথা বলছেন?

কাজী সাহেব হলেন : হ্যাঁ হ্যাঁ পিসি রায়। সেই পিসি রায়কে আমার খুব ভালো লাগত। উনি খুব সুন্দর রসিকতা করে পড়াতেন। আমি পিসি রায়ের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে গেলাম। আমি তাকে যেয়ে বললাম, স্যার আপনি আমার কেস রিকমেন্ড করে দিন। কিন্তু তিনি কি বললেন জানো, তিনি বললেন, 'দেখো, তুমিতো মুসলমান। তুমি বরং মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে নাও। আমি অনেক হিন্দু ছাত্রকে সার্টিফিকেট দিয়েছি। আমি আর এখন দেব না। পিসি রায়ের মুখে এই কথা শুনে আবার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার মনে এত ঘৃণা হল যে আমি মনে করলাম, এদের কাছে পড়াও অন্যায় ...

: কিন্তু স্যার আমরা শুনেছি, পিসি রায় নাকি খুব উদার বলে পরিচিত ছিলেন?

কাজী সাহেবের মনের ক্ষোভটি আজো যায় নি। তাই বললেন :

: হ্যাঁ, পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ভেতরে এই ছিল? অবশ্য 'একসেপশন' আছে। 'মহলানবিশ, সত্যেন বাবু, এঁরা'একসেপশন' ...

এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম : স্যার, আপনি যে লেখাপড়া করলেন, এ কার উৎসাহে? আপনার পিতার কিংবা কোনো অভিভাবকের?

কাজী সাহেব বললেন : আমি তো একেবারে নিম্ন প্রাইমারিতে দুই টাকা করে স্কলারশিপ পেয়েছি। উচ্চ প্রাইমারিতে তিন টাকা করে স্কলারশিপ পেয়েছি। মাইনে পাঁচ টাকা করে।

: কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার দিক থেকে আপনি কি আপনার পরিবারে প্রথম?

: বলা যেতে পারে আমিই প্রথম। আমার ফাদারও শিক্ষিত ছিলেন। তবে তিনি এন্ট্রান্স পাস করেন নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম : স্যার আপনাদের পারিবারিক অবস্থান কেমন ছিল? সচ্ছল ছিল?

: না, আমার ফাদার আমিন ছিলেন। আর আমিনের আয়তো জমিজমা সার্ভের সময়ে। তাতো সবসময় হত না।

: কিন্তু পরিবারের জমিজমা তো ছিল?

: জমি ছিল অল্প। জমি আমাদের ছিল ধর্মীয়। মানে হিন্দুদের যেমন ব্রহ্মত্তর, আমাদের অমনি যেন কি একটা আছে, দিল্লির বাদশাহের দেওয়া।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : স্যার আপনিকি সচেয়ে বড় ছেলে ছিলেন।

কাজী সাহেব বলেন : হ্যাঁ, আমি ছিলাম eldest son.

: আপনার আর ক'জন ভইবোন ছিল?

: আমরা চার ভাই, আর সাত বোন।

: ভাইরা কি আছেন, এখনো?

: ভাই একজন আছেন। আর সব মরে গেছে। একজন আছে, সে কুমারখালিতে।

কাজী সাহেবের বযস জানার জন্য আমি প্রশ্ন করলাম : স্যার, আপনার জন্ম হয় কোন বছর? আপনার কি মনে আছে?

কাজী সাহেব বললেন? হ্যাঁ, মনে আছে। ১৩০৪ সনের ১৪ শ্রাবণ। তার মানে ১৮৯৭ সাল।

: সে হিসেবে আজ '৭৭ সালে আপনার বয়স উনাশি বছর?

: হ্যাঁ, এখন '৭৯ পার হয়ে আমি আশিতে পড়েছি। কী কথা যেন বলছিলাম? ...

আমি আবার ধরিয়ে দিলাম। কিছু আগে কাজী সাহেব তাঁর বাবার কথা উল্লেখ করেছিলেন : আপনি বলছিলেন, আপনর বাবা কতো বছর বেঁচেছিলেন।

হ্যাঁ, উনি প্রায় ৭০-৭৬ বছর বেঁচেছিলেন।

: কোন সালে মারা যান?

: চল্লিশের দিকে।

: তখনো তো আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক?

: হ্যাঁ।

: তাই আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা কিছু বলুন। সত্যেন বসু, জ্ঞানঘোষ এদের সঙ্গে আপনার এসোসিয়েশনের কথা কিছু বলুন।

হ্যাঁ, এদের কথা মনে আছে?

আর কার কথা মনে আছে?

: হ্যাঁ আর্চ বলড্ ...

: তিনি তো ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। একথা আপনি বলেছেন। আর কার কথা মনে আছে?

: স্মিথ সাহেবের কথা মনে আছে। তিনি ক্রিকেট খেলতেন।

: তিনি কি ঢাকা কলেজে ছিলেন?

: হ্যাঁ, ঢাকা কলেজে ছিলেন।

: ইউনিভার্সিটিতে লাংলি সাহেব এসেছিলেন?

: হ্যাঁ, এসেছিলেন, পরে টার্নার সাহেব ছিলেন। ব্যারো সাহেব ছিলেন। উনি বোধহয় কেমিস্ট্রিতে ছিলেন। ...

আমি বললাম : বিখ্যাত প্রফেসরদের মধ্যে রমেশ মজুমদার, হরিদাস ভট্টাচার্য—এঁদের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে? হরিদাস বাবু আমার নিজের শিক্ষক ছিলেন।

এঁদের কথা মনেকরতে যেয়েই কাজী সাহেব বললেন : ইউনির্ভাসিটি হওয়ার পরে একজন লোক এলেন জলপাইগুড়ির, কী যেন নাম?

আমি ধরিয়ে দিলাম : এ.এফ. রহমান?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, রহমান সাহেব, এ.এফ. রহমান।

আমি বললাম : এ.এফ. রহমানের নামে এখন একটা হল হয়েছে, এ.এফ. রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের।

: এফ. রহমান যেন কেমন কেমন নিয়তের লোক ছিলেন। একু 'বায়াস' ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে একটা জিনিস ছিল, আমি পছন্দ করতাম না। তাঁর কিন্তু 'পেট' ছাত্র ছিল। তাদের সঙ্গে তিনি ভাব রাখতেন, তাদের খুশি রাখতেন।

: আপনি তো ছাত্রদের দলাদলির মধ্যে কখনো ছিলেন না?

: না, আমি এসবের মধ্যে কখনো ছিলাম না।

: আপনার নিশ্চয়ই চল্লিশ সালের পরের দিককার কথা মনে আছে?

: হ্যাঁ, আছে। একটা ঘটনার কথা বলি। সত্যেন বসু আমাদের টেস্ট করতেন। টিচারদের টেস্ট করতেন। অঙ্ক দিয়ে পরীক্ষা করতেন। সে অঙ্ক দেখলে সোজা মনে হয়। কিন্তু করতে গেলে বিষম লাগে। একদিন তিনি সাতটা কি আটটা প্রশ্ন দিয়ে বললেন : পরের সপ্তাহে তোমরা আমাকে দেখাবে। কে কয়টা পারলে। আমি সে অঙ্ক নিয়ে সাঁঝের সময় বসলাম। শুরু করলাম। দেখলাম। এগারটা কি সাড়ে এগারটার মধ্যে সব হয়ে গেল। তার পরদিন সত্যেন বাবুকে দেখাতে গিয়েছি। দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। কারণ তিনি আশা করেন নি। তারপর হঠাৎ বলে ফেললেন : তোমার তো ম্যাথেথেম্যাটিকস-এ এ্যাকুমেন আছে হে। তুমি খুব ক্লিয়ার। তোমার স্ট্যাটিসটিক্স পড়া উচিত। তুমি স্ট্যাটিসটিক্স পড়বে? একথা বলছি, আমি স্ট্যাটিসটিক্স গেলাম কী করে তা বলার জন্য। আমি বললাম : স্যার পড়তে পারি। কিন্তু আমি গরিব মানুষ। মাসের মাহিনা না পেলে তো সংসার চলে না। সত্যেন বসু তাতে বললেন : এটা তো ঠিক কথা। ঠিক আছে, আমি তোমাকে ছুটি দেব উইথ পে। তোমার ঢের ছুটি পাওনা আছে। আর ভ্যাকেশন এসে যাচ্ছে। অমি তখন তোমাকে মহলানবিশের কাছে নিয়ে যাব।' আমার শ্বশুরবাড়ি তো কোলকাতায় ছিল। আমি কোলকাতায় যেতাম। একবার তিনি আমাকে হাতে ধরে মহলানবিশের কাছে ছুটিতে নিয়ে গেলেন। বললেন : মহলানবিশ তুমি একে আমার ছোট ভাই বলে মনে করবে। দেখো কতোটা স্নেহ করতেন তিনি। বললেন : আমার ছোট ভাই বলে গণ্য করবে। একে ভালো পেয়েছি বলেই তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। দেখবো তুমি একবছরে একে কতোখানি স্ট্যাটিসটিক্স শিখিয়ে দিতে পারো। তারপর এই কথা বলার পরে মহলা বিশ প্রত্যেকদিন আমাকেজিজ্ঞেস করতেন, কোন অসুবিধা হচ্ছে নাতো? বই নিতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়। সেজন্য লাইব্রেরিতে বলেছিলেন, 'এ যত বই চায়, সব দিবে। অন্যদের কিন্তু তিনটার বেশি বই নেয়ার নিয়ম ছিল না।'

: এটা কোন সালে, মনে আছে, এই যে স্ট্যাটিসটিক্স পড়তে গেলেন।

: ১৯৩৯-৪০-এই সময় হবে। সত্যেন বাবু জন্যই আমার স্ট্যাটিসটিক্সটা হয়েছে। আমি ম্যাথেমেটিক্সটা ভালো জানতাম। ম্যাথেমেটিক্স আমি সোজা মনে করতাম। মনে করতাম এর চেয়ে ফিজিক্সটা কঠিন। তাই আমি এম.এ. ফিজিক্স হলাম।

আমি বললাম : আমরাও তাই মনে করি। এ ছাড়া সাহিত্যের ক্ষেত্র। সবখানেই আপনার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। এ নিয়ে আমরা প্রায়ই আলাপ করি। জ্ঞানের এক জগৎ থেকে অর এক জগতে যেতে আপনার কোন কষ্টের ব্যাপার নেই।

কাজী সাহেব বললেন : দেখো, সত্যেন বাবু কিংবা অন্য শিক্ষক, সকলের ভালোবাসা আমি পেয়েছি। নিজেও তাদের শ্রদ্ধা করেছি। তারাও আমাকে

ভালোবেসেছেন। দেখো, আর একদিনের কথা বলছি। একদিন আমি টেনিস খেলছি। আর অন্যরা বড় ফিল্ডে ফুটবল খেলছে। একবার চোখ উঠিয়ে দেখি টার্নার সাহেব দৌড়ে পালাচ্ছেন। কী ব্যাপার? সবার কিউরিয়াসিটি হল। মিনিট তিনেক পরে দেখা গেল, মস্ত বড় একটা বালতি হাতে করে তিনি আবার ফিল্ডে আসছে। তখন বুঝতে পারলাম, একটা ছেলে উনডেড হয়েছে। তাকে শুশ্রূষা করতেহবে, তাকে ড্রেস করতে হবে। সেজন্য তিনি দৌড়ে বালতি ভরে পানি আনতে গেছেন। কিন্তু আমরা হলে কী করতাম? আমরা হলে হুকুম দিতাম, আরে কে আছিস দেখতো, পানি-টানি কোথায়? এরকম চরিত্রের সান্নিধ্যে আমরা এসেছি। এই গেল ... কথার খেই হারিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : কার কথা বলছিলাম।

আমি বললাম : পুরনো শিক্ষকদের কথা বলছিলেন, তাঁদের মধ্যে যে অনুসরণীয় গুণ ছিল, তার কথা মনে করেছিলেন।

: হ্যাঁ, আচ্ছা আর একদিনের কথা শোন। ল্যাংলী সাহেবের কথা। স্পোর্টস হবে। স্পোর্টসের পুরস্কার হিসেবে ভালো ফাউন্টেন পেন ইত্যাদি দেওয়া হত। ছেলেদের জন্য এগুলো কেনা হয়েছে। এর মধ্যে একটা জিনিস দেখে ল্যাংলী সাহেবের ওয়াইফ বললেন, 'এটাতো বেশ ভালো'। ল্যাংলী সাহেব বুঝলেন, তাঁর ওয়াইফের এটি পছন্দ হয়েছে। এটি তার চাই। স্ত্রীর এই মনোভাব দেখে সাহেবের ভয়ানক রাগ হল। তিনি বললেন, এগুলি আমি আমাদের ছেলেদের জন্য এনেছি। আর তুমি এগুলোর প্রতি লোভ করছ? এই রাগের চোটে তিনি তার স্ত্রীকে ঘরে ঢুকতে দেন নি। তারপরে পারডোন ইত্যাদি চেয়ে স্ত্রীকে মিটমাট করতে হয়। এতখানি এদের নৈতিক জ্ঞান ছিল।

আমি কাজী সাহেবের মনের ভাবটি বুঝলাম। বললাম : এখন তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি অনেক বড় হয়েছে। আগের সেই এ্যাটমোসফিয়ার তো এখন নাই। তখন আপনারা সকলে পরিবারের মতোছিলেন। এমনকি ছাত্ররে সঙ্গে আপনাদের সংযোগ অনেক ঘনিষ্ঠ ছিল।

কাজী সাহেব বললেন : এখন যে বলে আমরা রেসিডেনশাল ইউনিভার্সিটি-কিছু এখন আর সেসব নেই।

: হ্যাঁ, স্যার, এখন আর সে পরিবেশ নেই।

: 'রেসিডেনশাল' পরিবেশটা জানতে পেরেছি আমরা। দেখো, একদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমি বাতি নিভাই নি। তারপরে ল্যাংলী সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন : 'নো, নো! এটা ভারি অন্যায়। রীতিমত সময়ে তোমরা ঘুমাবে। রীতিমত সময়ে উঠবে।' একথা বললেন। এতখানি তদারক ছিল।

: হ্যাঁ, স্যার, রেসিডেনশাল ইউনিভার্সিটি হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষে ঢাকার বেশ নাম ছিল।

: হ্যাঁ, বেশ নাম ছিল। রেসিডেনশাল ইউনিভার্সিটি হিসেবে কীভাবে পরিচালনা করতে হয়, পড়াশোনা করতে হয় তার একটা 'আইডিয়া' এখানে ছিল। তখন মাস্টাররা ছেলেদের মধ্যে খেলা করতেন। জেনকিনস সাহেব

আমাদের কত খেলা শিখিয়েছেন। তিনি ফুটবল এমন হেড করতেন যে কর্নার হলেই বোঝা গেল তিনি গোল করে দেবেন।

কথা বলছি আমরা। এক সময়ে কবি মনিরউদ্দিন ইউসুফ এলেন। কাজী সাহেবকে আগামীকাল তাঁর বাড়িতে দাওয়াত করতে চান।

: কিন্তু কাল আমার কোথায় যেতে হবে, তাতো আমি জানিনে। সে ঐ নোটবুকে লেখা আছে।'

তারপর নোটবুক বার করে খুঁজতে লাগলেন। ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, যে-এনগেজটমেন্টগুলো লেখা আছে সেগুলো পার হয়ে গেছে,না সামনে আছে। আমার মনে হল, এসেব ব্যাপারে কেউ যদি তাঁর সাথে থেকে সাহায্য করতো, বড় ভালো হত। তার ছেলে দুটি এই বাড়িতেই আছে। বড় ছেলে কাজী আনোয়ার হোসেন। 'মাসুদ' রানা' সিরিজ রহস্যেপন্যাস তারই রচনা। ডাক নাম নবাব। নবাবও আমার ঘনিষ্ঠ। স্নেহভাজন। তখন নবাব খুব ছোট ছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের কথা। আমি কাজী সাহেবের বাসায় ছিলাম কিছুদিন। হয়ত আমার ইউনিভার্সিটি ক্লাসের কোন দীর্ঘ ছুটির সময়ে। কাজী সাহেব তখন থাকতেন পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়, মানে এখানকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দক্ষিণ দিকে দোতলা গেটের বাড়িতে। পাশে একটা পুকুর। এই পুকুরেই সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নবাব আর তার একটু বড় সুলতান। দুভাই গিয়েছিলো, পুকুরঘাটে খেলা করতে। কেমন করে পড়ে গেল সুলতান পুকুরে। সাঁতার জানতো না। ডুবে গেল পুকুরে। পরে যখন খোঁজ করে তোলা হল ছেলেকে, তখন আর তার জীবন নেই। সেই ঘটনার কথা মনেকরিয়ে বললাম :

: আপনার সেকথা মনে আছে স্যার? আপনার ছেলে সুলতান পানিতে পড়ে মারা গেল। দেওয়ানবাজার গেটে আপনি থাকতেন। আমি তখন আপনার বাসায় থাকতাম।

: আচ্ছা, সেটা কোন সালে? নিজেই জিজ্ঞেস করলেন আমাকে। আমি বললাম, সেটা ১৯৪২ কিংবা '৪৩ সালে হবে।

: হ্যাঁ তাই হবে। সেদিন ছিল একট হিন্দু উৎসব।...

: আপনি কোথাও দাবা খেলছিলেন। ছেলেকে পানি থেকে উঠিয়ে দেখা গেল, মারা গেছে। 'আরপিফিশিয়াল রেসপিরেশন' দিলাম মিটফোর্ড নিয়ে। কিন্তু রিভাইভ করা গেল না। আপনাকে খোঁজ করে আমরা খবর দিলাম—এখনো হয়ত ছেলের অকাল মৃত্যুর কাঁটা বিঁধে আছে। ব্যথা বোধ করেন। উদাসভাবে বলতে লাগলেন :

একদিনের কথা মনে আছে। নওয়াব সুলতান, দুভাই যাচ্ছে। কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। আমি পেছনে। আমাকে খেয়াল করে নি। সুলতান বলছে : দেখ আমাদের জন্য আব্বু কত খাটেন। কত মেহনত করেন। আমরাও বড় হলে আব্বুর জন্য খাটবো ... সুলতান আমার খুব ভালো ছেলে ছিল।...

সেই ঘটনায় আমি খুব শক্‌ড হয়েছিলাম। সুলতান মারা যাওয়াতে সুলতানের ওপর আমার একটু লেখা ছিল। কোথাও প্রকাশ হয়নি। কিন্তু সুলতান মারা যাওয়াতে আমার মনের ভাবটি লিখে রেখেছিলাম।

আমার কথা শুনে আবার বললেন : ওর কথা মনে আছে। ও একদিন আমার সঙ্গে বেরিয়েছে। ল্যাবরেটরি দেখতে। সত্যেন বাবুও ল্যাবরেটরিতে। তিনি তো খুব ভোরে আসতেন। সুলতানকে দেখে বললেন : এটা কে? আমি বললাম, স্যার, আমার ছেলে। তারপরে সত্যেন বাবু ওকে অনেক প্রশ্ন করলেন : একটা আলপিন পানিতে ফেলে দিলে ভাসবে, না ডুববে? আরো অনেক প্রশ্ন। কাগজ পানিতে ফেলে দিলে কী হবে। সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক সুলতান জবাব দিল। ...

আমি বললাম : স্যার, আপনার আঘাতের কথা আমরা বুঝি। ওর আগে আপনার আর এক ছেলে ছিল বাদশাহ। সে মারা গেল। তারপর সুলতান মারা গেল।

: হ্যাঁ, বড় ছেলের নাম ছিল বাদশাহ ...

সত্যেন বাবু সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা। কথায় কথায় আবার বললেন, একদিন হল কি, আমি যেয়ে সত্যেন বাবুকে বললাম স্যার এই অঙ্কটা মিলছে না। আপনি একটু দেখুন। তিনি দেখে বললেন : হ্যাঁ, এটা তো ম্যাক্সওয়েলের অঙ্ক। বলে তিনি অঙ্ক কষতে লাগলেন। অঙ্ক কষছে। সময় বয়ে যায়। সময় বয়ে গেল। নাশতা এলো অঙ্ক শেষ হয় না। সত্যেন বাবু বললেন : কাজী তুমি নাশতা খাও। তারপরেও অঙ্ক চললো। সাড়ে দশটা বাজলো। ক্লাসে ছেলেরা এলো : স্যার ক্লাস করবেন না। সত্যেন বাবু বললেন : না, আজকে ক্লাস নেওয়া হবে না। হরিপ্রসন্ন আছে। হরিপ্রসন্ন তোমাদের ক্লাস নেবে। এই বলে সেই অঙ্ক কষেই চললেন। ...

আমি বললাম : হ্যাঁ,স্যার, সত্যেন বাবু সম্পর্কে অনেক গল্প আমরাও শুনেছি। তিনি মেয়েকে নিয়ে সিনেমায় গেছেন। যেয়ে দেখেন মানিব্যাগ নেন নি। মেয়েকে রেখে মানিব্যাগ নিতে বাড়িতে এসে অঙ্কের দিকে খেয়াল গেছে। অমনি মেয়ের কথা ভুলে অঙ্ক কষতে বসে গেছেন। তখন গাড়োয়ান দেরি দেখে একটা ঘণ্টা পরে সে বলেছে, হুজুর আপনি আপনার মেয়েকে সিনেমায় বসিয়ে রেখে এসেছেন। যাবেন না? এমনি মনভোলা মানুষ। আমরা ছাত্ররা তো জানতামই না ল্যাবরেটরি থেকে উনি কখন বাড়ি যান। এজন্য তাঁর সম্পর্কে আমাদের সবার মানে আর্টস, সায়েন্স—সব বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে এক বিস্ময়পূর্ণ ধারণা ছিল। সত্যেন বসুর চারদিকে একটি রহস্য ঘিরে ছিল। জ্ঞানী আত্মভোলা মানুষ বলে আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে যাওয়ার পরে কি আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

কাজী সাহেব বললেন : হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল। আমি একখানা বই লিখেছিলাম। সে বইটা হল স্ট্যাটিসটিকস্স-এর বিষয়ে।

আমি বললাম : এটা কি আপনার পিএইচডি পাওয়ার আগে না পরে?

: আগে। পিএইচডি পাওয়ার আগে।

: সত্যেন বাবু তো ১৯৪৬-৪৭ সালের দিকেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে চলে যান।

: হ্যাঁ, ... কী বলছিলাম?

আবার খেই হারিয়ে ফেলেন। আমি ধরিয়ে দিই।

: স্যার আপনি সত্যেন বাবুকে একখানা বই দেওয়ার কথা বলছিলেন। সেটা কোলকাতায় নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ কোলকাতায়। আমি গিয়েছি। বইখানা তাকে দেখিয়েছি। আমার বই দেখে তিনি খুব খুশি। ভাষার বিষয়ে বললেন 'এত সুন্দর ল্যাঙ্গোয়েজ' তিনি একেবারে অভিভূত হয়ে গেছেন। তখন আর তিনি ছাত্র পড়ান না। তিনি রিসার্স গাইড করেন। এই তাঁর কাজ ছিল। তখন তিনি সকলকে ডেকে বললেন : 'দেখ দেখ, কাজী কী করেছে।' তারপরে উনি আমার বইয়ের ইনেট্রোডাকশনটা ওদের পাঠ করে শোনালেন। ওটা আমার তথ্যগণিতে আছে। ওরা আগে পরিসংখ্যান বলতো। কিন্তু আমি নাম দিয়েছি তথ্যগণিত।

আমি বললাম : স্যার, বইটা আপনার বাংলাতে লেখা ছিল 'তথ্যগণিত' হিসেবে?

: হ্যাঁ।

আমি কুণ্ঠিতভাবে বললাম : আমরা তো জানিনে। তাই জিজ্ঞেস করেছি।

আমি বললাম : সত্যেন বসু মারা যাবার আগে, বাংলাদেশ হওয়ার পরে, চিঠি লিখেছিলেন। আশা করেছিলেন, ঢাকাতে একবার আসবেন।

আমার একথায় কাজী সাহেব বললেন : উনি শেষ চিঠি আমার কাছে লিখেছিলেন। কিন্তু সেইদিনের কথা শোন। আমার ভূমিকার সবটা পড়ে শোনালেন। শুনিয়ে বললেন : 'দেখ! তোমরা কেউ লিখতে পারতে? পারতে না। এ আমার ছেলে!'

কাজী মোতাহার হোসেন কেবল একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নন, তিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। তাঁর রচনারীতি কঠিন বিষয়কেও অনবদ্য সারল্যে প্রকাশের ক্ষমতায় বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয়। মুসলিম সমাজে বিজ্ঞানকে বাংলায় প্রকাশ করার প্রয়াসের ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। সামাজিক সম্পর্কে অজাতশত্রু। শুধু তাই নয়, সর্বদাই চেষ্টা করেছেন। ভাষা আন্দোলনের তীব্রতার পূর্বেও বাংলা ভাষার মর্যাদারপ্রশ্নে দ্বিধাহীনভাবে তিনি বাংলার স্বীকৃতির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। নিজে বরাবরই ধর্মপ্রাণ; কিন্তু কখনো গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নি। ছেলেমেয়ে সকলকে উদারনীতিক মনোভাবে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহ্যের প্রশ্নে নিজের মাতৃভূমির পরিবেশের উর্ধ্বে অপর কোনো ঐতিহ্যকে কখনো স্থান দেন নি। ঢাকাতে একদিন শিখাগোষ্ঠী মুসলমান সমাজে উদারনীতিক ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তার যে প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন, সেই শিখাগোষ্ঠীর উদ্যোগীদের মধ্যে কাজী আবদুল, ওদুদ, আবুল হোসেনের সঙ্গে কাজী মোতাহারও হোসেনও ছিলেন।

আজ হয়ত কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে আলাপ করা একটু কষ্টকর। কথা জোরে না বললে তিনি শুনতে পান না। স্মৃতিশক্তিও আজ দুর্বল। কিন্তু কাজী সাহেবের জীবন জ্ঞানের সাধনা এবং সরল জীবনযাপনের অনায়াস-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট। কারুর উচিত কাজী সাহেবের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা। কিছুক্ষণ আলাপ করে বিদায় নিয়ে চলে আসতে এই কথাটিই বেশি করে আমার মনে পড়েছিলো।